পৌরাণিক গল্পসমগ্র : বিষ্ণুপুরাণ

পৌরাণিক গল্পসমগ্র : বিষ্ণুপুরাণ

শতদ্রুশোভন চক্রবর্তী

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

Pouranik Galpasamagra : Visnu Purana

প্রথম প্রকাশ

মহালয়া আশ্বিন ১৩৬৪.

প্রকাশক

লীনা চক্রবর্তী

ইছাপুর ক্যানাল সাইড

পূর্বপাড়া, হাওড়া ৭১১১০৪

প্রচ্ছদ

অজয় গুপ্ত

পরিবেশক

স্কুল লাইব্রেরি

১৭/১ কেদার মুখার্জী লেন

কদমতলা, হাওড়া ১

মুদ্রক

নারায়ণচন্দ্র ঘোষ

দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স

৩২ বিডন রো, কলিকাতা ৬

যাঁর প্রবর্তনায়
আমার পুরাণ-পরিক্রমার সূচনা
লোকান্তরিত সেই
পূজ্যপাদ অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

'জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্বজ ॥১
সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্মিসৃষ্টিস্থিতি-কালসংলয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যাদি জগৎপ্রপঞ্চসূঃ
স নোঽস্তু বিষ্ণুর্মতি-ভূতি-মুক্তিদঃ ॥২
প্রণম্য বিষ্ণুং বিশ্বেশং ব্রহ্মাদীন্ প্রণিপত্য চ।
গুরুং প্রণম্য বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥'৩

[বিষ্ণুপুরাণম্]

হে পুণ্ডরীকাক্ষ তোমার জয় হোক
হে বিশ্বভাবন তোমাকে নমস্কার
হে হৃষীকেশ, পূর্বজ মহাপুরুষ
তোমাকে নমস্কার ॥১
যে নিত্য অক্ষর ব্রহ্ম
ঈশ্বররূপে
সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের ঊর্মিদ্বারা
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের আধার হয়ে
প্রধান ও বুদ্ধি প্রভৃতি জগৎপ্রপঞ্চের উৎপাদক
সেই বিষ্ণু
তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশ্বর্যসহ
আমাদের মুক্তিদাতা হোন্ ॥২
বিশ্বেশ্বর সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করে
ব্রহ্মাদি দেবতা ও গুরুকে প্রণাম করে
বেদসদৃশ পুরাণ বলব ॥৩

প্রস্তাবনা

বেদ ও উপনিষদের সম্প্রসারিত রূপ হল পুরাণ। মন্ত্র, তত্ত্ব ও ক্রিয়াকাণ্ডের সংহত ঋষিবোধ্য এক বিশাল বিষয়কে পুরাণ গণমুখী চারিত্র্যে ভূষিত করেছে। পুরাণ পৃথিবীর প্রাচীনতম গণসাহিত্য। শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্ট। 'ধর্ম ও জাতীয়তা' গ্রন্থের 'পুরাণ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেনঃ 'উপনিষদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পুরাণে উপন্যাস ও রূপকাকারে পরিণত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও আচার, পূজা, যোগসাধন, চিন্তাপ্রণালীর অনেক আবশ্যক কথা পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন পুরাণকার প্রায় সকলে হয় সিদ্ধ, নয় সাধক; তাঁহাদের জ্ঞান ও সাধনলব্ধ উপলব্ধি তাঁহাদের রচিত পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেদ ও উপনিষদ আসল হিন্দুধর্মের গ্রন্থ, পুরাণ সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা।' (পৃ. ৩৭) 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থের পঞ্চমখণ্ডে এক বক্তৃতায় পাওয়া যায়ঃ 'পুরাণ সমসাময়িক লোকের জন্য লিখিত—উহাকে আধুনিক সংস্কৃত বলা যায়। ঐ গুলি পণ্ডিতদিগের জন্য নহে, সাধারণ লোকের জন্য; কারণ সাধারণ লোক দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। তাহাদিগকে ঐ সকল তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্থূলভাবে সাধু, রাজা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত এবং ঐ জাতির মধ্যে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ঋষিরা যে কোন বিষয় পাইয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু প্রত্যেকটিই ধর্মের নিত্য সত্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।' (পৃ. ১৮-১৯)

বিষ্ণুপুরাণের শুরুতে এবং শেষেও পুরাণকে 'বেদসম্মিতম্' অর্থাৎ বেদসদৃশ বলা হয়েছে। পুরাণকে পঞ্চমবেদও বলা হয়। পুরাণের রচনাকাল নির্ণয় দুরূহ হলেও বেদের পরেই যে তার প্রাচীনত্ব তা অস্বীকার করা যায় না। অথর্ববেদে প্রথম পুরাণ কথাটির ব্যবহার দেখা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায় বেদ, ইতিহাস ও পুরাণের জন্ম পরমেশ্বরের নিশ্বাস বায়ু থেকে। পরবর্তী বায়ু পুরাণে বলা হয়েছে, সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মা প্রথমে স্মরণ করেন পুরাণকে। 'মৎস্যপুরাণম্'-এর ত্রি পঞ্চাশ অধ্যায়ে মৎস্যের মুখে ব্যক্ত হয়েছেঃ

> 'পুরাণাং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
> অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনির্গতাঃ ।।'

অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মা পুরাণকেই প্রথমে স্মরণ করেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছিল বেদ।

রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা 'The Cultural Heritage of India' গ্রন্থের

দ্বিতীয় খণ্ডের 'The Puranas প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন : "This statement, however absurd it may appear to be will have validity if we take the word puraua to mean not the purana literature, but 'ancient stories and legends,, which, in every country come into being much earlier than versified compositions." (p. 241)।

বিষ্ণুপুরাণের বক্তা পরাশর। তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পিতা। বিষ্ণুপুরাণের শেষ অধ্যায়ে বলা হয়েছে এই পুরাণের উৎসবৃত্তান্ত। প্রথম বলেন ব্রহ্মা, তারপর বিংশতিতম প্রজন্মে পান পরাশর। এ পর্যন্ত পুরাণ শ্রুতিনির্ভর ছিল। অবশেষে মহর্ষি বেদব্যাস এর সংকলন করেন। প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ বলেন ব্রহ্মা। তারপর একে একে ঋভু, প্রিয়ব্রত, ভাগুরি, স্তবমিত্র, দধীচি, সারস্বত, ভৃগু, পুরুকুৎস, নর্মদা, ধৃতরাষ্ট্র ও পূরণ নাগ, বাসুকি, বৎস, অশ্বতর, কম্বল, এলাপত্র, বেদশিরাঃ, প্রমতি, জাতুকর্ণ ও অন্যান্য মহাত্মা।

বেদব্যাসকে বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়েছে। ব্যাসরূপী বিষ্ণু প্রতি দ্বাপরযুগে বেদকে ভাগ করেছেন। পরাশর যখন বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন তখনই আটাশ জন ব্যাস জন্ম পরিগ্রহ করে লীলা সংবরণ করেছেন। সেই আটাশ জন ব্যাসের নাম হল : স্বয়ম্ভূ, মনু, উশনা, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃষা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, বপ্রী, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণজ্য, ভরদ্বাজ, গৌতম, হর্যাত্মা, বেণ, তৃণবিন্দু, ঋক্ষ (বাল্মীকি নামে খ্যাত), শক্তি, পরাশর, জাতুকর্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। (বিষ্ণুপুরাণ, অর্যশাস্ত্র সংস্করণ, পৃ. ১৮৪)।

বেদ থেকে পুরাণের পুরোবর্তিতা অবিশ্বাস্য। তবে পুরাণকে যদি প্রাচীন গল্প ও উপকথা রূপে ধরা যায় তাহলে কিছুটা সত্য বলেও কথাটিকে মনে হয়। কারণ সর্বদেশেই ছন্দোবদ্ধ রচনার পূর্ববর্তী কালেই তৈরি হয়েছে গল্প ও উপকথা। পুরাণের আদিরূপ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত অমরকোষে একটি সুপরিচিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে —তা ঘুরে ফিরে অনেক পুরাণের মধ্যেও দেখা যায় : অমরকোষ অনুযায়ী পুরাণ পঞ্চলক্ষণাত্মক। তাতে থাকে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মনন্তর, বংশানুচরিত। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঁচিশ নম্বর শ্লোকে এই পঞ্চলক্ষণের কথাই সমর্থিত :

'সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
সর্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ ॥' (পৃ. ১৯২)

অর্থাৎ, সর্গ : সৃষ্টি, প্রতিসর্গ : প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টি, বংশ : দেবতা ও

ঋষিদের বংশ, মন্বন্তর : এক একজন মনুর অধিকার কাল, বংশানুচরিত : কীর্তিমান দেবতা ঋষি এবং রাজাদের চরিতকাহিনী। এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত পুরাণের বিবরণ দিতে গিয়ে অনেক গল্প এসেছে। নিজের দেখা কাহিনী হলে বলা হত আখ্যান, শোনা গল্পের বর্ণনাকে বলা হত উপাখ্যান।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই কথিত হয়েছে দশলক্ষণের কথা। (আর্যশাস্ত্র সং, ২৯৫ পৃ.)। লক্ষণগুলি অবশ্য ভাগবতেই লভ্য। কারণ পুরাণলক্ষণ না বলে 'ভাগবতস্য দশলক্ষণ' রূপেই বর্ণিত হয়েছে।

'অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ।।

অর্থাৎ : সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়। সর্গ : সত্ত্ব রজঃ তমো এই গুণত্রয়ের পরিণাম পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়সমূহ, মহৎ ও অহংকারের উৎপত্তিকে বলা হয় সর্গ। বিসর্গ : ব্রহ্মা থেকে স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্বের উৎপত্তিকে বলা হয় বিসর্গ। স্থান : সৃষ্টবস্তুগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা। পোষণ : ভক্তের প্রতি ভগবৎ অনুগ্রহ। ঊতি : জীবগণের কর্মসংস্কার। মন্বন্তর : এক একজন মনুর কর্ম। ঈশানুকথা : অবতার ও ভক্তের পবিত্র লীলাকথা। নিরোধ : জীবগণের ভগবানে অন্তর্ধান। মুক্তি : জীবগণের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ত্যাগ করে অবস্থান। আশ্রয় : যাঁর থেকে সৃষ্টি ও লয় হয় সেই পরমেশ্বর।

মূল পুরাণগুলির বিশুদ্ধ পাঠ এখন পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে নানা কারণে প্রক্ষেপ ও পাঠান্তরের প্রভাবে পুরাণ যতই পরিবর্তিত হোক তার মৌল চারিত্র্যটি হয়ত কিছুটা অক্ষুণ্ণই আছে। সেই কারণেই বলা হয় : '...The purana literature has really been from time immemorial an invaluable record of the history and mythology of an ancient race.' (The Cultural Heritage of India, Vol II, p. 245)।

আগে পুরাণ ছিল একখানি। ব্যাসদেব তাকে আঠারোখানি সংহিতায় ভাগ করেন। এগুলিকে মহাপুরাণ নামে আখ্যাত করা হয়। এগুলিকে 'মৎস্যপুরাণ' অনুযায়ী তালিকাবদ্ধ করলে যা দাঁড়ায় তা হল : ব্রহ্ম, পদ্ম, বৈষ্ণব, বায়বীয়, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড। (পৃ. ১৮৯, নবভারত সং.)।

চারখানি উপপুরাণের পরিচিতি মৎস্যপুরাণে পাওয়া যায় : নারসিংহ, নন্দী, শাম্ব, আদিত্য। 'কূর্মপুরাণের' প্রথম অধ্যায়ে আঠারোখানি

উপপুরাণের নাম দেওয়া আছে ঃ আদি, নরসিংহ, স্কন্দ, শিবধর্ম, আশ্চর্য, নারদীয়, কপিল, বামন, উশনা, ব্রহ্মাণ্ড, বরুণ, কালিকা, মহেশ্বর, শাম্ব, সৌর, পরাশর, মারীচ, ভার্গব। (পৃ. ২, নবভারত সং.)

এইচ. এইচ. উইলসন বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ করেন (১৮৪০)। তার ভূমিকায় তিনি খ্রীস্টজন্মের তিনশো বছর আগে পুরাণসমূহের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনার কথা বলেও বলেছেন যে, প্রাচীন পৃথিবী যা কল্পনাও করতে পারে না এমন দূর অতীতে পুরাণগুলির অস্তিত্ব ছিল ঃ 'And the testimony that establishes their existence three centuries before Christianity carries it back to a much more remote antiquity —to an antiquity that is probably not surpassed by any of the prevailing fictitious institutions or beliefs of the ancient world.' (পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১৯৭ পাদটীকা)। F. Eden Pargiter তাঁর 'The Markandeya Purana' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন ঃ ' all the Hindu puranas had been composed before the end of the sixth and probably by the end of the fifth century A. D. though of course it leaves room open for subsequent additions and interpolations in them.' (Bibliotheca Indica : A Collection of Oriental Works , The Asiatic Society of Bengal, 1904, p, XIV)। আধুনিক কালে পুরাণ-গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন যে পুরাণ বহু পুরাতন হলেও বর্তমানে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তা খুব প্রাচীন নয়। গুপ্তযুগে পুরাণগুলি নতুন করে সংকলিত হয়েছিল। তার পরবর্তী যুগেও পুরাণ সংকলিত হয়েছে —কোথাও তার মধ্যে প্রচুর সংযোজনও ঘটেছে। (প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ১ম খণ্ড, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ২৪৫)।

পুরাণের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস নিহিত। এতে নেই এমন কথা খুঁজে পাওয়া কঠিন। বস্তুত পুরাণের মধ্যে মাঝেমাঝেই এক বিশ্বজ্ঞানের সমাহার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অগ্নিপুরাণ এর চরম দৃষ্টান্ত। মানুষের জীবন-সংবর্ধনার ক্ষেত্রে যা যা করণীয় কর্ম, আদর্শ—সবই পুরাণে পাওয়া যায়। নানা ধরনের কাহিনীর অবতারণা করে পুরাণ আমাদের সমগ্র জীবনকেই শ্রেয়ের অভিমুখে সঞ্চালিত করেছে। এ সব গল্পে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল দেব-দানব-যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর মানব-ভূত-প্রেত সব একাকার। বিরাট এক পরিব্যাপ্তির মধ্যে এখানে জীবনকে বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের বহু কুসংস্কারের উৎস পুরাণ। তবু গল্পগুলির মধ্যে জীবনোত্তাপের কি সুনিপুণ সমারোহ। এখানে যেন থরে থরে সাজানো রয়েছে অসংখ্য ছোট

ছোট গল্প—কখনো অঙ্কুরাকারে উপন্যাস হয়ে আছে সুপ্তিমগ্ন ; কখনো সহজসরল, কখনো রূপকাশ্রয়ী। নিসর্গ বর্ণনায় মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের ক্ষণ-উদ্ভাস। পুরাণের অসংখ্য চিত্রকল্প আমাদের স্বচ্ছন্দে অন্যজগতে নিয়ে যায়। এর ধ্যানমন্ত্রগুলি তো শব্দফ্রেমে বাঁধা দেববিগ্রহ। স্তুতিগুলি ধ্বনি-গৌরবে মন্ত্রের মহিমায় সমন্বিত। ভক্ত হৃদয়ের আকুতি ও প্রার্থনা স্তুতিগুলির শব্দশরীর থেকে অবিরাম কাঁপতে কাঁপতে বিগলিত জাহ্নবীধারার মতো নেমে আসে। পুরাণের রচয়িতারা সকলেই কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। স্বভাবোক্তির কাব্যসৌন্দর্যই অধিকাংশের মূলধন। তবে উপমা ও অনুপ্রাস অলংকারের প্রাচুর্য পুরাণের ভাষার অন্যতম লক্ষণ। জনসাধারণের হৃদয়বর্তী করার জন্যই হয়ত পুরাণের ভাষারীতিতে সহজিয়া রীতি অনুসৃত।

এককথায় পুরাণে হিন্দুর ধর্মকর্ম আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা, সাধন-পূজন, ব্রত-পার্বণ, সংস্কার-কুসংস্কাব সব একাকার। উইনটারনিজও বলেছেন ঃ 'They afford us a far greater insight into all aspects and phases of Hinduism. (A History of Indian Literature, vol. I., p. 402)। হিন্দুর নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণে অহিংসা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দয়া, দান, শৌচ, সত্য, তপঃ জ্ঞান ইত্যাদি আদর্শের কথায় পুরাণ পরিপূর্ণ। এর সবগুলিই আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে আলিঙ্গন করেই পরিকল্পিত। দেহ-আত্মায় সর্বরূপে বিকশিত এক পূর্ণ মানবরূপে তৈরি হবার জন্য যা দরকার তার সবই পুরাণগুলির মধ্যে নানাভাবে পরিবেশিত। কখনো নিছক বিবৃতি, কখনো রসোদ্দীপক গল্প। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'-র পঞ্চম খণ্ডে পাওয়া যায় ঃ 'আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে, যেগুলি পৃথিবীর গ্রন্থাগার সমূহের তিনচতুর্থাংশ পূর্ণ করিতে পারে।' (পৃ. ১৩০)। 'পুরাণে ভক্তির চরম আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। · ভক্তি কি বুঝিতে হইলে আমাদের এই পুরাণগুলি বুঝা আবশ্যক।· প্রায় সকল পুরাণেই আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলে সর্বত্র এই ভক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।'·· 'সৌন্দর্যের মহান আদর্শের ভক্তির আদর্শের দৃষ্টান্তসমূহ বিবৃত করাই যেন পুরাণগুলির প্রধান কাজ বলিয়া মনে হয়।' (পৃ. ২৮৯)।

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চলক্ষণাত্মক মহাপুরাণ। এ পুরাণের মধ্যে পরবর্তীকালের হস্তক্ষেপ কম। সেইহেতু সংক্ষিপ্ত এবং সংহত। এর মধ্যে পদ্য ও গদ্য উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছে। আদ্যন্ত বৈষ্ণবপুরাণ রূপে এর খ্যাতি। অনুমিত হয় খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর চতুর্থপাদ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে এ পুরাণ রচিত। বিষ্ণুপুরাণ ছটি অংশে বিভক্ত। এর পঞ্চমাংশ জুড়ে শ্রীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিন্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রামাণ্য জীবনী বিষ্ণুপুরাণেই সংরক্ষিত।

বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে যমগীতা ও পিতৃগীতা নামে দুখানি সংক্ষিপ্ত গীতা আছে। বলাবাহুল্য প্রচলিত গীতার সঙ্গে এগুলি নিঃসম্পর্কিত। মূল শ্রীকৃষ্ণকথিত গীতার রূপবন্ধ মাত্র এখানে অনুসৃত। এরকম আরো প্রায় ৩৫ খানি গীতার সন্ধান পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে মোট স্তবের সংখ্যা ১৯। এর মধ্যে বিষ্ণুস্তুতিই ১৪ খানি, কৃষ্ণস্তুতি ৩ খানি আর লক্ষ্মী সূর্য ও দেবকীর উদ্দেশে রচিত ১ খানি করে স্তুতি। স্তুতিগুলির মধ্যে কবিত্বের সংস্থান খুবই উচ্চস্তরের। বিশেষ করে প্রহ্লাদ-কৃত দুখানি বিষ্ণুস্তুতির মধ্যে উপনিষদের সূক্ষ্ম বীজতত্ত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করে দুর্গাদাস লাহিড়ী 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের ১৭৫-১৭৬ পৃষ্ঠায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন: 'প্রথমে প্রহ্লাদ, তাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া নমস্কার করিলেন; তাহাকে পালনকর্তা বলিয়া নমস্কার করিলেন; তাঁহাকে সংহারকর্তা বলিয়া নমস্কার করিলেন। কিন্তু তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে আত্মারূপে দর্শন করিলেন। বলিলেন, তিনিই আমি, আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন; আমিই সর্বরূপে সর্বত্র বর্তমান; সনাতন-রূপে আমাতেই সমস্ত লয়প্রাপ্ত হইবে। বেদান্তের এই অহংজ্ঞান—উপনিষদের সেই সোহহং চিন্তা—প্রহ্লাদের প্রাণে, প্রহ্লাদের স্তোত্রে কি সুন্দর পরিস্ফুট! বিষ্ণুপুরাণ গৃহধর্মের উপদেশ প্রদান করিতে করিতে, এই অহংতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।'

সাধারণভাবে পুরাণের গল্প পাঠ করার আগে আমাদের মন কি ভাবে তৈরি করে নিতে হবে তার চমৎকার নির্দেশ স্বামী বিবেকানন্দের **'Inspired Talk'** বা 'দেববাণী' গ্রন্থের এক জায়গায় পাওয়া যায়: 'পুরাণ চর্চার সময় ইতিহাস ও যুক্তিবিচারের দৃষ্টি নিয়ে এসো না। ঐ সব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার মনের ভিতর দিয়ে প্রবাহাকারে চলে যাক। তোমার চোখের সামনে তাকে মশালের মতো ঘোরাও, কে মশালটা ধরে রয়েছে—এ প্রশ্ন করো না, তাহলেই একটা আলোকের চক্র দেখতে পাবে। পুরাণলেখকেরা সকলেই, তাঁরা যা যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন, সেইগুলি রূপকভাবে লিখে গেছেন। তাঁরা কতকগুলি প্রবাহাকার চিত্র এঁকে গেছেন। তার ভিতর থেকে কেবল তার প্রতিপাদ্য বিষয়টা বার করবার চেষ্টা ক'রে ছবিগুলিকে নষ্ট ক'রে ফেলো না। সেগুলিকে যথাযথ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর কাজ করুক। এদের ফলাফল দেখে বিচার কর—তাদের মধ্যে যেটুকু ভাল আছে সেটুকুই নাও।' (বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৭-৩০৮)

বিষ্ণুপুরাণের গল্পগুলি সম্পর্কেও স্বামী বিবেকানন্দের এ উক্তিকেই শিরোধার্য করে নেওয়া চলে। এর শেষ গল্প 'কেশিধ্বজ ও খাণ্ডিক্যজনক' সার্থক ছোটগল্পের উদাহরণ। স্যমন্তক মণির গল্পটি প্রাচীনতম গোয়েন্দা-কাহিনী বলে অনায়াসেই সাব্যস্ত করা চলে। বিষ্ণুপুরাণের সমস্ত গল্পের মধ্যে

এ গল্পটির আবেদন স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গ যে জীবনী বিষ্ণু পুরাণে লভ্য তা পরবর্তী যে কোন কৃষ্ণকাহিনীর তুলনায় জীবনরস-রসিকতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে অনেক বেশি জীবন্ত। সংক্ষিপ্ততা কৃষ্ণকাহিনীর মধ্যে ভক্তির অতিরেক ঘটতে দেয়নি। পুরূরবা ও উর্বশী গল্পের আদলে রবীন্দ্রনাথের 'মহামায়া' গল্পটি হয়ত পরিকল্পিত হয়েছিল। জ্যামঘের শ্রেষ্ঠত্ব গল্পের প্রভাবে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ লিখে থাকবেন 'অসম্ভব কথা' গল্পটি। 'দেশেবিদেশে' পত্রিকার বিগত রবীন্দ্রসংখ্যায় 'পুরাণভাবিত দুটি রবীন্দ্রগল্প' প্রবন্ধে এ সাদৃশ্য বর্তমান লেখক দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আমেরিকা বিজয় অভিযানের সময় স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকটি সভায় জড়ভরত, প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের গল্প পরিবেশন করেছিলেন। প্রহ্লাদকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সত্যাগ্রহী নামে চিহ্নিত করা যায় অনায়াসেই। এ সূত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর কথা স্মরণযোগ্য: 'অপর দিকে আমাদের পুরাণকথাসাহিত্যে দেখো প্রহ্লাদ চরিত্র। যাঁরা এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মানুষের আত্মপরাভবকেই বাস্তব বলে মানেননি।...যে কালের মন থেকে এ রচনা জেগেছিল সে কালের কাছে বীর্যবান দৃঢ়চিত্ততার মূল্য যে কতখানি, এই সাহিত্য থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।' (বাংলা ভাষাপরিচয়। রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৩শখণ্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সং, পৃ. ৫৭৮-৫৭৯)। কৃষ্ণের জীবনকাহিনীতে ও জ্যামঘের চরিত্রে কৌতুকের উপাদানও কম নেই। সর্বোপরি, জ্যামঘের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বীজ। মহর্ষি সৌভরি গল্পের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার সর্বগ্রাসী চেহারা মর্মন্তুদ। আর গল্পগুলির মধ্যে আমাদের প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবন, রাজারাজড়াদের কথা, পারিবারিক জীবন, ধর্মকথা, প্রেমকথা সবই কিছু কিছু আছে। সরল ভাষারীতি এ পুরাণকে জনজীবনের কাছাকাছি এনে ফেলে সহজেই। মূলের সরলতা বর্তমান লেখকও বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি পুরাণগুলির মধ্যে যে সাহিত্যসৌরভ রয়েছে তাকেও স্মরণে রাখবার চেষ্টা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্য পুরাণের দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত। চর্যাগীতিকোষের মধ্যে পরোক্ষভাবে পৌরাণিক অধ্যাত্মতত্ত্বেরই প্রক্ষেপ। মনীন্দ্রমোহন বসু 'চর্যাপদ' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বলেছেন: 'এইভাবে একমাত্র যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ অবলম্বন করিয়া চর্যায় বিবৃত যাবতীয় তত্ত্ব বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।' (পৃ. ৬২)। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পুরাণ না হলেও পুরাণের মূল তত্ত্ব থেকে আদৌ দূরবর্তী নয়। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর ভাষায়: 'যোগযুক্ত হইয়া ভোগ, জ্ঞানযুক্ত হইয়া কর্মসাধনই যোগবাশিষ্ঠের সারোপদেশ।'...'ইহা বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রের, জ্ঞান ও কর্মের যুক্তবেণী।' (প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১)।

'নবচর্যাপদে' যে ৯৮ খানি পদ সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে পুরাণের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষ করে দেব-দেবতার কল্পনায়, বীজমন্ত্র, ধ্যান ও স্তবরচনায় পুরাণই হয়ে আছে অনুস্যূত। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী নবচর্যাপদের তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: 'বস্তুত নবাবিষ্কৃত চর্যাগান বৌদ্ধতান্ত্রিক দেব-দেবতার একটি বিশাল প্রতিমা-গৃহ।' (পৃ. ১৯)। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই পদগুলির আবিষ্কারক। তিনি বলেছিলেন: 'এখানে হিন্দু-দর্শনের ও দেবকল্পনার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।' (নব চর্যাপদ ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ১০০)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের জন্মখণ্ড পুরোপুরি বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের অনুবৃত্তি। নারদ চরিত্রাঙ্কনে বড়চণ্ডীদাস যে কৌতুকের আয়োজন করেছেন তাও 'হরিবংশ' দ্বারা প্রভাবিত। রাধার জন্ম বর্ণনায় পুরাণ অনুসৃত না হলেও বৃন্দাবন খণ্ডে ভাগবতের অনুসরণ স্পষ্ট। যদিও বড়ুচণ্ডীদাস মৌলিকতাও দেখিয়েছেন। পুরাণ ব্যবহারে অবশ্যই তিনি বৈচিত্র্যসন্ধানী। তবে সর্বত্র মূল কাহিনীর সঙ্গে তাঁর পুরাণবিন্যাস সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পাদনাসূত্রে ভূমিকায় বিশদভাবে পৌরাণিক প্রভাবের নিবিড়তাটি প্রতিপন্ন করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাস প্রায় ৫৩টি পৌরাণিক নাম ও প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। (পৃ. ৪০-৫৫)।

বাঙালী জীবনে পুরাণের প্রেরণা ছিল সুগভীর। দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ বাংলা দেশেই রচিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সংকলনেও বাঙালীর অবদানের কথা অনুমিত হয়। কথকদের কথকতায় এবং কবিওয়ালাদের কাব্যযুদ্ধে পুরাণ যে ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বিস্ময়কর। একসময়ে বাংলাদেশে পুরাণ নিত্য পঠিত হত। বাঙালীর সংস্কার কুসংস্কার, ব্রত-পার্বণ, প্রাত্যহিক জীবনচর্যা সর্বত্রই পুরাণের স্রোত। চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলিতে ভাগবত, বিষ্ণু, কূর্ম ও পদ্ম-পুরাণ থেকে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে। অনুবাদ সাহিত্যের প্রিয় বিষয়ই তো পুরাণ। ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে মালাধর বসু প্রমুখ অনেক কবিই সাহিত্যসৌধ নির্মাণ করেছেন। মহাভারতকে অনেকে পুরাণ পদবাচ্য বলে মনে করেন। মহাভারতের অনুবাদ শাখাতে কবিরা আক্ষরিক অনুবাদের পথে চলেননি। তাঁদের ভিন্নপথে চলতে সাহায্য করেছিল পুরাণ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ তো প্রায় পৌরাণিক রামায়ণী বিচিত্রা। কৃত্তিবাস ছাড়াও আরও বহু কবি পৌরাণিক রামায়ণসমূহ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সরাসরি পুরাণের রূপবন্ধ অনুসৃত। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর ভাষায়: 'মঙ্গলকাব্য বাঙালীর জাতীয় পুরাণ।'…'মঙ্গলকাব্য নানা দিক হইতে সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত।' মুকুন্দের কাব্যে ৮১টি

পৌরাণিক নাম ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মূলে রয়েছে বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। শাক্তপদাবলীর আগমনী ও বিজয়ার কাহিনী পুরাণ থেকে নেওয়া। কবিওয়ালাদের গানে পৌরাণিক কাহিনীরই নানাবিধ সহাস্য উদ্ভাসন। এমনকি আরাকান রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী'তেও পুরাণজ্ঞান মাঝেমাঝে ঝলছে উঠেছে। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মাবতী' কাব্যের সম্পাদনাসূত্রে ভূমিকায় দেখিয়েছেন 'শুকের মুখে আলাওল হিন্দু পুরাণজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন' ঃ 'ধার্মিক জিনিয়া যুধিষ্ঠির', 'দানেমানে কর্ণগুরু', 'যেন পার্থ যন্ত্র কাটি দ্রৌপদী পাইল।' প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য সুবিশাল পুরাণসাহিত্যের ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। কবিরা পুরাণেরই অনুবৃত্তি ঘটিয়েছেন নানা ছলে। কখনো এ অনুবৃত্তি উল্লেখ ও অনুষঙ্গমাত্র, কখনো কাহিনীর মূলতন্তু, কখনো বক্তব্যে প্রচ্ছন্নরূপে পুরাণের জীবনদর্শন অনুস্যূত। আধুনিক কালেও পুরাণ বাংলা সাহিত্যের সর্বত্র পথ করে নিয়েছে। কবিসংগীতের কথা আগেই বলা হয়েছে। যাত্রাপালা, নাটক, কাব্য প্রবন্ধ, উপন্যাস ছোটগল্প প্রবাদ প্রবচন —কোথায় পুরাণ নেই ? এমনকি বাঘা বাঘা মনননিষ্ঠ কবি, মার্কসবাদী থেকে শুরু করে ইউরোপীয় সাহিত্যের পরম পূজারীও পুরাণকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এমন কোন আধুনিক কবিকে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি কাব্য মধ্যে পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছোটগল্পে বিশেষভাবে পৌরাণিক প্রসঙ্গ ব্যবহারের কারুকার্য পুরাণের প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্য ভাল করে বুঝতে হলে বা সাহিত্য রচনা করতে গেলে পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে পরিচয় একান্ত ভাবে কাঙ্ক্ষিত। এর জন্য পৌরাণিক অভিধান যথেষ্ট নয়।

পরিশেষে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', প্রথম খণ্ড থেকে প্রাসঙ্গিক কিছুটা অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ 'পুরাণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—বৈদিক সংস্কৃতির অবসানের পর বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে ব্রাহ্মণ্য মতাশ্রয়ী হিন্দুসমাজে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইল, এই পুরাণগুলি সেই শূন্যতাকে অনেকাংশে পূরণ করিতে পারিয়াছিল।...ভারতসংস্কৃতির গত দেড়হাজার বৎসরের ইতিহাস মূলত পৌরাণিক সংস্কৃতিরই ইতিহাস বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণ ভারতজীবনে কিরূপ প্রগাঢ় প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।' (পৃ. ৬২০)।

সূচীপত্র

'অপবাদিকে আমাদেব পুরাণ কথাসাহিত্যে দেখো প্রহ্লাদচরিত্র। যাঁরা এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মানুষের আত্ম-পরাভবকেই বাস্তব বলে মানেননি। · যে কালের মন থেকে এ রচনা জেগেছিল সে কালের কাছে বীর্যবান দৃঢ়চিত্ততার মূল্য যে কতখানি, এই সাহিত্য থেকে তারই পবিচয় পাওয়া যায়।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

পৌরাণিক গল্পসমগ্র : বিষ্ণুপুরাণ

১. পরাশর

আহ্নিক শেষ হয়েছে। এখন অবসর। পরাশর বসে আছেন। মৈত্রেয় এলেন। গুরুকে প্রণাম করলেন শিষ্য—পরাশরকে মৈত্রেয়।

মৈত্রেয় ভাগ্যবান—বেদবেদাঙ্গে, তাবৎ ধর্মশাস্ত্রে অনায়াস অধিগতি, গুরুর কৃপাধন্য। মৈত্রেয় ভাগ্যবান—নিত্য অনুসন্ধিৎসু, নিত্য কৌতূহলী।

পরাশরকে প্রশ্ন করেন মৈত্রেয় ঃ কি উপাদানে জগৎ তৈরি, কিসের থেকে উৎপন্ন হল, কিসে লীন ছিল, লয়ই বা হবে কিসে ? মাপ নেই কি আকাশের ? কোত্থেকেই বা জন্ম হল দেবগণের ?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

সমুদ্র পর্বত ও পৃথিবীর স্থিতি, সূর্য বা অন্যান্য গ্রহদের সংস্থিতি দেবতাগণের বংশ, মনু মন্বন্তর সব কিছুর বিবরণই জানতে চান মৈত্রেয়।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। বিব্রত হন না পরাশর। শোনেন। বলতে দেন শিষ্যকে।

চতুর্যুগ কি ? বিকল্পিত কল্প, কল্পবিকল্প, কল্পান্ত কি ? না জানলেই যেন নয়।

যুগের ধর্ম, দেবর্ষিদের কথা, রাজাদের চরিত্র, ব্যাসপ্রণীত বেদের শাখা, চারবর্ণ, চার আশ্রম—সবই যেন মৈত্রেয়কে জানতে হবে।

পরাশর খুশি হন। বললেন ঃ পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিলে দিব্যি। ভালই হল। পিতামহ বশিষ্ঠের কথা মনে এল।

বিশ্বামিত্র রাক্ষস পাঠিয়েছেন। পিতা বিনষ্ট হলেন। মনে আগুন জ্বলল। ক্রমশই লেলিহান হল তার শিখা। যজ্ঞ শুরু করলাম। রাক্ষস-নিধন যজ্ঞ। শত শত নিশাচর ভস্ম হল। বহু রাক্ষস ক্ষয় হল।

পিতামহ বললেন ঃ বেশি ক্রোধ ভাল নয়, সংবরণ কর। রাক্ষসদের দোষ নেই কোন। তোমার পিতার ভাগ্যই ছিল অমনি। মনে যদি আঁধার তবেই রাগ, জ্ঞানের শিখা জ্বলেছে যে হৃদয়ে রাগ ঠাঁই পায় না সেখানে। যে যেমন করে, ফল পায় ঠিক তেমন তেমনই। কেউ কাউকে বধ করে না। সবই কর্মের ফল। যশ, তপস্যাবল এমনিতে আসে না, ক্লেশ করতে হয়। কিন্তু মনে যেই ঠাঁই পেল ক্রোধ অমনি নষ্ট হয় কষ্টার্জিত সব ধন। তাই ক্রোধকে পরম ঋষিরা বর্জন করে চলেন। ওটিকে জয় কর। শত শত নিশাচর বা রাক্ষস মেরে কোন লাভ নেই। অতএব নিবৃত্ত হও। ক্ষমা কর। ক্ষমাকেই সার জেনো।

পিতামহের কথা ভাল লাগল। পালনও করলাম। সঙ্গে সঙ্গে মন শান্ত হল। যজ্ঞে বিরত হলাম। পিতামহ খুশি হলেন।

পুলস্ত্য এলেন। বসলেন। বললেন ঃ মনে প্রচণ্ড বৈরভার, কিন্তু জয় করেছ তাকে। গুরুজনের কথায় মন ক্ষমায় প্রসন্ন করেছ। সমস্ত শাস্ত্রে পরম জ্ঞান হবে তোমার। করতে করতেও লুপ্ত করনি আমার বংশ। আমি আনন্দিত। অতএব এক মহৎ বর তোমাকে দেব ঃ পুরাণ-সংহিতার কর্তা হবে তুমি ; দেবতা ও পরমার্থ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হবে তোমার ; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিধায়ক কাজে তোমার বুদ্ধি নির্মল হবে, সন্দেহ-সংশয় থাকবে না বিন্দুমাত্রও।

পিতামহ, বললেন ঃ পুলস্ত্যের কথা মিথ্যে হবার নয়।

মৈত্রেয় প্রশ্ন করছিলেন। পরাশরের মনে পড়ল পুলস্ত্যের বরের কথা। পুলস্ত্যের কল্যাণেই পরাশরের পুরাণজ্ঞান। পরাশর বললেন ঃ বলছি, শোন ॥

২· ধরণীধর

অতীত কল্পের অবসান হয়েছে। ব্রহ্মা সুপ্তোত্থিত, সত্ত্বোদ্রিক্ত। ব্রহ্মা দেখলেন, চতুর্দিক একাকার। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।

এই ব্রহ্মাই নারায়ণ। জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ। অপ্ নর থেকে অর্থাৎ পুরুষোত্তম থেকে উৎপন্ন, তাই নার। এই নারই ব্রহ্মার পূর্ব আশ্রয়। তাই তিনি নারায়ণ।

জগৎ জলে জলাকার। চতুর্দিকে জল। জল ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্মা অনুমান করলেন পৃথিবী আছে এই জলেরই অতলতলে। পৃথিবীকে উদ্ধার করতে হবে, তাঁর মনে এই মহতী চিন্তা।

আগের আগের কল্পে ইনি মৎস্য হয়েছিলেন, কূর্মের চেহারা নিয়েছিলেন। এবার নিলেন বরাহের রূপ। সনক প্রমুখ সিদ্ধপুরুষ স্তব করলেন। অভিষ্টুত হলেন ব্রহ্মা। জলের অতলে প্রবেশ করলেন বরাহরূপী ভগবান।

পাতালতলে এসেছেন ব্রহ্মা। দেবী বসুন্ধরা প্রণতি জানালেন, ভক্তির নৈবেদ্য সাজালেন, স্তবে আরতিতে সন্তুষ্ট করলেন ভগবানকে।

বললেন ঃ শঙ্খ চক্র গদা তোমার হাতে, তোমাকে নমস্কার। তোমা থেকেই আমি উত্থিত। পাতালতলে পড়ে আছি। উদ্ধার কর। তুমি জনার্দন। আগে তুমিই উদ্ধার করেছিলে, এবারও কর। সর্বভূতের কর্তা তুমি, পাতা তুমি, আবার বিনাশও কর তুমি। জগৎ যখন জলে জলে একাকার, তখন তুমিই সমস্ত সংভক্ষণ করে শয়ন করে থাক। মনীষীরা তোমাকেই ধরতে

চেষ্টা করেন ধ্যানে। কিন্তু কেউ জানে না তোমার পরমতত্ত্ব। অবতারে অবতারে যে রূপ ধর তাকেই ভজনা করে সবাই, এমনকি দেবতারাও।

পরিঘর্ঘর শব্দে গর্জন করে উঠলেন সেই মহাবরাহ। পদ্মপাতার মত বর্ণ, পদ্মের মত দুই চোখ। দন্তে উৎক্ষিপ্ত হল ধরা। তারপর জল থেকে সেই মহাবরাহ উঠে এলেন। একটি বিরাট বিশাল নীল পাহাড় যেন উঠে এল। আলোড়িত হল জল। ঢেউ-পাহাড়ের মালা হল তৈরি। মুখ থেকে বেরুল বায়ুঃ ঝড়ের মত বায়ু। ছুটিয়ে দিল ঢেউ-পাহাড়কে।

জনলোকে সনন্দ ও অন্য সব মুনি। শুচি শুদ্ধ অন্তঃকরণ। প্রক্ষালিত হলেন তাঁরা জলে। বরাহক্ষুরে বিক্ষত রসাতল। জলরাশি ছুটল সেই দিকে।

নিশ্বাসে নিশ্বাসে জনলোকবাসী সিদ্ধরা কম্পিত হলেন, বিচলিত হলেন।

বেদময় শরীর। ধরাকে ধারণ করে জল থেকে উঠেছেন। কম্পিত মহাবরাহ, সিক্ত মহাবরাহ। মুনিরা রোমাবৃত বেদময় ভগবানের দেহ আশ্রয় করেছিলেন।

আনন্দে পূর্ণ হল সনন্দ প্রমুখ যোগীদের হৃদয়। তাঁরা স্তব করলেনঃ পদ্মবন আলোড়িত করে গজেন্দ্র উঠেছে, তাঁর দাঁতে কাদামাখা পদ্মপাতা। তোমার দাঁতে ধরা ধরণী। আমাদের মনেঃ গজেন্দ্রের দন্তসংলগ্ন পদ্মপত্র। পৃথিবীকে উদ্ধার করেছ, এবার কল্যাণ বৃষ্টি কর। তোমাকে নমস্কার।

ভগবান পরিতুষ্ট হলেন। পৃথিবীকে সেই বিরাট মহাসমুদ্রের উপর স্থাপন করলেন। বিশাল ব্যাপ্ত পৃথিবী। সমুদ্রে ভাসল, যেন নৌকা।

ভাগে ভাগে পৃথিবীতে বিন্যস্ত হল পর্বত। সপ্তদ্বীপে ভাগ করে আগের মত চতুর্লোক কল্পনা করলেন পরমেশ্বর। এরপর সৃষ্টি এবং সৃষ্টি। সৃজ্যবস্তু নিজ নিজ শক্তিতেই করে চলল সৃষ্টি। ভগবান যেন নিমিত্তমাত্র॥

৩. লক্ষ্মীর উজ্জীবন

মহর্ষি দুর্বাসা পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন। দুর্বাসা পরিভ্রমণ করছেন।

ভ্রাম্যমাণ দুর্বাসা। সম্মুখে অল্পদূরে এক বিদ্যাধরী। দুর্বাসা দেখলেন। বিদ্যাধরীর হাতে সন্তানক ফুলের এক মালা। দিব্যমালা, অপূর্ব তার গন্ধ। সারা বন আমোদিত। অমন সুন্দর মালা, অমন মনমাতানো সৌরভ। দুর্বাসা মোহিত হলেন। বললেন, মালাটি দিতে হবে।

বড় বড় চোখ মেলে তনুলতা নুইয়ে বিদ্যেধরী দুর্বাসাকে প্রণাম করলেন। মালাটিও তুলে দিলেন হাতে। দুর্বাসা মাথায় তুলে নিলেন সে মালা,

মাথাতেই জড়িয়ে রাখলেন।

ভ্রাম্যমাণ দুর্বাসা। ভ্রমণ করছিলেন, ভ্রমণ করতে লাগলেন। দুর্বাসা দেখলেন ঐরাবতে চেপে দেবরাজ ইন্দ্র আসছেন। সঙ্গে অন্যান্য দেবতা।

মনমাতানো মালা। মত্ত দুর্বাসা। মাথা থেকে মালা খুলে দিলেন ইন্দ্রকে ছুঁড়ে। ইন্দ্র পরিয়ে দিলেন ঐরাবতের মাথায়। মালা শোভা পেতে থাকল, কৈলাসের চূড়োয় যেন জাহ্নবী।

গন্ধে কেমন-কেমন করে উঠল ঐরাবত। শুঁড়ে শুঁকল। ধড়ফড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলল ধুলোয়।

দেববরেণ্য দুর্বাসা, মহর্ষি, যদিও প্রচণ্ড ক্রোধী। তাঁর দেওয়া মালা, দুর্বাসা দেখলেন সেই মালার দুর্দশা। ক্ষিপ্ত হলেন। ইন্দ্রকে বললেনঃ ঐশ্বর্যে মাতাল হয়েছ। তোমার এত গর্ব! যে মালায় লক্ষ্মীর বাস তাকে অবহেলা। কোথায় প্রণাম করে প্রসাদ ভেবে খুশিতে রাখবে শিরে, তা নয়, না ভেবে না চিন্তে সোজা ফেললে ধুলোয়।···আজ থেকে ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীভ্রষ্ট হবে।

ঐরাবতের পিঠ থেকে ইন্দ্র নেমে এলেন। প্রণিপাত জানিয়ে শত অনুনয় করলেন।

কিন্তু দুর্বাসা কঠিন। বললেনঃ তিলমাত্র ক্ষমাও আমার শরীরে নেই। কৃপা করতে আমি জানিনে। আমি দুর্বাসা। গৌতম বা অন্য মুনিরা তোমাকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছেন। কিন্তু বৃথা তোমার গর্ব। বশিষ্ঠ এবং তাঁর মত দয়ালু ঋষিরা বড় বড় বলে তোমাকে গর্বিত করে তুলেছেন। তাই তোমার এই স্পর্ধা। তাই তোমার এই সাহস, আমাকে অপমান। অথচ আমার এই ভ্রূকুটি দেখে সকলেই কাঁপে। যাও। বৃথা তোমার অনুনয়, শুধু সময়ের ক্ষয়।

দুর্বাসা চলে গেলেন। ইন্দ্রও এলেন অমরাবতীতে। সেই থেকে ত্রিভুবনের শ্রী অন্তর্হিত হল।

শ্রী গেল, চতুর্দিক বিধ্বস্ত, বিশ্রী। যজ্ঞ গেল, তপস্যা গেল, দানেও মন রইল না কারো। মানুষের মনে চলল লোভের নীরন্ধ্র রাজত্ব। সত্ত্ব রইল না, স্বল্পে জন্মাল অভিলাষ। যেখানে সত্ত্ব সেখানেই লক্ষ্মী। যা বিশ্রী তাতে সত্ত্ব নেইঃ আর সত্ত্ব থাকলে তবে তো গুণ। গুণছাড়া মানেই তো লক্ষ্মীছাড়া। কেউ পোঁছে না তাকে।

তিনভুবনের যখন এই লক্ষ্মীছাড়া দশা তখন মওকা পেল দানবরা। ঝোপ বুঝে কোপ। সুযোগ বুঝে দানবরা দেবতাদের চেপে ধরল। শ্রী নেই সত্ত্ব নেই বলবীর্যও নেই। দেবতারা এঁটে উঠতে পারলেন না। হেরে গিয়ে মনমরা হলেন। অবশেষে শরণ নিলেন ব্রহ্মার। অগ্নিকে সামনে রেখে সকলে

ব্রহ্মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ব্রহ্মা বললেন ঃ আমার কর্ম নয়। পারলে পারেন বিষ্ণু। তাঁর কাছে যাও। তিনি অসুরের যম।

দেবতারা ব্রহ্মাকেই ধরে পড়লেন। ব্রহ্মা এড়াতে পারলেন না। তাঁকেও যেতে হল।

ব্রহ্মা এলেন ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরতীরে। সঙ্গে দেবতারা। সবাই বিষ্ণুর স্তব করে বললেন ঃ যিনি সমস্ত গরীয়ান বস্তুর গরীয়ান, অণীয়ানের অণীয়ান, নারায়ণ, অভেদী, অজ, অব্যয়, অনন্ত, সেই তাঁকে নমস্কার। ··

বিষ্ণু খুশি হয়ে বললেন ঃ দৈত্যদের সঙ্গে মিলে ক্ষীরসাগরে সমস্ত ওষধি এনে ফেল। মন্দর পর্বতকে মাথানি ও বাসুকিকে দড়ি করে আমার সাহায্যে মন্থন কর। দৈত্যদের প্রলুব্ধ কর, বল মন্থনে অমৃত উঠবে। তারাও ভাগ পাবে। অবশেষে দেবার বেলায় আমি আছি। অমৃত ওরা পাবে না, পাবে শুধু হাড়ভাঙগা কষ্ট।

বিষ্ণুর কথায় দেবতারা দানবদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। শুরু হল মন্থন। দেবতারা ধরলেন বাসুকির লেজের দিক, আর মাথার দিক দানবরা। বাসুকির নিশ্বাসের হলকায় হাঁপিয়ে উঠতে থাকল অসুরেরা। আর ঐ নিশ্বাসে মেঘ উড়ে এসে জমল এধারে, দেবতাদের মাথার উপরে। এক পক্ষে জ্বালা, শুধুই জ্বালা ; অপর পক্ষে বর্ষণ, তৃপ্তি, তৃপ্তি এবং তৃপ্তি।

বিষ্ণু কূর্ম হলেন। রইলেন সাগরের নীচে। কূর্মের পিঠে রচিত হল মন্দর পর্বতের অধিষ্ঠান। বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে রইলেন, দানবদের মধ্যেও। আরো রইলেন মন্দরের চূড়োয়। বিষ্ণুর তেজ সঞ্চারিত হল নাগরাজে। বিষ্ণুর তেজ সঞ্চারিত হল দেবগণে।

মন্থন চলল। মন্থনে মন্থনে সমুদ্র আকুল হল। ক্রমে উঠে এল সুরভি কামধেনু—অপূর্ব, অদ্ভুত। দেব ও দানব আনন্দে ও লোভে অপলক চোখে সুরভির দিকে চেয়ে রইলেন। সকলেই ভাবছেন, কে এ কি এ। ভাবনা শেষ হতে না হতেই উঠলেন সুরাদেবী বারুণী। বিশ্বচরাচর গন্ধে যেন ভাসল, উঠে এল পারিজাত তরু। উঠে এলেন অপ্সরারা। অঙ্গে তাঁদের ভুবনভোলানো কান্তি।

চন্দ্র উঠলেন, মহাদেব নিলেন। বিষ উঠল, নাগেরা নিল।

অমৃত উঠল। ধন্বন্তরী, পরনে সাদা কাপড়, হাতে কমণ্ডলু, অমৃতে পূর্ণ।

তারপর আরো হর্ষ, আরো উল্লাস। লক্ষ্মী উঠলেন। হাতে পদ্ম, পায়ে পদ্ম, পদ্মে দাঁড়িয়ে। দিব্য পদ্ম, দিব্য দীপ্তি। পুঞ্জীভূত লাবণ্য দাঁড়িয়ে দিব্যপদ্মে। লাবণ্য জ্বলল, বিচ্ছুরিত হল।

ঋষিরা স্তব করলেন। বিশ্বাবসু ও অন্যান্য গন্ধর্ব গানে, ঘৃতাচী ও অন্যান্য অপ্সরা নাচে দেবীকে আরতি করল। গঙ্গা এলেন, দেবীকে স্নান করাবেন। সোনার পাত্রে জল। শুঁড়ের ঝর্ণায় সমাপন হল স্নান। কমল-মালায় গয়নায় দেওয়া হল সাজিয়ে। দেবী হরির বুকে আশ্রয় নিলেন।

দানবরা লক্ষ্মীছাড়া হয়ে চিন্তায় পড়ল। কিন্তু বসে রইল না হাত গুটিয়ে। ধন্বন্তরীর হাত থেকে হাতিয়ে নিল অমৃতের কমণ্ডলু।

বিষ্ণু নারীর বেশ নিলেন। মায়ায় ভুলালেন দানবদের। কমণ্ডলু উদ্ধার করলেন। দিলেন দেবতাদের হাতে।

অমৃত পান করে দেবতারা অমর হলেন। তাঁদের বাহুতে বল এল।

অমেয় বল সঞ্চারিত হল দেবতাদের বাহুতে। হৃদয়েও সঞ্চারিত হল অনন্তবীর্য। দেবতারা আক্রমণ করলেন দৈত্যদের। দৈত্যরা মারা গেল, মারা পড়ল, পালিয়ে আশ্রয় নিল পাতালে।

এতদিনে দুঃখ গেল। সুখ ও আনন্দে ভাসতে ভাসতে দেবতারা স্বর্গে ফিরে গেলেন, রাজত্ব করতে থাকলেন। সর্বত্র সবকিছুতে শ্রী ছড়িয়ে পড়ল। ধর্মে সকলের মতি হল। চন্দ্র সূর্য প্রসন্ন আলো ছড়িয়ে চরাচর প্রমুদিত করে জ্বলতে থাকলেন। তিনভুবনে সুন্দরের প্লাবন বইল।

ইন্দ্রের মনে হর্ষ, প্রশান্তি। স্তব করতে থাকলেন তিনি দেবী লক্ষ্মীর ঃ তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাহা ও স্বধা, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা ও সরস্বতী…॥

৪ বালকের তপস্যা

সিংহাসনে রাজা—রাজচক্রবর্তী উত্তানপাদ। কোলে উত্তম। ধ্রুবেরও সাধ হল ভাইয়ের মত সেও উঠে পিতার কোলে। কিন্তু রাজা আমল দিলেন না। সামনে উত্তমের মাতা সুরুচি। সুরুচির চোখের উপর সুনীতির পুত্রকে কোলে বসাতে রাজা সাহস পেলেন না।

ধ্রুব আবদার করছিল। সুরুচি ধ্রুবকে শাসন করলেন। বললেন ঃ তোমার মা সুনীতি, আমি নই। ও সাধ তোমার সাজে না। তুমি ছেলেমানুষ, তাই যা পাওয়ার নয় তাই চাইছ। রাজা তোমারও বাবা, কিন্তু তুমি কি আমার ছেলে ? সিংহাসন আমার ছেলেকেই মানায়। মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ। সুনীতি তোমার মা। বড় বড় সাধ কি তোমার সাজে ?

বিমাতার কথা ধ্রুবের বুকে বড় বাজল। রাগে দুঃখে ধ্রুব এল মায়ের কাছে। ধ্রুবের ঠোঁট ফুলে ফুলে কাঁপছিল। কোলে টেনে নিয়ে সুনীতি

সুধোলেন ঃ কি হয়েছে সোনা ? কে বকেছে ? বাবাকে খারাপ বলেছে কেউ ?

মাকে সব বলল ধ্রুব। বড় একটি নিশ্বাস পড়ল তার। সুনীতির মনও কেমন করে উঠল। চোখের আলো কমে এল। বললেন ঃ সুরুচি ঠিকই বলেছেন বাবা। যাদের কপাল পোড়া তাদেরই শুনতে হয় এসব। মন খারাপ কর না। আগের জন্মে যা করেছ সবই তার ফল। কারও সাধ্যি নেই তা খণ্ডায়। যার পুণ্য আছে, সিংহাসন বা ভাল সবকিছু তারই।

সুনীতি আরও বললেন ঃ আমার বরাত মন্দ, তাই আজ রাজার আমি কেউ নই, সুরুচিই তাঁর সব। তোমার পুণ্য কম, তাই আমার ছেলে। দুঃখ কর না। যা আছে তাই নিয়ে খুশি হওয়াই বুদ্ধির কাজ। বিমাতার কথা খুব খারাপই যদি লাগে তাহলে পুণ্য সঞ্চয় কর। সবার ভাল ভাব, ভাল কর। জেনো সম্পদও জলের মতো পাত্রকেই আশ্রয় করে।

ধ্রুব বলল ঃ ভোলাতে গিয়ে বলছ বটে ওসব, কিন্তু কিছুই দাঁড়াচ্ছে না মনে। এত কষ্ট হয়েছে আজ। তবু তোমার কথা রাখব। সবের ভাল, তারও ভাল হতে চেষ্টা করব।

চাইনে আমি। উত্তমই নিক সিংহাসন। কারো দেওয়া জিনিস আমি চাইনে। কিন্তু তুমি দেখো, এমন কিছু আমি অর্জন করব যা আমার বাবাও পান নি।

বাড়িতে আর রইল না ধ্রুব। বেরিয়ে পড়ল। পেঁছিল এক উপবনে। সেখানে সাত ঋষি। উপবিষ্ট কুশের আসনে।

প্রণতি জানিয়ে নিজের পরিচয় দিল ধ্রুব। বলল সংসারে তার বিরাগ এসেছে। তাই এসেছে ঋষিদেব কাছে।

ঋষিরা অবাক হলেন। চার পাঁচ বছরের ছেলে, তোমার আবার সংসারে বিরাগ কি ? রাজচক্রবর্তী পিতা তোমার, জীবিত তিনি, ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, প্রিয় কারো মৃত্যু হয়নি, শরীরেও কোন রোগবালাই নেই, তবে বৈরাগ্য কেন ?

ধ্রুব সব কথা খুলে বলল। মুনিরা মুগ্ধ। ক্ষত্রিয়ের মতই তেজ বটে। বিমাতার কটু কথার জ্বালা এই ছোট্ট বুক থেকেও দূর হচ্ছে না। ওঁরা সুধোলেন ঃ কি করবে তাহলে ? আমরা তোমার জন্য কি করতে পারি ? কিছু যেন বলবে বলবে মনে হচ্ছে ?

ধ্রুব বলল ঃ টাকাকড়ি চাইনে, রাজত্বও নয়। আমি চাই সেই একমাত্র স্থান যা আগে কেউ ভোগ করেন নি। সমস্ত স্থানের শ্রেষ্ঠ স্থান পাওয়া যায় যে উপায়ে তাই আমাকে বলে দিন।

মরীচি ঃ গোবিন্দের আরাধনা যারা করেনি তারা শ্রেষ্ঠ স্থান পায় না। অতএব তাঁর আরাধনা কর।

অত্রি ঃ জনার্দন যার প্রতি তুষ্ট তারই মেলে অক্ষয় স্থান।
অঙ্গিরা ঃ যদি অগ্রস্থান চাও তবে গোবিন্দকে ভজনা কর।
পুলস্ত্য ঃ হরির আরাধনায় দুর্লভ মুক্তিও মেলে।
ক্রতু ঃ জনার্দন তুষ্ট হলে সবই পাওয়া যায়।

পুলহ ঃ বিষ্ণুর ভজনেই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব। অতএব বিষ্ণুকে ভজনা কর।

বশিষ্ঠ ঃ বিষ্ণুকেই ডাকো, ডাকার মত ডাকতে পারলে ত্রিভুবনের সমস্ত ভালোই তোমার করতলগত হবে।

ধ্রুব বলল, কিন্তু কি জপব আমি? কি করলে প্রসন্ন হন তিনি?

মনকে স্থির কর, একাগ্র হয়ে জপ কর 'হিরণ্যগর্ভপুরুষ প্রধানাব্যক্তরূপিণে ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে'। এই মন্ত্র জপ করে তোমার পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু যা চেয়েছিলেন তা পেয়েছিলেন। অতএব জপ কর।

উপদেশ নিয়ে প্রণাম করে ধ্রুব চলে এল মথুরায়। যমুনার তীরে পুণ্য তীর্থ মথুরা। এককালে এখানে বাস করত মধুদৈত্য। নাম ছিল মধুবন। মধুপুত্র লবণরাক্ষস, বধ করেন শত্রুঘ্ন। নির্মিত হল মথুরা পুরী। এ তীর্থে হরির সান্নিধ্য মেলে, দূর হয় সব পাপতাপ। এখানেই তপস্যা করেছিল ধ্রুব। বিষ্ণুতে মন রেখেছিল, আর মনে বিষ্ণুকে। ধ্রুব হল বিষ্ণুময়।

বিষ্ণু ভর করলেন। তাই ধরাও বইতে পারেন নি ধ্রুবের ভার। বাঁ পায়ে ভর দিয়ে ধ্রুব দাঁড়ায়, ডান দিকে ঝুঁকে পড়ে পৃথিবী। ডান পায়ে ভর রাখে ধ্রুব, বাঁ দিকে ঘটে অনিয়ম। পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর পড়ল, পৃথিবী হল টালমাটাল। নদনদীতে সমুদ্রে শত শত দামাল পাহাড় উঠল, পড়ল। টলমল করে উঠল দেবতাদের আসনও।

দেবতারা আকুল। পরামর্শ হল ইন্দ্রের সঙ্গে। একটি বালকের ধ্যান ভাঙার কাজে উঠে পড়ে লাগলেন দেবতারা।

উপদেবতারাও বসে রইল না। নানা সাজে নানা ভাবে তৎপর হল তারা। মা সুনীতির সাজে এগিয়ে এল একজন। দুচোখ ভরা জল। ধ্রুবকে করুণ ভাবে ডাকল। বলল ঃ লক্ষ্মী ছেলে আমার, শরীরকে এভাবে ক্ষয় করে দিও না, ছেড়ে দাও এসব। অনেক কষ্টে তোমাকে পেয়েছি। তুমি আমার অগতির গতি। বিমাতার কথায় রাগ করে নিজের মাকে এভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক নয়। তুমি নিতান্তই শিশু, অথচ তপস্যা নিদারুণ। ফল পাবে না কিছু। অতএব ছাড়। এখন হেসে খেলে বেড়াবে, তারপর পড়াশুনো, সংসার, ভোগ, তারপর তো তপস্যা। যখন যা সাজে তাই করা উচিত তখন। খেলার বয়সে এভাবে তপ করে নিজেকেই নষ্ট করছ। মায়ের কথা শোনা পরম ধর্ম। অতএব যেমন বয়স তেমন কাজই কর। যা করছ তা অধর্ম।

অতএব ছাড়। কথা যদি না শোন তাহলে আজই তোমার সামনেই আমি মরব।

দেখেও দেখল না ধ্রুব। চোখের জলে ভেজা শত কথা ভেসে গেল।

বাছা পালিয়ে এস; পালিয়ে এস। ভীষণ সব রাক্ষস। ধেয়ে আসছে তোমার দিকে, পালিয়ে এস। একথা বলে সুনীতি চলে গেল।

ভয়ংকর সব রাক্ষস এল। ধ্রুবর সামনে ভারি ভারি ধারালো অস্ত্রশস্ত্র বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগল। বিকট গর্জনে বিজন বন ভয়ানক হয়ে উঠল। শত শত শিয়াল এল। মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে তাদের। ভীষণ নাদে বন কাঁপিয়ে তারা গর্জন করল। নিশাচররা মারমার কাট কাট করে এগিয়ে এল। কেউ বলল ঃ আস্ত গিলে ফ্যাল ছোঁড়াকে।

কিন্তু, ধ্রুব অটল, অবিচল।

এল সিংহ, উট, আরো নানা জানোয়ার। তাদের গর্জন তাড়ন কোন কিছুই কিছু করতে পারল না ধ্রুবের। তার মন বিষ্ণুময়, বিষ্ণুতেই সে নিমগ্ন। বাইরে নয়, ভিতরে নয়, বিষ্ণুতেই এঁটে বসে গেছে ধ্রুবের মন।

সব মায়া মিলিয়ে গেল। দেবতাদের ভাবনা বাড়ল। ওঁরা হরির শরণ নিলেন।

হরি শুনলেন দেবগণ বলছেন ঃ তিথিতে তিথিতে চাঁদের যেমন বৃদ্ধি, তপস্যায় তপস্যায় দিনে দিনে ধ্রুবের তেমনি ঋদ্ধি। আমরা ভীত। আপনার কাছে তাই আসা। আপনিই পারেন তপস্যা থেকে ধ্রুবকে বিরত করতে। ইন্দ্রত্ব, সূর্যত্ব এরকম একটা কিছু নিশ্চয়ই ধ্রুব চায়। দয়া করুন। হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ হয়ে আছে, তুলে আরাম করুন, ধ্রুবকে নিবৃত্ত করুন।

হরি ভরসা দিলেন ঃ ইন্দ্র সূর্য বরুণ বা কুবের কিছুই হতে চায় না ধ্রুব। যা চায় তা আমি দেব। তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাও। তপস্যা থেকে ওকে নিবৃত্ত করছি।

দেবতাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

হরি এলেন ধ্রুবের কাছে। তপস্যায় তিনি তুষ্ট। তাই বললেন ঃ মনকে আমাতে একান্ত নিবিষ্ট করতে পেরেছ। আমি খুশি। যে বর হয় নাও।

চোখ মেলে ধ্রুব চাইল। ধ্যানে দেখা হরিকে দেখল সামনে। ধ্রুব রোমাঞ্চিত হল। স্তব করতে চাইল। কিন্তু ভাষা পেল না, কথা এল না। তাই শরণ নিল যাঁর স্তব নিয়ে ভাবনা সেই তাঁরই।

শঙ্খের প্রান্তে হরি ধ্রুবকে স্পর্শ করলেন। স্তব উচ্চারিত হল ধ্রুবের কণ্ঠে।

হরি বললেন ঃ দেখা দিয়েছি, সবই তোমার সিদ্ধ হবে। বর চাও।

ধ্রুব বলল ঃ সকলের হৃদয়েই তুমি রয়েছ। আমার প্রার্থনা তো অগোচর

নয় তোমার। তবু যে দুর্লভ বস্তুর কামনা আমার তা বলব তোমাকে। দুর্লভই বা বলি কেন, তুমি প্রসন্ন হলে কিছুই তো আর দুর্লভ নয়।

বিমাতার কথা ধ্রুব জানাল। বলল: জগতে যার থেকে আর ভাল নেই এমন অব্যয় অক্ষয় স্থান আমাকে দাও।

ভগবান বললেন: তাই পাবে। আগের জন্মেও তুমি আমাকে খুশি করেছিলে। আমার উপর তোমার ভক্তি ছিল, পিতামাতাকে সেবা করতে, ব্রাহ্মণের ধর্ম পালন করতে। যখন তুমি যুবক তখন এক রাজপুত্র তোমার মিত্র হন। তাঁকে দেখে তোমার সাধ যায় রাজপুত্র হতে। তাই উত্তানপাদের ঘরে তোমার জন্ম। অন্যের পক্ষে এ জন্ম বর, তোমার পক্ষে তা নয়। যার মন আমার চিন্তায় মগ্ন সেই পাবে মুক্তি।

আজ থেকে সমস্ত তারাগ্রহের আশ্রয় তুমি। সূর্য, সোম, সোমপুত্র, বৃহস্পতি সপ্তর্ষি সবের উপর তোমাকে ধ্রুবস্থান দিলাম। কোন দেবতার আয়ু চার যুগ, কারও মন্বন্তর। কিন্তু তুমি কল্পকাল থাকবে। তোমার মাতা সুনীতিও তারকা হয়ে থাকবেন তোমার পাশে পাশেই। আর সকালে সন্ধ্যায় যে তোমার নাম গাইবে তার হবে মহৎ পুণ্য॥

৫. বেণ ও পৃথু

বরেণ্য সব ঋষি, পরম ঋষি। বরণ করলেন তাঁরা বেণকে। বেণ রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। কিন্তু তাঁকে মরতে হল ঐ ঋষিদেরই হাতে।

পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করলেন বেণ। ঘোষণা করলেন: যজ্ঞ করতে পারবে না কেউ, হোম করতেও না। দানধ্যানও চলবে না আমার রাজ্যে। আমিই যজ্ঞপতি প্রভু, অন্য কেউ নয়।

ঋষিরা বিচলিত হলেন। রাজাকে মিষ্টি কথায় বহু বোঝালেন। বললেন: সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর যিনি সেই হরিকে আমরা পুজো করব। মঙ্গল হবে তোমার, উপকার হবে রাজ্যের, প্রজাদেরও হবে হিত। বাদ সেধো না, যজ্ঞে তোমারও অংশ থাকবে। হরি প্রীত হবেন, তোমার সমস্ত কামনা পূরণ হবে। যাঁর রাজ্যে হরি পুজো পান সব পাওয়াই তাঁর পাওয়া হয়।

কিন্তু বেণের সেই এক রা। আসলে দোষ তাঁর রক্তের। মৃত্যুর মেয়ে সুনীথা, বেণ এই সুনীথার তনয়। মৃত্যুর স্বভাবে বহু দোষ। মাতামহের দোষ বেণের রক্তে। তিনি দুষ্ট। অহংকারে তাই ফেটে পড়লেন: আমাকেই পুজো করবে, আমার থেকে বড় কেউ নেই। কোথাকার কে এক হরি তাকে বলছ যজ্ঞেশ্বর! ব্রহ্মা, জনার্দন, শম্ভু, ইন্দ্রই বল বা বায়ু, যম, রবি, বরুণ,

ভূমি, ধাতা, পূষাই বল সবই আমার শরীরের মধ্যে। কারণ নৃপের মধ্যেই সমস্ত দেবতা। সর্বদেবময় তিনি। অতএব যেমন আজ্ঞা জারি করেছি তেমনটিই কর। পতিসেবাই যেমন পত্নীর ধর্ম, আমার আজ্ঞা পালনও পরম ধর্ম তোমাদের।

ঋষিরা বললেনঃ মহারাজ ভুল বুঝছেন। অতএব আজ্ঞা করুন যাতে আমরা হরির পুজো করতে পারি।

ফল হল না। বেণ আজ্ঞা দিলেন না। ঋষিরা ভীত হলেন, ধর্ম যায় যায়। ক্রুদ্ধ হলেন বেণের দম্ভ ও অহমিকায়। সকলে মিলে ঋষিরা বলে উঠলেনঃ মারো এই পাপকে। ভগবানের নিন্দে যার মুখে পৃথিবীর অধীশ্বর হবার যোগ্য সে নয়।

বেণ ভগবানের নিন্দা করেছিলেন। আগে থেকেই তাই মরে ছিলেন তিনি। ঋষিরা শুধু মন্ত্রপড়া কুশ দিয়ে বধ করলেন বেণকে।

ঋষিদের নজরে এবার অনেক কিছুই পড়ল। রাজ্যে চুরি শুরু হয়েছে। অরাজক রাজ্য, মজা যত চোর বদমাসের।

নিঃসন্তান বেণ। ঋষিরা যুক্তি করলেন। শুরু হল বেণের উরু মন্থন। উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন। মন্থনের ফলে বেণের উরু থেকে বেরুল পোড়া খুঁটির মতো বেঁটে থ্যাবড়া মুখো এক পুরুষ। বেরিয়েই সে বললঃ কি করব ?

ঋষিরা বললেনঃ নিষীদ। অর্থাৎ বস। তাই এর নাম হল নিষাদ। বেণের সমস্ত পাপ নিষাদ হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। এই নিষাদের ছেলেরাই বিন্ধ্যপর্বতে বাস করত। নিষাদ জাতি বলে এরাই নাম পেয়েছিল পরে।

মন্থন বন্ধ হল না। বেণের ডান হাত মন্থন করা হল। সৃষ্টি হল পৃথুর। আগুনের মত দীপ্তি ও তেজ ছড়াতে ছড়াতে জন্মালেন পৃথু। আকাশ থেকে আজগব নামে ধনু, দিব্য সব শর ও কবচ পড়ল। মহা পুণ্যবান এই পৃথু। তাই তাঁর জন্মে সবার মনে উপজাত হল আহ্লাদ। বেণের গতি হল। পচে মরছিলেন পুন্নাম নরকে। পুণ্যবান পৃথুর পিতা, ঠাঁই পেলেন তাই স্বর্গে।

পৃথুর অভিষেক হবে। জল ও রত্ন নিয়ে উপস্থিত হল তাবৎ নদী ও সমুদ্র। দেবতারা এলেন, সবাই এল। পিতামহ ব্রহ্মা সকলের সামনে স্নান করালেন পৃথুকে। পিতামহ দেখলেন, পৃথুর হাতে চক্রচিহ্ন। বুঝলেন পৃথু বিষ্ণুর অংশ। খুশি হলেন। যাঁকে দেবতারাও খাটো করতে পারেন না, দমাতে পারেন না, তাঁরই হাতে থাকে বিষ্ণুচিহ্ন চক্র।

বেণের শাসনে প্রজারা পীড়িত ছিল। পৃথু সেই প্রজাদের মন অনুরঞ্জিত করলেন। তাই তাঁর নাম হল রাজা। পৃথিবীর প্রথম রাজা পৃথু।

রাজা পৃথু সমুদ্রে গেলে জল স্তম্ভিত হত, বনে পর্বত পথ করে দিত। কখনো কোথাও হার হয়নি তাঁর। মাটি চষেই শস্য ফলল, ভাবনামাত্রই জুটতে থাকল খাদ্য। গোরু হল সর্বকামদুঘা, আর পুটকে পুটকে মধু। সুখের পর সুখ, আনন্দের পর আনন্দ। সুখ ও আনন্দের বন্যা বয়ে গেল পৃথিবীতে।

জন্মের পরই পৃথু যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞের নাম হল পৈতামহ যজ্ঞ। এই যজ্ঞেই সৃষ্টি হল মহামতি সূত ও প্রাজ্ঞ মাগধের।

মুনিরা বললেন তাঁদের দুজনকে ঃ তোমরা স্তব কর এই পৃথুর।

এঁরা বললেন ঃ এঁর কাজকর্ম গুণ কোন কিছুর পরিচয়ই তো জানা যায় নি। যশও ছড়িয়ে পড়েনি। অতএব কি নিয়ে স্তব করব ?

ঋষিরা বললেন ঃ যেরকম কাজ ইনি করবেন বা যে গুণের বিকাশ হবে এঁর স্বভাবে তার উপরই রচনা কর স্তব। পৃথু মহা সন্তুষ্ট। বললেন ঃ স্তবে যেমন যেমন গুণের বর্ণনা করবেন এঁরা, তাই স্বভাবে ফুটিয়ে তুলব আমি। যা কিছু বলবেন বর্জনীয়, বর্জন করব সে সবই।

স্তব করলেন সূত ও মাগধ। বললেন ঃ এই রাজা সত্যবাক্‌, দানশীল, সত্যসন্ধ, লজ্জাশীল, মৈত্র, ক্ষমাশীল, বিক্রান্ত, দুষ্টশাসন, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান, প্রিয়ভাষক, মান্যমানয়িতা, যজ্ঞরত, ব্রহ্মণ্য, সাধুসম্মত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী এবং ব্যবহারে স্থিত।

রাজা মন দিয়ে শুনলেন। কাজও করলেন ঐ মত। তারপর বিরাট এক যজ্ঞ করলেন।

যখন পৃথিবীতে অরাজক অবস্থা তখন সমস্ত ওষধি নষ্ট হয়। প্রজারা এল পৃথুর কাছে। বলল ঃ অরাজক সময়ে ধরিত্রী গ্রাস করেছে সমস্ত ওষধি। প্রজারা একে একে মারা পড়ছে। ভগবানের বিধানে আপনি আমাদের পালক, অতএব ক্ষুধার্ত প্রজাদের ক্ষুধা দূর করুন।

পৃথু ক্রুদ্ধ হলেন। হাতে তুলে নিলেন সেই আজগব ধনু। ধেয়ে চললেন বসুধার দিকে। বসুন্ধরা ভয় পেলেন। রূপ ধরলেন গোরুর। পালালেন একেবারে ব্রহ্মলোকে। কিন্তু যেখানেই যান সেখানেই পৃথু। হাতে উদ্যত ধনু। কাঁপতে কাঁপতে বসুন্ধরা বললেন ঃ মহারাজ নারীবধে মহাপাপ! শেষে কি তাই কুড়োবেন ?

রাজা বললেন ঃ যেখানে একের বধে অনেকের মঙ্গল সেখানে বধেই পুণ্য।

যাদের ভালোর জন্য আমাকে বধ করছেন সেই প্রজারা থাকবে কোথায় ?

শাসন মানছ না, তাই তোমাকে বধ করব। আর প্রজাদের ধারণ করব যোগবলে।

ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত বসুন্ধরা কাঁপতে থাকলেন। কাঁপতে কাঁপতেই বললেন ঃ উপায় অনুসারে কাজ করলে সবই সিদ্ধ হয়। উপায়

বলছি, যদি ইচ্ছে হয়, করুন। সব ওষধিই জীর্ণ করে ফেলেছি। যদি চান সবই আমি দেব। প্রজার হিতের জন্য আমাকে বৎস দান করুন। বৎসলা হয়ে আমি ক্ষরণ করব। আমাকে সমতল করুন যাতে সর্বত্র জন্মাতে পারে ওষধি।

পৃথু ধনুর সাহায্যে শতসহস্র পর্বত সরিয়ে দিলেন। সব মিলে জায়গায় জায়গায় সৃষ্টি হল বড় বড় পর্বতের। আগে পৃথিবী ছিল উঁচুনীচু। গ্রাম ছিল না, নগর ছিল না। শস্য চাষ আবাদ, গোরক্ষ কিছুই ছিল না। পৃথুই সম্ভব করেছেন সব। সমতল ক্ষেত্র—ওখানে থাকবে প্রজারা। এতদিন ফলমূল খেয়ে অতি কষ্টে ওরা বেঁচে ছিল। পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করে নিজে দোহন করলেন বসুন্ধরাকে। শস্য জন্মাল। আজও তাতেই প্রাণ ধারণ করে মানুষ। প্রাণদান করেছিলেন পৃথু, তাই ভূমির পিতা। বসুন্ধরারও পৃথিবী নাম ॥

৬• প্রচেতাগণের প্রজাসৃষ্টি

পিতা বললেন দশ পুত্রকে—প্রাচীনবর্হিঃ বললেন দশ প্রচেতাকে ঃ প্রজাপতি আমাকে প্রজাবৃদ্ধি করতে বলেছেন। আমি সম্মত হয়েছি। তোমরা প্রজাবৃদ্ধি কর। আমি প্রীত হব।

প্রচেতারা বললেন ঃ তাই হবে। কিন্তু কি উপায়ে ?

পিতা বললেন ঃ বিষ্ণুকে ভজনা করলে সব কিছুই সিদ্ধ হয়। অতএব সেই প্রভু হরি গোবিন্দের আরাধনা কর। তাঁকে আরাধনা করেই সৃষ্টি করেছিলেন প্রজাপতি। তোমরাও তাই কর।

দশ প্রচেতা সমুদ্রের জলে মগ্ন হয়ে দশ হাজার বছর তপস্যা করলেন। বিষ্ণুপদে বাঁধা পড়ল তাঁদের মন। সেই মনের বীণাতেই ঝংকার উঠল স্তবের।

বিষ্ণু দেখা দিলেন। পক্ষীরাজ গরুড়ের পিঠে বসে বিষ্ণু। নীল কমলের আভায় প্রচেতারা স্নিগ্ধ হলেন, মুগ্ধ হলেন। প্রণত প্রচেতাদের বিষ্ণু বললেন ঃ বর প্রার্থনা কর।

ওঁরা পিতার আদেশ প্রজাবৃদ্ধির কথা বললেন। বিষ্ণু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে অন্তর্হিত হলেন। দশ প্রচেতাও বেরিয়ে এলেন জল থেকে।

প্রচেতারা যখন তপস্যায়, পৃথিবীতে চাষ আবাদ বন্ধ ছিল সে সময়। বড় বড় গাছে এরই মধ্যে সারা পৃথিবী আবৃত হয়েছিল। বহু প্রজা ক্ষয়ও হয়েছিল এই কারণে।

আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল গাছে গাছে। বাতাস পথ পায়নি বইতে। প্রজারাও পারেনি চেষ্টা করতে।

প্রচেতারা রেগে আগুন হলেন। মুখ থেকে সৃষ্টি করলেন বায়ু ও অগ্নির। বড় বড় গাছকে উপড়ে শুষে ফেলতে লাগলেন বায়ু, অগ্নি করলেন ছাই।

বৃক্ষক্ষয়ে বিব্রত হলেন বৃক্ষরাজ সোম। কিছু থাকতে থাকতেই সোম বললেন প্রচেতাদের ঃ কোপ সংবরণ কর। আমার কথা শোন। একটা মিট-মাটে এস। ভবিষ্যৎ ভেবে অনেক দিন থেকে বৃক্ষজাত এক কন্যাকে সুধাময় কিরণে বড় করে তুলেছি। মারিষা তার নাম। ভার্যারূপে বরণ কর একে। প্রজাবৃদ্ধি হবে। তোমাদের ও আমার তেজ মিলে মারিষাতে জন্ম হবে দক্ষ প্রজাপতির। আমার স্নিগ্ধ প্রশান্তি আর তোমাদের অগ্নিসম তেজ মিলিয়ে মিশিয়ে তিনিই প্রজাবর্ধন করবেন।

সোম আরও বললেন ঃ অনেকদিন আগে কণ্ডু নামে এক মুনি গোমতীতীরে তপস্যা করছিলেন। সুরেন্দ্র অপ্সরা প্রম্লোচাকে নিযুক্ত করলেন মুনির তপোভঙ্গের কাজে। প্রম্লোচা মোহজাল বিস্তার করল। ঋষি চঞ্চল হলেন। বাঁধা পড়লেন মোহজালে। অপ্সরার রূপে মুনি মজলেন। মন্দর পর্বতের সানুদেশে প্রম্লোচাকে নিয়ে মেতে পড়লেন কণ্ডুমুনি। একশো বছর, হয়ত তারও কিছু বেশি সময় কেটে গেল।

একদিন প্রম্লোচা ঋষিকে জানাল ঃ স্বর্গে যেতে চাই, অনুমতি দাও।

মুনির তখনো ঘোর কাটেনি। বললেন ঃ আর কিছুদিন থাকো।

প্রম্লোচা আবার একশো বছরের উপর কাটিয়ে দিল। শুধু ভোগ আর উপভোগ। ভোগে উপভোগে কোথা দিয়ে যে সময় বয়ে গেল মুনির হুঁশও হল না।

প্রম্লোচা বলল ঃ আজ্ঞা কর, স্বর্গে যাই। মুনির সেই এক কথা ঃ থাকো না কিছুকাল। সময়ের স্রোত বইল। একশোর কিছু বেশি বছর অতিক্রান্ত হল।

ঃ আমি স্বর্গে যাই এবার।

আলিংগন করে আদর করে মুনি বললেন ঃ কিছুকাল থাকো, চিরদিনের জন্য তো যাবেই।

পাছে কণ্ডু শাপ দেন। ভয়ে ভয়ে থেকে যেতে হল তাই। এবার প্রায় দুশো বছর।

প্রম্লোচা যত বলে যাই যাই কণ্ডু ততই বলেন থাকো থাকো। স্বর্গে যাবার জন্য সদাই আনচান করে প্রম্লোচা। কিন্তু শাপের ভয়ে ছাড়তে পারল না ঋষিকে।

মোহ, বিকার, ভোগ, সুখে ডুবে রইলেন কণ্ডু। সময়ের পা থেমে থাকল না। চলল। কণ্ডু দেখতে পেলেন না। দেখলেও দেখলেন—অতি, অতিশয় মন্থর সে চলন।

একদিন ঘর থেকে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেরুলেন কণ্ডু। অপ্সরা সুধাল ঃ কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

মুনি বললেন ঃ বেলা পড়ে এল, সন্ধ্যায় উপাসনা করতে হবে। নইলে যে লোপ হবে ক্রিয়া।

হেসে বলল অপ্সরা ঃ আজই কি তোমার বেলা পড়ে এল ? এত বছরে কি তোমার মাত্র একদিন ? অবাক করলে যে !

আজ সকালেই তো আমার আশ্রমে ঢুকলে, আর এখন শেষ বেলা। এতে উপহাসের কি আছে ? আসল কথাটি কি শুনি।

প্রম্লোচা বলল ঃ আজ সকালে এসেছি ! হাসালে। কয়েকশো বছর হল এসেছি।

কণ্ডু ভয় পেলেন। সুধোলেন ঃ বল কি ? কতকাল তাহলে এভাবে বাস করলাম তোমার সঙ্গে ?

নশো সাতাশি বছর ছমাস তিনদিন।

ঠাট্টা না সত্যি ? আমার মনে হচ্ছে একদিন।

আজ নিজের কর্তব্য করতে চাইছ, তাই সুধিয়েছ, মিথ্যে কি করে বলি।

কণ্ডু নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকলেন ঃ ছি ছি আমার সমস্ত তপস্যাই মাটি হল। কে যে সৃষ্টি করেছে এই নারীকে ? আমি আত্মজয়ী, ব্রহ্মাকে জানার কথা আমার। সেই মতিকে যে হরণ করেছে শত ধিক তাকে। নরকের পথে টেনে নামায় এমন সঙ্গ করে ব্রত নষ্ট হল। ছি ছি।

প্রম্লোচা বসে ছিল। কণ্ডু তাকে বললেন ঃ যেখানে খুশি যাও। তপোভঙ্গ ঘটিয়েছ আমার। ক্রোধের আগুনে পোড়াব না তোমায়। কারণ বহুকাল তোমার সঙ্গে ঘর করেছি।···অবশ্য তোমার দোষই বা কি, রেগেই বা কি হবে তোমার উপরে, দোষী আমি নিজেই। আমিই ইন্দ্রিয়কে বশ করতে পারিনি। কিন্তু ইন্দ্রের মন যোগাতে গিয়ে আমার তপস্যা নষ্ট করেছ, তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

প্রম্লোচার শরীর কাঁপল। ঘেমে উঠল সে। কণ্ডু বললেন ঃ যাও যাও।

সেই অপ্সরা আশ্রম থেকে বেরিয়ে আকাশপথে চলবার সময় গাছের পাতায় ঘাম মুছেছিল। এ গাছ থেকে ও গাছ, ও গাছ থেকে সে গাছ, এইভাবে গাছে গাছে পাতায় পাতায় ঘাম মুছতে মুছতে প্রম্লোচা চলে গিয়েছিল। কণ্ডুর সন্তান ছিল প্রম্লোচার শরীরে। রোমকূপের পথে ঘাম হয়ে হয়ে তা বেরিয়ে পড়ল। গাছেরা তা ধারণ করল, আর এক জায়গায় করল হাওয়া। কিরণে

কিরণে তাকেই আমি বড় করে তুলেছি। সেই কন্যাই মারিষা। বৃক্ষেরা সেই মারিষাকে তুলে দেবে তোমাদের হাতে। অতএব কোপ প্রশমিত কর।

মারিষা তাই কণ্ডুর, আমার ও বায়ুর সন্তান। বৃক্ষ ও প্রম্লোচার তনয়া।

কণ্ডু বিষ্ণুর পুরুষোত্তম নামক জায়গায় গিয়ে ঊর্ধবাহু ও একাগ্র হয়ে ব্রহ্মপারময় মন্ত্র জপ করে হরির আরাধনা করেছিলেন।

প্রচেতারা বললেন ঃ সেই ব্রহ্মপার পরম স্তব আমাদের বলুন।

সোম স্তব বিবৃত করলেন। কণ্ডুর সিদ্ধিলাভের কথাও জানালেন। তারপর বললেন মারিষার আগের জন্মের কথা।

আগের জন্মে মারিষা রাজরাণী ছিল। রাজা মারা গেলেন। ছেলে-মেয়ে ছিল না। বিষ্ণুকে ডেকে ডেকে তুষ্ট করেছিল। ভগবান এলেন, বর দিতে চাইলেন।

বাল্যে বিধবা, জন্মটাই বৃথা গেল, বিফল হল। আপনার আশীর্বাদে জন্মে জন্মে যেন আমি ভাল স্বামী পাই। আর প্রজাপতির মত এক পুত্র।

এক জন্মেই দশ পতি পাবে তুমি। মহা মহা বীর তাঁরা, বিখ্যাত উদারকর্মা। প্রজাপতির মতো পুত্রও পাবে তুমি। তার বংশই জগতের কর্তৃত্ব করবে, তার সন্তানেই তিন ভুবন ভরে উঠবে।

সেই মারিষাই তোমাদের পত্নী হল।

প্রচেতাদের রাগ পড়ল। তারপর দক্ষ প্রজাপতির জন্ম ও প্রজাসৃষ্টি ॥

৭. দক্ষের প্রজাসৃষ্টি

প্রজাসৃষ্টিতে মনোযোগী হলেন দক্ষ। বহু পুত্রের জন্ম দিলেন।

ব্রহ্মা আদেশ করেছিলেন দক্ষকে ঃ সৃষ্টি কর। দক্ষ মনের দ্বারা সৃষ্টি করলেন চর, অচর, দ্বিপদ, চতুষ্পদ। অবশেষে জন্ম ষাট কন্যার। ধর্ম পেলেন দশ, কশ্যপ তের, আর সোম সাতাশ। দেব, দৈত্য, নাগদের জন্ম হল। গো, খগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও দানবদের জন্ম হল।

পরাশর বললেন ঃ সেই থেকে প্রজাসৃষ্টি হতে থাকল মৈথুনধর্মের পালনে। আগে সংকল্প, দর্শন বা স্পর্শ থেকেই হত প্রজাজন্ম। তপের বলে তপস্বীরাও সৃষ্টি করতেন প্রজা।

মৈত্রেয় বললেন ঃ শুনেছি দক্ষের জন্ম ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে। কিন্তু তিনিই আবার প্রচেতস হলেন। একই লোক, অথচ সোমের শ্বশুর এবং দৌহিত্র। সবটাই কেমন গোলমেলে লাগছে।

পরাশর বললেন ঃ মানুষের জীবনে জন্ম-মৃত্যুর নিত্যলীলা। এ এমন

এক প্রবাহ যার বিরাম নেই, ছেদ নেই। ঋষিদের দিব্যদৃষ্টি। ওঁরা মুগ্ধ হন না এতে। যুগে যুগে দক্ষ বা অন্য মুনিরা আসছেন যাচ্ছেন। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা আচ্ছন্ন হন না এতে। বয়সের বড়-ছোট ছিল না এঁদের মধ্যে, ছিল তপস্যাশক্তির ছোট-বড়।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন মৈত্রেয়ের। জানতে চাইলেন ঃ দেব, দানব, গন্ধর্ব, উরগ ও যক্ষদের উৎপত্তি ও বিস্তারের ইতিহাস।

পরাশর বললেন ঃ স্বয়ম্ভু দক্ষকে আদেশ করেছিলেন, প্রজা সৃষ্টি কর। দক্ষ সৃষ্টি করলেন। মন থেকে হল দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, অসুর ও পন্নগের সৃষ্টি। মন থেকে, অতএব মানসী প্রজা। বংশবৃদ্ধিও হল না তাই। মৈথুনধর্মের প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করলেন দক্ষ। বিবাহ করলেন বীরণ প্রজাপতির মহতী কন্যাকে। নাম অসিক্লী। অসিক্লী জননী হলেন পাঁচ হাজার পুত্রের। দেবর্ষি নারদ এলেন। বুঝলেন, প্রজা সংবিবর্ধনের ইচ্ছা এদের। বললেন, প্রজাসৃষ্টি করবে বলে যত্নশীল হয়েছ, তা হও। কিন্তু শোন—মনে হয়, তোমরা নিতান্তই অজ্ঞ। পৃথিবীর উপক্রম, অবসান ও মধ্য কোন কিছু সম্পর্কেই দেখছি কিছু জান না। জান না যখন, প্রজাসৃষ্টি করবে কি করে? অতএব আগে চেষ্টা কর, জান।

পাঁচ হাজার পুত্র চারিদিকে চলে গেল। নদী সাগরে মেশে, ফিরে আসে না। ওরাও আর ফিরল না।

দক্ষ আরো হাজার হাজার পুত্রের জন্ম দিলেন। শবলাশ্ব এদের নাম।

নারদ এলেন। এদেরও বললেন, যেমন বলেছিলেন হর্যশ্বগণকে। শবলাশ্বরা ভাবল মুনির কথা মন্দ নয়। ভাইদের অনুসরণ করা তাদেরও উচিত। ভাবনা যেমন কাজও হল তেমনি। এরাও গেল। আর ফিরল না। সেই থেকে নিখোঁজ ভাইয়ের খোঁজে ভাই গেলে প্রায়ই নিখোঁজ হয় সেও।

পুত্ররা নিখোঁজ। দায়ী নারদ। দক্ষ শাপ দিলেন নারদকে। এরপরই জন্ম ষাট কন্যার। ষাটের মধ্যে ধর্ম পেলেন দশ, কশ্যপ তের, সোম সাতাশ, অরিষ্টনেমি চার, বহুপুত্র পেলেন দুই। আর পেলেন আঙ্গিরস ও কৃশাশ্ব—ইনিও দুই, উনিও দুই॥

৮. প্রহ্লাদ

দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু। দাপটে প্রচণ্ড। দেবতারাও হিরণ্যকশিপুর দাপটে রব তুললেন ত্রাহি ত্রাহি। অবশেষে দেবদেহ ছেড়ে ধরতে হল নরদেহ, স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে ঘুরে ঘুরে হতে হল হন্দ।

ব্রহ্মার বরেই হিরণ্যকশিপুর এত শক্তি। তিন ভুবন এনে ফেলল হাতের মুঠোয়। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গেল, হিরণ্যকশিপু হল ইন্দ্র। সূর্য, বায়ু ও অগ্নি নিষ্প্রভ হলেন। সোম, কুবের, বরুণ ও যম ক্ষমতাচ্যুত হলেন। সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করল দুরন্ত হিরণ্যকশিপু। যজ্ঞ হত শত শত। হিরণ্যকশিপুই গ্রহণ করত তাবৎ যজ্ঞভাগ।

দুর্ধর্ষ দৈত্য হিরণ্যকশিপু। পায়ের তলায় তিন ভুবন, মুঠোর মধ্যে তিন ভুবনের ঐশ্বর্য।

পরম প্রসন্ন হিরণ্যকশিপু। কর্ণে মধুস্রোত—গন্ধর্বদের গান ও সহস্র স্তুতি, সিদ্ধ ও পন্নগদের নিরন্তর উপাসনা। প্রবল জয়ধ্বনি, নিত্য গীতবাদ্য, স্ফটিকের মনোরম প্রাসাদে অপ্সরাদের রম্য নৃত্য—অবিরল, অবিরাম। মুদিত নয়নে আলস্যবিলাসে সুখাবশ হত দানব হিরণ্যকশিপু, মদিরার স্রোত বইলে স্বর্ণোজ্জ্বল স্বপ্নারামে ডুব দিত নিশ্চিন্ত পুলকে।

এই দানবরাজেরই শিশুপুত্র প্রহ্লাদ। গুরুগৃহে প্রহ্লাদ পড়াশুনা করে। ছোটদের পড়া পড়ে।

গুরু এসেছেন রাজসভায়। সঙ্গে শিষ্য প্রহ্লাদ। পানাসক্ত পিতা হিরণ্যকশিপু। প্রণত প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হাতে ধরে সমাদরে উঠাল। সুধাল ঃ যা এতদিন শিক্ষা করেছ তার সারকথা শোনাও।

প্রহ্লাদ বলল ঃ যথা আজ্ঞা, তবে যা মনে আছে তাই বলছি। যাঁর আদি মধ্য ও অন্ত নেই, বৃদ্ধিও নেই ক্ষয়ও নেই, যিনি সমস্ত কারণের কারণ—সেই অচ্যুত মহাত্মাকে আমার প্রণাম।

ক্রোধে হিরণ্যকশিপুর চোখ লাল হল, ঠোঁট কাঁপতে থাকল। গুরুকে বলল ঃ আমাকে অবজ্ঞা করে শত্রুর স্তব! যত সব বাজে যা-ইচ্ছে-তাই শিক্ষা দিয়েছ।

গুরু বললেন ঃ আগেই রুষ্ট হয়ো না, প্রহ্লাদ আমার শেখানো কথা বলছে না।

হিরণ্যকশিপু পুত্রকে প্রশ্ন করল ঃ গুরু বলছেন তিনি নন, তবে কে শিখিয়েছে এসব কথা?

ঃ আমার হৃদয়ে বিষ্ণু। জগৎকে তিনি শেখান। সেই পরমাত্মা ছাড়া কে কাকে শেখায়!

দৈত্যরাজ হেঁকে বলল ঃ এত সাহস যে আমারই সামনে কে না কে তাকে বলছ জগতের ঈশ্বর! কে এই বিষ্ণু?

প্রহ্লাদ বলল ঃ যাঁকে শোনা যায় না, দেখা যায় না, যাঁর থেকে এই বিশ্ব এবং যিনি স্বয়ংই বিশ্ব সেই পরমেশ্বরই বিষ্ণু।

ঃ আমি থাকতে অন্য পরমেশ্বর আবার কে?

ঃ কেবল আমার নন, সমস্ত প্রজার এবং আপনারও ধাতাবিধাতা ও পরমেশ্বর ঐ বিষ্ণুই।

ঃ নির্ঘাৎ মহাপাপ এর মনে প্রবেশ করেছে। তাই আবেশের ঘোরে প্রলাপ বকছে।

ঃ তিনি কেবল আমার হৃদয়েই নন, সর্ব হৃদয়ে তাঁর বাস। আমি আপনি সকলেই তাঁর শক্তিতে, তাঁরই ইচ্ছাতে চলছি ফিরছি উঠছি বসছি।

ঃ ওরে কে আছিস? এই মুহূর্তে ওকে দূর করে দে। প্রলাপ শিক্ষা করেছে। কেবল প্রলাপ। পিতাকে শোনাচ্ছে সেই প্রলাপ। শাসন, প্রচণ্ড শাসন দরকার! গুরুগৃহে যেন তাই করা হয়।

প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে পাঠানো হল। গুরুসেবায় প্রহ্লাদের বহুদিন কেটে গেল।

আবার একদা হিরণ্যকশিপু ডেকে পাঠাল পুত্রকে। বলল ঃ একটি গাথা আবৃত্তি কর।

প্রহ্লাদ বলল ঃ যাঁর থেকে প্রধান ও পুরুষ এবং এই চরাচর, যিনি সমস্ত জগতের কারণ সেই বিষ্ণু যেন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন।

ঃ এর বেঁচে থাকাতে দেখছি মহাক্ষতি, নিতান্তই কুলাঙ্গার। বধ কর, বধ কর।

রাজার আদেশে অস্ত্র উঁচিয়ে হাজার দৈত্য ধেয়ে এল।

প্রহ্লাদ বলল ঃ আমাতে বিষ্ণু, তোমাদের অস্ত্রেও বিষ্ণু, তাই অস্ত্রে যেন বিদ্ধ না হই।

শত শত অস্ত্রের আঘাত এসে পড়ল প্রহ্লাদের উপর। কিন্তু অক্ষত রইল প্রহ্লাদ।

হিরণ্যকশিপু বলল ঃ শত্রুর স্তব ছাড়, অভয় দিচ্ছি।···বোকামি ক'র না।

ঃ যিনি সব ভয় দূর করেন সে অনন্ত আমার হৃদয়ে। ভয়ও তাই দূরে, বহু দূরে।

ঃ সর্পেরা শোন, এদিকে এস। এই দুরাচারকে এখুনি দংশনে দংশনে বিষে বিষে জর্জরিত ও বিনাশ কর।

এল কুলক, অন্ধক, তক্ষক। দংশন করতে থাকল প্রহ্লাদকে। কিন্তু পরম আহ্লাদে প্রহ্লাদ মনকে সংস্থিত করল কৃষ্ণে। শরীরের বিষয়ে তাই জানতে পারল না কিছুই।

সর্পেরা প্রহ্লাদের গা ভেদ করতে পারল না। বলল ঃ হে দৈত্যরাজ, দাঁতে আর জোর নেই, মণি টনটন করছে, ফণা উত্তপ্ত হয়েছে, বুক কাঁপছে। অন্য কিছু আদেশ করুন আমাদের।

এবার হস্তীদের পালা। হিরণ্যকশিপুর হুকুম ধ্বনিত হল ঃ শত্রু ভাঙ্গিয়ে

নিয়েছে একে। পরস্পর দাঁতে দাঁতে মিলিত হয়ে বধ কর, বধ কর।...কাঠ থেকেই আগুন, অথচ কাঠকেই পোড়ায়; আমার থেকে পুত্র, অথচ আমারই বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাহাড়ের মতে সব হস্তী। প্রহ্লাদকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। দাঁতে দাঁতে পিষল তাকে। কিন্তু ব্যর্থ হল সব। দুর্বল হয়ে এল তাদের দাঁত। প্রহ্লাদ বলল: চোখা পাথরের মত ঐ সাংঘাতিক দাঁতের যে ঐ হাল হল সে আমার শক্তিতে নয়। জনার্দনকে স্মরণ করেছিলাম। বিপদবিনাশন তিনি। সবই তাঁর প্রভাব।

হিরণ্যকশিপু হুংকার দিয়ে সরে যেতে বলল হস্তীবাহিনীকে। অসুরদের বলল: আগুন জ্বালো, বায়ু বাড়িয়ে দিক আগুনকে। পুড়িয়ে মারো এই পাপকে।

চারিদিকে আগুন, শুধু আগুন। বায়ুর সহায়তায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। প্রহ্লাদ সেই আগুনের মধ্য থেকে বলল: আগুন আমাকে পোড়াতে পারছে না, আমার চারিদিকে পদ্মের আস্তরণ—শীতল, স্নিগ্ধ, কোমল।

ষণ্ডমার্ক প্রভৃতি পুরোহিত হিরণ্যকশিপুকে মিষ্টি করে বুঝিয়ে বলল: নিজের ছেলে, নিতান্ত শিশু, দোষ তো করবেই। তার উপর রাগ করা কি ঠিক? যদি করতেই হয় তাহলে করা উচিত দেবতাদের উপর। ফল ফলবে সে রাগে। প্রহ্লাদকে আমরা শাসন করব, বারণ করব। এমনটি থাকবে না আর। যদি 'হরি হরি' না ছাড়ে তাহলে আমরাই না হয় বধের ব্যবস্থা করব।

দৈত্যরাজের মন ভিজল। প্রহ্লাদকে আগুনের মধ্য থেকে বের করা হল। গুরুর বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। গুরু উপদেশ দিলেন প্রচুর। প্রহ্লাদ পড়াতে লাগলেন দানবশিশুদের। কিন্তু দিতে লাগলেন অন্য পাঠ:

জীবজন্তুর জন্ম হয়। প্রথমে ছোট থাকে, তারপর বড় হয়, বুড়ো হয়, জরা আসে, মৃত্যু আসে। এখানেই শেষ নয়, দুঃখের ঘানিতে ঘুরে ঘুরে আর এক জন্ম। শীত নিবারণ হল, খিদে মিটল, পিপাসা গেল—যারা মূর্খ তারাই এসবকে সুখ বলে মানে। আসলে এসবও দুঃখের। শরীর যাদের জড় হয়েছে ব্যায়াম করে তারা সুখ পায়। চোখে যাদের ভুলের ঠুলি, মন যাদের কামী, মেয়েদের লাথিতেও তারা খুশি, ভাবে নূপুর বাজল, আহা কি সুন্দর! শরীরে নাকি কান্তি সৌরভ সৌন্দর্য। কিন্তু কিছুই নেই আদৌ। শরীর যা তা হল রক্তমাংস পুঁজ মজ্জা ইত্যাদির একটি পিণ্ড। যে এই শরীরকে ভালবাসে নরকও তার ভাল লাগবে।

ভাল যা লাগে তার সঙ্গে সম্বন্ধ কর, সুখ পাও। কিন্তু যতটুকু পাও অন্তরে শোকের শেল ঠিক ততটুকুই বেঁধে। বিদেশে গেলে বাড়ির বিষয়-আশয়

মানুষকে ভাবায়। সব সময় ভয়ভাবনা : হয়ত নষ্ট হল, পুড়ে গেল, কিংবা চুরি যাবে, হয়ও হয়ত তাই। সেই জন্যই কোন বস্তুতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। জন্ম দুঃখের, জীবন দুঃখের, জগৎজোড়া দুঃখেরই আগুন জ্বলছে, কেবলই জ্বলছে, জ্বলে জ্বলেও শেষ মানছে না। এই আগুনের সমুদ্র পার করতে পারেন বিষ্ণু।

তোমরা ছোট, তাই জান না যে আত্মা নিত্য। রূপ যৌবন এসব দেহের ধর্ম, আত্মার নয়। এখন ভাবছ : ছোট আছি, হাসি খেলি ; বড় হই, তখন ভাবা যাবে আত্মার উন্নতির কথা। বড় হলে, ভাবলে : বুড়ো হই, তখন ভাবা যাবে ওসব কথা। বুড়ো হলে, মনে মনে বললে : বুড়ো হয়েছি, শরীরে জুৎ নেই তেমন, ইন্দ্রিয়গুলো সব আয়ত্তের বাইরে। যাকগে বয়সকালে করিনি যখন, তখন এই জরজর শরীরে নাই বা করলাম কিছু।

বিষয় আশয়েই মন যাদের, জীবনটা তাদের এই ভাবেই কাটে। কিন্তু এরা ত অজ্ঞ। যারা তা নয় তারা ছোট থেকেই শ্রেয় পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। আমার কথা যদি সত্যি মনে হয় তাহলে বিষ্ণু স্মরণ কর। স্মরণে তো আয়াস নেই তেমন, অথচ ওতেই তিনি ভাল করেন। জগতের সমস্ত কিছুতেই বিষ্ণু। জগতে এত কিছু, আসলে এক। তাই সব কিছুকেই নিজের মত দেখ, অসুর ভাব ছাড়, দেখবে মুক্তি আসবে এগিয়ে। মনে যদি এই সমভাব, তা হলেই বিষ্ণুর পুজা।

প্রহ্লাদের এই সব কথায় দানবদের মনে ভয় ঢুকে গেল। রাজাকে গিয়ে তারা নিবেদন করল।

হিরণ্যকশিপু রাঁধুনিদের ডেকে বলল : অন্য ছেলেদেরও কুপথে নিয়ে যাচ্ছে প্রহ্লাদ, অতএব চুপিচুপি খাবারে হলাহল মিশিয়ে মেরে ফেল ওকে। ইতিউতি কর না কোন।

বিষ মেশানো খাবার। প্রহ্লাদ খেল। বিষ্ণুনাম তার মুখে, মনে। বিষ হয়ে গেল অমৃত। রাঁধুনিরা এ তত্ত্ব জানে না। ভাবল : ভয়ানক বিষ হজম করে ফেলেছে ছেলে, না জানি কি ব্যাপার। রাঁধুনিরা ভয় পেল। রাজাকে গিয়ে সব কথা জানাল। রাজা পুরোহিতদের বলল : আর দেরি নয়, কৃত্যা তৈরি কর।

পুরোহিতরা নরম সুরে প্রহ্লাদকে বললেন : এতবড় কুলে তোমার জন্ম। দেবদেবতা অনন্ত এসবে কি দরকার তোমার ? সর্বলোকের আশ্রয় তোমার পিতা, তোমারও আশ্রয়, সে রকম ব্যবহার তো কর না, কিন্তু করা উচিত। বিপক্ষের স্তবটব ত্যাগ কর। পিতাই পরম গুরু।

প্রহ্লাদ বলল : এ সবই সত্য, আমি জানি এবং মানিও। কিন্তু ঐ যে

বললেন অনন্তে কি হয়, কি দরকার, ও কথায় বহু দোষ। আসলে কথাটি ডাহা মিথ্যা।

প্রহ্লাদ থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটু হেসে বলল ঃ অনন্তে কি হয়— বলিহারি কথা। গুরুদের লক্ষ্য করে বলল ঃ ধন্য আপনারা। হয়ত চটবেন, কিন্তু একথা কি কেউ অস্বীকার করে যে ধর্ম-অর্থ, কাম-মোক্ষ অনন্ত থেকেই হয়। আপনারা আমার গুরু, বেশি কথা বাহুল্য।

ওঁরা বললেন ঃ আর বল না। নিতান্ত মূর্খ, তাই বুঝছ না। আগুনে তো পুড়ে মরছিলে। আমরা ছিলাম, তাই বাঁচলে।...যে সব কথা বল সে সব বলা ছাড়। তোমার হিতের জন্যই আমরা বলছি। যদি না শোন তাহলে তোমার মরণ নিশ্চিত। আমরাই কৃত্যা তৈরি করব।

প্রহ্লাদ বলল ঃ কেউ কাউকে নাশও করে না, রক্ষাও না। সৎ এবং অসৎ আচবণ করে আত্মাই আত্মার রক্ষা ও সংহার করে।

পুরোহিতরা অসহিষ্ণু হলেন। ভয়ংকর কৃত্যা সৃষ্টি করলেন। পায়ে মাটি ক্ষত বিক্ষত করতে করতে প্রচণ্ড ক্রোধে সেই কৃত্যা শূলের দ্বাবা প্রহ্লাদের বুকে আঘাত করতে থাকল। প্রদীপ্ত সেই শূল তার বুকে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। যে বুকে ভগবান বিষ্ণু, বজ্রও সেখানে ব্যর্থ, শূল তো ছার। যে পাপ করেনি তার প্রতি হয়েছে কৃত্যার প্রয়োগ। তাই ফল হল উলটো। মন্ত্রচালিত সেই আগ্নেয় অস্ত্র পুরোহিতদের পুড়িয়ে নির্বাপিত হল।

প্রহ্লাদ ছুটে গেল তাঁদের রক্ষা করতে। মুখে ত্রাহি কৃষ্ণ, ত্রাহি অনন্ত ধ্বনি। প্রহ্লাদ বলল ঃ বিষ্ণু সর্বভূতে, একথা চিন্তা করেই আমি রক্ষা পেয়েছি। এঁদের বেলাতেও তাই চিন্তা করছি। অতএব এঁরা বেঁচে উঠুন। যারা যারা এর আগে আমাকে বধ করতে চেষ্টা করেছিল, তাদের অনিষ্ট ভাবিনি কোন, তাই তাদের ক্ষতিও হয় নি কোন। সেই সত্যে এঁরাও বেঁচে উঠুন।

প্রহ্লাদের স্পর্শে পুরোহিতরা ত্রাণ পেলেন।

হিরণ্যকশিপুর মনে চিন্তা ঘনীভূত হল! প্রহ্লাদকে ডেকে সুধাল ঃ তোমার এ শক্তির উৎস কি? এ কি মন্ত্রশক্তি, না স্বাভাবিক?

ঃ মন্ত্রেরও নয়, স্বভাবেরও নয়। যার হৃদয়ে বিষ্ণুর বাস এ তাদের সামান্য প্রভাব। নিজের বেলায় যেমন অন্যের বেলায়ও তেমন অনিষ্ট চিন্তা যে করে না দুঃখ তাকে স্পর্শ করে না। যার কাজেকর্মে কথায় অন্যে পীড়িত হয় তার বেলায় অশুভ ফল ফলে। আমাতে কেশব, অন্য সবে কেশব, তাই কারও অনিষ্ট ইচ্ছে করিনে আমি। সদাই শুভ আমার মন, দুঃখও তাই ঘেঁষতে পারে না আমার ধারে কাছে।

প্রাসাদশিখরে হিরণ্যকশিপু। পুত্রের মুখে সেই একই কথা। শুনল, কিন্তু রাগে প্রজ্বলিত হল। অনুচরদের আদেশ করল ঃ প্রাসাদের চূড়ো

থেকে ছ‍ুঁড়ে ফেল ওকে। ফেল, একেবারে পাহাড়ের উপর, হাড়গোড় গ‍ুঁড়িয়ে যায় যাতে।

দৈত্যদানবরা প্রচণ্ড শক্তিতে প্রহ্লাদকে ছ‍ুঁড়ে ফেলল। প্রহ্লাদ পড়তে থাকল নিচে নিচে অনেক নিচে। কিন্তু মনে তার ভয় ছিল না, হরি ছিলেন। হরির কথাই প্রহ্লাদ ভাবছিল। ভাবছিল অনন্যমনা হয়ে। জগদ্ধাত্রী প‍ৃথিবী কোল বাড়িয়ে তাকে ধারণ করলেন।

হিরণ্যকশিপ‍ু দেখল সব ব্যর্থ হল। যেমন ছিল ঠিক তেমনই রইল প্রহ্লাদ। তেমনই স‍ুস্থ, সবল। হিরণ্যকশিপ‍ু আত্মহারা হল। শম্বরকে বলল ঃ তুমি মায়া জান, বহ‍ু মায়া। আমরা পারছিনে, কিন্তু তুমি পারবে। মায়াতে মায়াতে আচ্ছন্ন কর ওকে, বধ কর।

ভরসা দিল শম্বর। অহংকার করে বলল ঃ কোটি কোটি মায়া আমার জানা, দেখ কত তার শক্তি।

অস‍ুর শম্বর মায়ার জাল ব‍ুনল, বিছাল। প্রহ্লাদ বিপদগ্রস্ত। মধ‍ুস‍ূদনকে তাই স্মরণ করল।

কোনদিকে কিছ‍ু নয়, কিছ‍ু ছিল না। অথচ কোথা থেকে কি হল, প্রদীপ্ত স‍ুদর্শনচক্র এসে দাঁড়াল। প্রহ্লাদের চারিদিকে হাজারো মায়া। স‍ুদর্শনচক্রে সমস্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হল।

আবার হিরণ্যকশিপ‍ুর দ‍ৃপ্ত আদেশ।

সংশোষক বায়‍ু প্রবিষ্ট হল প্রহ্লাদের শরীরে। ভিতরে ভিতরে শোষিত হতে থাকল প্রহ্লাদ। অতি র‍ুক্ষ স‍ুদ‍ুঃসহ সে বায়‍ু। প্রহ্লাদের হৃদয়ে জনার্দন। ক্ষ‍ুব্ধ হলেন তিনি। গিলে ফেলে শেষ করলেন সে বায়‍ুকে।

আবার গ‍ুর‍ুগ‍ৃহ। শ‍ুক্রাচার্যের নীতি শেখাতে লাগলেন গ‍ুর‍ু। সময় এল। গ‍ুর‍ুর বিশ্বাস হল প্রহ্লাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। দৈত্যেশ্বরকে বললেন ঃ তোমার প‍ুত্র এখন শিক্ষিত। শ‍ুক্রাচার্যের নীতিশাস্ত্র ঠিকঠিকই আয়ত্ত করেছে প্রহ্লাদ।

হিরণ্যকশিপ‍ু প্রশ্ন করল ঃ ভাল সময়ে, মন্দ সময়ে, ভালমন্দ সময়ে শত্র‍ু মিত্র ও মধ্যস্থের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা রাজার উচিত ? মন্ত্রী, অমাত্য, বর, চোর, দাস, ঘরের লোক ও বাইরের লোক এদের সঙ্গেই বা রাজা কি রকম ব্যবহার করবেন ? এসব তো শিখেছই, এসব তো বলবেই, তাছাড়াও আরও যা যা শিখেছ একে একে সব আমাকে বল।

করজোড়ে পরম বিনয়ে বলতে লাগল প্রহ্লাদ ঃ গ‍ুর‍ু এর সবই আমাকে শিখিয়েছেন, আমি শিখেছিও। কিন্তু আমার বিবেচনায় এসব নীতি ভাল নয়, আদো। শ‍ুনে হয়ত রাগ করবেন। কিন্তু শত্র‍ু মিত্র কাউকেই দেখছিনে আমি। শত্র‍ু মিত্র দেবতা মান‍ুষ পশ‍ুপাখি আলাদা আলাদা বটে, কিন্তু সবই বিষ্ণ‍ুর

রূপ। আমাতে বিষ্ণু, আপনাতে বিষ্ণু, সবেতেই তিনি।

রাগে নিজেকে হারিয়ে ফেলল হিরণ্যকশিপু। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সিংহাসন থেকে। প্রহ্লাদের বুকে পড়ল প্রচণ্ড এক পদপ্রহার। রাগ যেন আগুন হল। একটা পাহাড়, যেন জ্বলল দাউ দাউ করে। মনে হল সমস্ত জগৎ জ্বালিয়ে দিতে চাইছে দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপু। হাতে হাত পিষল। চিৎকার করে বলল ঃ নাগপাশে একে বাঁধ, সমুদ্রে ফেলে দাও, দেরি নয়, এই মুহূর্তে। দুষ্টের শেষ রাখতে নেই। ফেল, এখুনি, দেরি নয়। নইলে দানবরা সকলেই এর মতবুদ্ধিতে গোল্লায় যাবে।

প্রহ্লাদ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হল। প্রহ্লাদ বিচলিত হল। মহাসমুদ্রও বিচলিত হল, ক্ষুব্ধ হল, ঢেউয়ে ঢেউয়ে উদ্বেল হল। চারিদিকে সেই উদ্বেলিত সমুদ্রের জল। প্লাবন বইল।

হিরণ্যকশিপু উন্মত্ত। বলল ঃ সমস্ত পাহাড়-পর্বত এনে সমুদ্রে ফেল। পাহাড়ে পাহাড়ে ঢেকে ফেল এই মহাশত্রুকে। হাজার বছর থাকুক এই মহা-ভারের নিচে। তারপর নিশ্চিত মরবেই। আগুনে পোড়ানো যাচ্ছে না, সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। বিষ, কৃত্যা, সর্পদংশন কোন কিছুতেই এঁটে উঠা যাচ্ছে না একে। দুষ্ট, মহাদুষ্ট এই পুত্র।

পর্বতে পর্বতে প্রহ্লাদ আচ্ছাদিত হল। স্তব করতে থাকল বিষ্ণুর ঃ হে পুরুষোত্তম তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।

স্তবে তন্ময় আত্মহারা প্রহ্লাদ। নিজেকে এক করে ভাবল বিষ্ণুর সঙ্গে। বিষ্ণুকে ছাড়া কিছুই জানতে পারল না প্রহ্লাদ। শুদ্ধ অন্তঃকরণে বিষ্ণুর আসন পাতা হল, বিষ্ণুর অধিষ্ঠান হল।

নাগপাশ ছিন্ন হল, ঢেউয়ে ঢেউয়ে সমুদ্র পাগল হল, পৃথিবী কাঁপতে থাকল। সমস্ত পাহাড় উৎক্ষিপ্ত হল উপরে। জলের জগৎ থেকে প্রহ্লাদ বেরিয়ে এসে দাঁড়াল শক্ত মাটির উপর খোলা আকাশের নিচে আর 'আমি প্রহ্লাদ' এই বোধের ধাপে।

বিষ্ণুর স্তব করল প্রহ্লাদ। বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন। বললেন ঃ বর গ্রহণ কর।

ঃ জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার মতি থাকে, ভক্তি থাকে।

ঃ থাকবে। কিন্তু কি বর চাই তোমার ?

ঃ বর নিয়ে কি হবে প্রভু, তুমিই তো সব কিছুর মূল, তোমার দর্শনই তো মিলল। তোমার উপর ভক্তি যদি অচলা হয় মুক্তি তাহলে হাতের মুঠোয়। আমার যেন তাই হয়।

ঃ তোমার মনে যে ভক্তি তাতেই আসবে তোমার মুক্তি। বিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন। প্রহ্লাদ ফিরে এল। চরণবন্দনা করল পিতার।

হিরণ্যকশিপু পুত্রকে আলিঙ্গন করল পরম স্নেহে। তার চোখে টলটল করছে জল। যাকে জেনেছে মৃত বলে সে এসেছে ফিরে। নিজের ব্যবহারের কথা স্মরণ হল হিরণ্যকশিপুর। অনুতাপ আগুন হল, অন্তরে সঞ্চারিত হল অনন্ত জ্বালা।

কিন্তু তবু হিরণ্যকশিপুকে মরতে হল। নৃসিংহের রূপ ধরে বিষ্ণু তাকে বধ করলেন। প্রহ্লাদ হলেন রাজা। তারপর প্রজাপালন, বংশ বিস্তার, প্রারব্ধক্ষয়, এবং পরিশেষে মুক্তি ॥

৯. মরুৎ

গন্ধর্ব, সর্প, দেব ও দানবদের বিরোধে দিতির বহু সন্তান বিনষ্ট হয়েছে। দিতি তাই তপে বসেছেন। কশ্যপের আরাধনায় নিবেদিত তাঁর মনপ্রাণ। তপস্যা পূর্ণ হল। কশ্যপ বর দিতে চাইলেন। দিতি বললেনঃ এমন এক পুত্র দাও যে ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে।

কশ্যপ বর দিলেন। অতিশয় উগ্র সে বর। দিতিকে বললেনঃ হাজার বছর, ধারণ করতে হবে গর্ভ। সদা থাকতে হবে শৌচবতী. আর বিষ্ণুপদে রাখতে হবে নিত্য মতি। যদি পার তাহলেই তোমার পুত্র নিহত করতে পারবে ইন্দ্রকে।

কশ্যপ সঙ্গত হলেন। দিতি শৌচাচারী হয়ে গর্ভ ধারণ করলেন।

ইন্দ্র জানলেন দিতির গর্ভে পুষ্ট হচ্ছে তাঁর মৃত্যুবাণ। ইন্দ্র এলেন। পরম বিনীত ইন্দ্র—সদা শুশ্রূষাপরায়ণ।

দিতির কাছে কাছে পাশে পাশেই রইলেন দেবরাজ ইন্দ্র। দুচোখ যেন বহু করে মেলে প্রতীক্ষায় রইলেন তিনি। শৌচাচারে কখনও যদি কোন ত্রুটি হয়, যদি মেলে সামান্য ছিদ্র, তাহলেই সিদ্ধ হবে তাঁর উদ্দেশ্য।

নিরানব্বই বছর কাটল। নিরাশ হয়ে হয়ে বিরস বিষণ্ণ ইন্দ্র। অবশেষে উৎফুল্ল হলেন। সুযোগ এসেছে। দিতি আচারভ্রষ্ট হয়েছেন। ইন্দ্র দেখলেন, পা না ধুয়ে দিতি গেলেন শয়নে।

নিদ্রিত দিতি। ইন্দ্রের হাতে উদ্যত বজ্র। ইন্দ্র প্রবেশ করলেন দিতির গর্ভে। বজ্রে কেটে সাতখান করলেন সেই মহাগর্ভ।

গর্ভ ছিন্নঃ রোদন করতে লাগল, দারুণ শব্দে আকাশ ভরল, বাতাস কাঁপল।

ইন্দ্র বলতে থাকলেন, বারবার বললেনঃ রোদন কর না, রোদন কর না, কর না, কর না।

অবশেষে ইন্দ্র কুপিত হলেন। সাতখণ্ড, এক এক খণ্ডকে আরো সাত সাত ভাগে কাটলেন।

ঊনপঞ্চাশ অংশই হলেন দেবতা। প্রচণ্ড বেগ হল এঁদের। সহায় হলেন

ইন্দ্রের। নাম পেলেন মরুৎ। ইন্দ্র বলেছিলেন, রোদন কর না, রোদন কর না, তাই নাম হল মরুৎ ॥

১০. জড়ভরতের মুক্তি

অতবড় রাজা ভরত, কিন্তু সুখী ছিলেন না। জেঁকে বসলেন তাই তপে। রাজ্য-রাজধানী ছেড়ে শালগ্রামে এসে বিষ্ণুর আরাধনায় ভরত মনপ্রাণ সঁপে দিলেন। দিনরাত্রি সমস্ত সময় বিষ্ণুর কথাই তিনি ভাবেন। অন্য কোন ভাবনা ঠাঁই পেত না তাঁর মনে। তথাপি ভরত মুক্তি পেলেন না।

জপে ধ্যানে শালগ্রামেই বহুকাল কাটল ভরতের। নিরন্তর বিষ্ণু-আরাধনায় তাঁর মন প্রশান্ত হল, প্রসারিত হল। ভরতের মুখে সর্বক্ষণ গোবিন্দ, মাধব, কেশব, কৃষ্ণ। অন্য কথায় জিহ্বা যেত জড়িয়ে, অসাড় হত, অবশ হত। জেগে ঐ নাম, স্বপ্নেও ঐ নাম। ভরত পূজার ফুল তোলেন, কুশ ও সমিধ সংগ্রহ করেন, জপ করেন, ধ্যান করেন। তবু রাজা ভরতকে আবার জন্ম নিতে হল। মুক্তি হল না।

ভরত গেছেন নদীতে। স্নান সাঙ্গ। অন্য কাজে মন দিয়েছেন সবে। এক হরিণী এল। দারুণ তার পিপাসা।

জল পান সারা হবে হবে, সিংহের গর্জনে বন উঠল কেঁপে। চকিত হল হরিণী, কেঁপে উঠল। এক লাফে যেন অতিক্রম করতে চাইল পৃথিবী। ত্রস্ত মন, কম্পিত শরীর। উঁচু, খুব উঁচু নদীর পাড়। হরিণী গর্ভবতী ছিল। গর্ভপাত হল। শাবকটি পড়ল নদীতে। খরতর স্রোত। ভেসে যেতে লাগল শাবক। ভরত তাকে ডাঙ্গায় তুললেন। হরিণী বাঁচল না। লাফিয়ে উঠতে গিয়েছিল। কিন্তু অনেক উঁচু পাড়। হরিণী পড়ল এবং মরল।

শিশু হরিণটিকে ভরত আশ্রমেই নিয়ে এলেন। ভরতের অন্য জীবন শুরু হল।

অনেক যত্ন অনেক আত্তিতে হরিণশিশু বড়সড় হল। প্রথম প্রথম চরে বেড়াত আশ্রমেরই আশেপাশে। কচিৎ কখনো গিয়ে পড়ত দূরে। পালিয়ে আসত বাঘের ভয়ে। কোন কোন দিন সকালে বেরিয়ে যেত, ফিরত সন্ধ্যেয়। কোনদিন চরত আশ্রমেরই প্রাঙ্গণে।

যেন সব কেমন কেমন হয়ে গেল ভরতের। রাজ্য-রাজধানী পুত্রকন্যা বন্ধুবান্ধবের মায়া কাটিয়ে এসে অবশেষে জড়িয়ে পড়লেন ঐ হরিণের মায়ায়। নিদারুণ এক মমতা। পূর্বে বিষ্ণু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারত না তাঁর মন। মনের আনাচে কানাচে সব সময় বিষ্ণু-ভাবনা। বিষ্ণুকে তিনি তখন অনুভব করতেন প্রাণের প্রতি স্পন্দনে। কিন্তু ফেরে পড়লেন ভরত। কূলে এসে তাঁর তরী ডুবল।

হরিণ চরতে যায়। ফিরতে দেরি হয়। ভেবে ভেবে সারা হন ভরত।

ভাবেন, বুঝি বাঘ-সিংহের কবলে পড়েছে। পরমুহূর্তেই সচকিত হন। ক্ষুরের শব্দ আসছে ভেসে।

ভরতের মনে হত হরিণটির জন্ম যেন তাঁরই আনন্দের জন্য। তিনি আকুল হতেন, কখন আসে কখন আসে! ব্যাকুল হয়ে বসে থাকতেন কতক্ষণে হাতে গায়ে শিঙ ঘষে জানাবে একটু আদর।

নতুন দাঁত উঠেছে ওর। মুখে কুশ ও কাশের ডগা। ভরতের মনে এনে দিত অন্য এক ছবি। শিখা নেই মাথায়, ব্রাহ্মণ বালক, সাম অধ্যয়নে রত। হয়ত এমন সময় আসত সেই হরিণ। ভরতের মন নেচে উঠত। মুখে খুশির হাসি।

ভরতের মন আর বসতে চাইত না তপে। হরিণটি চঞ্চল হত, ভরতের মনও চঞ্চল হত। হরিণটি দূরে যেত, ভরতের মনও যেত তার পিছু পিছু।

রাজসুখ, পুত্রকন্যা, বন্ধুবান্ধবদের ভালবাসার বাঁধন কেটে এসে তপস্যায় অনেক এগিয়ে ভরতও যেন পড়ে গেলেন নদীপাড়ের সেই হরিণীটির মত।

মরবার সময়ও ভরতের মন ছিল সেই হরিণটিতেই বাঁধা। জলভরা চোখে হরিণটি দেখছিল ভরতকে। তাঁর মৃত্যু হল। শেষ সময়ে তাঁর মনে ওরই চিন্তা কেবলই ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছিল।

ভরতকে আবার জন্ম নিতে হল। কালঞ্জর পর্বত, সেখানে এক হরিণ।

আগের জন্মের কথা পুরো ভরতের মনে ছিল। তাই মাকে ছেড়ে শৈশবেই তিনি চলে এলেন সেই শালগ্রামে। শুকনো পাতা ও ঘাস চিবিয়ে তিনি হরিণের জন্ম থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

আবার জন্ম। এবার ব্রাহ্মণের ঘরে। জাতিস্মর, নতুন করে শাস্ত্র পড়তে হল না আর। সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানই তো অটুট। নিজের থেকে দেবদেবী বা অন্য-কিছুর যে কিছুমাত্র ভেদ আছে এ তাঁর মনেও হত না। উপনয়ন হল। কিন্তু বেদ পড়তেন না, সে অনুসারে কোন কাজও করতেন না। কথাবার্তাও ছিল নিতান্তই গেঁয়ো লোকের মত—হোঁচট খাওয়া, ভুলে ভরা। শরীরের প্রতিও ছিল না কোন যত্ন। গায়ে ময়লা, কাপড় নোংরা, দাঁতেরও সেই দশা। নগরের সবাই তাঁকে অপমান করত। মান বাধা আনে তপস্যায়। তাই সবার সঙ্গে তাঁর ব্যবহার জড় ও পাগলের মত। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বাছবিচার ছিল না কোন। যা পেতেন তাই খেতেন। কোনমতে কাল কাটিয়ে দিতে পারাই ছিল তাঁর কাছে বড়। পিতার আয়ু শেষ হল। সুযোগ পেল সবাই। ভাই ভাইপো বন্ধুবান্ধব যে যখন পারত তাঁকে দিয়ে চাষ আবাদের কাজ করিয়ে নিত। ষাঁড়ের মত শক্ত শরীর, অথচ কাজকম্মের তেমনটি নন। তাই সামান্য দুমুঠো দিয়েই তাঁকে দিয়ে যাহোক কিছু করিয়ে নেওয়া যেত।

সৌবীর রাজ্যের রাজা। যাবেন কপিলের আশ্রমে। কপিলের আশ্রম ইক্ষু-

মতীর তীরে। রাজার সারথি ব্রাহ্মণকেই ভাবল যোগ্য। নিখরচায় হয়ে যাবে দিব্যি।

সঙ্গে আরও অনেকে। ব্রাহ্মণও আছেন। রাজার পালকী চলল।

রাজা যাচ্ছিলেন কপিলের কাছে এক জিজ্ঞাসা নিয়ে। এই দুঃখভরা সংসারে কি করা উচিত—এই ছিল তাঁর প্রশ্ন।

আগের জন্মের পাপ ক্ষয় হবে। পালকী বইতে ব্রাহ্মণ তাই নারাজ হননি। অন্যরা চলছে। ব্রাহ্মণও চলছেন। কিন্তু সমান তালে নয়। পালকীতে ঝাঁকুনি উঠল। বিরক্ত হলেন রাজা। বললেনঃ তালে তালে চল।

ঝাঁকুনি বন্ধ হল না। রাজা ধমক দিয়ে বললেনঃ আঃ বড্ড ঝাঁকুনি! ঠিকমত চলছ না কেন?

সবাই দেখিয়ে দিল ব্রাহ্মণকে। বলল ঃ এই লোকটি বেচাল করছে, বেতালা ছাড়া যেন চলবেই না।

রাজা বললেনঃ খুব বেশি তো বওনি। এমন শ্রান্ত কেন তুমি! শরীর তো বেশ মজবুত, তবে কি কষ্ট সয় না?

ব্রাহ্মণ বললেনঃ মহারাজ, আমি স্থূলও নই, তোমার পালকীও বইছিনে। আমি শ্রান্তও নই, কষ্টও আমার হয় না।

রাজা বললেনঃ অবাক করলে যে। স্পষ্ট দেখছি তুমি স্থূল, কাঁধে তোমার পালকী। আর ভার বইলে শ্রম কার না হয়? তোমার সবই উলটো উলটো কথা।

ব্রাহ্মণ বললেনঃ আমি পালকী বইছি, পালকী আমার কাঁধে এ কথা মিথ্যে। আসলে মাটিতে পা, পায়ের উপর জঙ্ঘা, জঙ্ঘার উপর উরু, তার উপর পেট বুক হাত ও কাঁধ এবং এই কাঁধের উপর পালকী। আমার উপর ভার চাপানো আছে মিছিমিছি কেন এমন বলছ? আর শিবিকাতে রয়েছে তোমার শরীরটা, তুমি নও। আমিও নেই মাটিতে। তুমি আমি সব কিছুকেই বইছেন পঞ্চভূতগণ। আসলে আত্মা এক। তা বাড়েও না, ক্ষয়ও হয় না। কাজেই আমাকে স্থূল বলা ঠিক নয়। মাটি, পা, জঙ্ঘা, উরু, কোমর ইত্যাদির উপর যে কাঁধ তার উপর পালকী থাকাতে যদি আমার ভারবোধ হয় তাহলে তোমার হচ্ছে না কেন? যে যুক্তিতে আমার ভারবোধ হচ্ছে বললে, সে যুক্তি বলে অন্যপ্রাণীদের উপর শুধু পালকী কেন, গাছপালা বাড়িঘর পাহাড়-পর্বতের ভার আরোপ করছ না কেন? ভারের কারণ যে বস্তু তার থেকে আত্মা আলাদা। তাই আমার কষ্ট এই বা কি করে সম্ভব? যা থেকে এই শরীর তা থেকেই এই পালকী। অতএব যে যুক্তিতে এ তোমার সে যুক্তিতে এ আমারও।

রাজা বুঝলেন এ লোক সামান্য নয়, নিশ্চয়ই কোন ঋষি। এটা তাঁর ছদ্মবেশ। রাজা পালকী থেকে নেমে পা জড়িয়ে ধরলেন ব্রাহ্মণের। জানতে

চাইলেন তাঁর পরিচয়। যে প্রশ্নের সমাধানের জন্য কপিলের আশ্রমের দিকে তাঁর যাত্রা তা বুঝি মাঝপথেই মিলল। রাজা শরণ নিলেন এই মহাপুরুষের। রাজার ব্যাকুলতায় ব্রাহ্মণ তাঁকে নানাভাবে সংসারে কি করা উচিত সে বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতে থাকলেন।

বলতে বলতে আগের আগের জন্মের কথা তাঁর মনে এল। অনেক অনেক হারানো জ্ঞান তাঁর ফিরে এল এবং যা এতদিন তিনি পাননি সেই মুক্তিও তাঁর মিলল।।

১১. মোক্ষ ও নিদাঘ

নিদাঘের কুটীর। দ্বারে অতিথি। নিদাঘ সমাদর করে অতিথিকে ঘরে বসালেন।

অভিনব অতিথি। নিদাঘের ঘরে যা যা খাদ্য আছে তা গ্রহণ করতে অতিথি সম্মত নন।

দেবিকা নদী। তীরে বীরনগর। পুলস্ত্যনির্মিত নগর—পরম মনোহর। এই নগরেরই এক প্রান্তে বাস করেন পুলস্ত্যের পুত্র নিদাঘ, যোগেযাগে অশেষ অধিকার। তদুপরি আবার ঋভুর শিষ্য এবং প্রিয় শিষ্য। গুরুর মত গুরু! শিষ্যের মত শিষ্য! ঋভু দিয়েছেন সহস্র। নিদাঘও শিখেছেন সেই মত। নিদাঘের চিত্ত জ্ঞানে জ্ঞানে উদ্ভাসিত। কিন্তু সহস্র সূর্যের মধ্যেও চিত্তের এককোণে তাঁর তখনও বিরাজ করছে অনেক অন্ধকার। সমস্তই যে এক, পৃথক পৃথক নয়—এই জ্ঞান নিদাঘের মনে কিছুতেই যেন দানা বাঁধতে পারেনি। হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হল। ঋভুর মনে হল নিদাঘের কথা। তাঁর প্রিয় শিষ্য নিদাঘ। কিভাবে আছে কেমন আছে গুরুর মনে উপজাত হল প্রবল কৌতূহল।

হাত-পা ধুয়ে অতিথি বসেছেন। নিদাঘ তাঁকে সামান্য কিছু গ্রহণ করতে মিনতি করলেন। অতিথি সুধোলেন কি কি আছে তোমার ঘরে? নির্বিচারে তো গ্রহণ করিনে।

নিদাঘ বলে গেলেন: ভক্ত, যাবক, কন্দ-ফলমূল, অপূপ। এর সবই ঘরে আছে।

অতিথি বললেন: কদন্ন। গ্রহণে বাধা আছে। মিষ্টান্ন নেই? সৎযাব বা পায়স বা ঘনদই?

নিদাঘ স্ত্রীকে ডাকলেন। বললেন অতিথির অভিরুচির কথা। নিদাঘের স্ত্রী দ্বিরুক্তি করলেন না। তৎপর হলেন।

খাদ্য তৈরি হল। মনোমত খাদ্য। অতিথির সেবা হল। নিদাঘ সুধোলেন : আপনি তৃপ্ত তো, তুষ্ট তো?

অতিথি বললেন : ক্ষুধা যার থাকে তৃপ্তি হয় মাত্র তারই। আমার ক্ষুধা নেই, তাই তৃপ্তিও হয়নি। ক্ষুৎ-পিপাসা দেহের ধর্ম, আমার নয়। তাই সব সময়েই আমি তৃপ্ত। মনের এই ধর্মই তুষ্টি, মনেই এর বাস। অতএব মনকে সুধোও। আত্মার সঙ্গে এর কোন যোগই নেই।

নিদাঘ আরও সুধিয়েছিলেন : আপনার নিবাস কোথায়? কোথায়ই বা যাবেন? এখানেই বা কেন আসা?

অতিথি বললেন : আমি কোথাও যাইনে, কোন জায়গা থেকেও আসিনে। নির্দিষ্ট কোন জায়গাতেও আমি থাকিনে। তুমি যেরকম দেখছ আমাকে বা আমি দেখছি তোমাকে আসলে তুমি আদপেই সেরকমটি নও, আমিও নই।

অতিথি আরও বললেন : আমি আসলে মিষ্টান্ন চাইনি, চেয়েছিলাম মিষ্টি। শুধু মিষ্টি চাইলে তুমি কি বল তাই জানবার ইচ্ছে হয়েছিল। যে খায় তার ভালমন্দে কিছু আসে যায় না। মিষ্টিতে তোমাদের অরুচি এই যা উদ্বেগের কথা। আজ যা খেতে ভাল কাল তা মন্দ। আবার কালে কালে ভাল খাদ্যই ভাবিয়ে তোলে মানুষকে। তুমিই বল না, এমন কোন খাদ্য কি আছে যা প্রথমে ভাল, মধ্যে ভাল, শেষেও ভাল—সব সময়েই সমান ভাল?

অভিনব অতিথি পুলস্ত্যপুত্রকে ধীরে ধীরে একটি বিশেষ জায়গায় যেন এনে দাঁড় করাতে চাইছেন। সুন্দর একটি তুলনা দিলেন : মাটির বাড়িতে মাটি লেপলেই নড়বড়ে ভাব দূর হয়। আমাদের শরীর পার্থিব। তাই পার্থিব পরমাণু না হলে এ ঠাণ্ডা মানে না, মজবুত হয় না। ঘি-তেলই বল আর দুধ-দইই বল সবই হচ্ছে পার্থিব পরমাণুর এক একটি ঢাঁই। তাই ভালই বল আর মন্দই বল ও কিছু নয়, সব সমান, এক। মনকে এই বুঝই দাও। ওতেই আসে মুক্তি। তোমারও আসবে।

অবাক মানলেন নিদাঘ। কি মিথ্যে ধারণাই না তাঁর ছিল। এক ঝটকায় যেন দীর্ঘদিনের সমস্ত ধারণাই মন থেকে দুড়দাড়িয়ে পালাল।

বললেন : প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই আমার হিতের জন্য এসেছেন, কিন্তু কে আপনি?

অতিথি নিজের পরিচয় দিলেন : তোমার গুরু ঋভু। এসেছিলাম তোমার ভ্রান্ত ধারণা শুধরে দিতে।

ঋভু প্রস্থান করলেন।

আবার হাজার বছর অতিক্রান্ত হল। ঋভু আবার এসেছেন বীরনগরে, শিষ্যের খোঁজে। কিন্তু নিদাঘ নগরে নেই, বাইরে। ঋভু বহু লোকজনের ভীড় দেখলেন, রাজা প্রবেশ করছেন নগরে। এমন সময় নিদাঘকেও তিনি

দেখলেন দূরে। ভীড় এড়িয়ে সমিধ সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন তিনি। মুখ শুকিয়েছে ক্ষুধায়, গলা দিয়ে স্বরও বেরুচ্ছে না তেমন।

ঋভু নিদাঘের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন : এখানে একা কেন?

নিদাঘ বললেন : রাজা নগরে প্রবেশ করছেন। লোকে লোকারণ্য। তাই এখানে একা।

ঋভু বললেন : রাজাই বা কে আর কেই বা প্রজা?

: ঐ যে পাহাড়ের মত বিশাল হাতির পিঠে-চেপে, উনিই রাজা। আর যারা তারা রাজা নয়।

: হাতি ও রাজা একই সাথে দুইকে দেখালে। আলাদা করে তো বুঝতে পারছি নে। ভাল করে বল কে রাজা আর কে হাতি?

: যে নিচে সে হাতি, আর যে উপরে সে রাজা।

: নিচ আর উপর বলতেই বা কি বুঝাতে চাইছ?

ঋভুর প্রশ্নে নিদাঘ এক কাণ্ড করে বসলেন। ঝট করে তাঁর কাঁধের উপর চেপে বসলেন। বললেন : এই উপরে আমি, যেন রাজা। আর নিচে তুমি, যেন হাতি।

: তুমি যদি রাজার মত আর আমি যদি হাতির মত তাহলে তুমিই বা কে আর আমিই বা কে?

ঋভুর এই কথার পর নিদাঘের আর বুঝতে বাকি রইল না। নেমে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর দুই পা। বললেন : আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরু ঋভু।

ঋভু বললেন : তোমার সেবায় যত্নে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। তাই এসেছি তোমাকে উপদেশ দিতে। আমি তোমার গুরু, তুমি ঠিকই ধরেছ। সব কিছুতেই ভগবান, সবই এক। এই জ্ঞানে মনকে মাজাঘষা না করলে মুক্ত হতে পারবে না কোন মতেই।

নিদাঘ মনকে তৈরি করলেন। যেমন গুরু বলেছিলেন ঠিক তেমনি। তারপর একদিন তাঁরও মিলল নির্দ্বন্দ্ব শান্তির অন্তহীন প্রসন্নতা : মুক্তি ॥

১২. পাতাল

সাত পাতাল : অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, সুতল ও পাতাল।

সাত পাতাল ঘুরে এসে নারদ বলেছিলেন দেবতাদের : পাতাল রমণীয়, অতি রমণীয়, স্বর্গ থেকেও। পাতালে বহুমণি, মণিময় পাতাল। শুভ্র দীপ্ত

সে মণি। নাগেরা মাথায় ধরে। পাতালে অমেয় সুখ, অসীম আনন্দ। পাতাল আলো করে আছে দানবকন্যারা। সে আলোয় পাতালে মন মজে। যে বিরাগী তারও মন বসে, পুলকে মন ভরে।

সূর্যের কিরণে তাপ নয়, কেবল আলো। চাঁদের আলোয় শীত নয়, আলো আর আলো। সেখানে শুধুই পানভোজন। অসুররা ওতেই মেতে আছে। সময় যায়, কিন্তু বুঝতে পারে না।

নদনদী, বনবনানী, পদ্মভরা সরোবর, পুরুষ কোকিলের গান—আরো, আরো অনেক কিছু আছে পাতালে। সবই মনোরম, মনোহর।

সেখানে কতশত ভূষণ, গন্ধে আমোদিত অনুলেপন। বীণাবেণু বাজে, মৃদঙ্গ বোল তোলে, তূর্য নিনাদিত হয়।

সুখ, পাতালে অঢেল সুখ এবং আনন্দ।

সাত পাতালের নিচে বিষ্ণুর শেষ নামক তামসী তনু। সহস্র শির তাঁর। অমলভূষণে, স্বস্তিকরূপে ব্যক্ত তিনি। জগতের হিতের জন্য মাথায় সমস্র মণি জ্বালিয়ে চারিদিক উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এই আলোর দীপ্তিতেই নির্বীর্য হয়েছে অসুররা। মদে চোখের তারা ঘুরছে, কানে কুণ্ডল, মস্তকে কিরীট, গলায় মালা। তিনি জ্বলছেন, দাঁড়িয়ে আছেন অচল মহিমায়। দাঁড়িয়ে জ্বলছেন, যেন একটি শ্বেত পাহাড়, অগ্নিময়। নীল বসনে, লাঙ্গলে, মুষলে তিনি অনন্য। লক্ষ্মী আছেন, বারুণী আছেন। উপাসনায় নত তাঁরা। কল্পান্তে এঁরই মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল সংকর্ষণ নামে রুদ্র। বিষের আগুনে পরম উজ্জ্বল। ত্রিজগৎ ভক্ষণ করেছিলেন সেই কল্পান্ত সময়ে। তাঁর বীর্যপ্রভাব দেবতারাও জানেন না। ফণামণির আলোয় আলোকিত যে পৃথিবী তা তাঁরই মাথায়, যেন পুষ্পমাল্য। তিনি জৃম্ভণ করেন, পৃথিবী কম্পিত হয়। নাগবধূরা তাঁর অঙ্গে দেয় অনুলেপন। নিশ্বাসে নিশ্বাসে বিক্ষিপ্ত হয় সেই হরিচন্দন। জল গন্ধে ভরে উঠে বিক্ষিপ্ত হরিচন্দনের অজস্র কণিকায়।

পৃথিবী ধারণ করে আছেন তিনি। গর্গ আরাধনা করেছিলেন এঁরই। গ্রহনক্ষত্র, উৎপাত ও শকুন ইত্যাদি বিষয়ে গর্গের যে জ্ঞান এইখান থেকেই তা পাওয়া ॥

১৩. সূর্যতেজ

বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা। সূর্যদেব এঁকে বিবাহ করেন। মনু, যম, যমী—সংজ্ঞারই তিন সন্তান, সংজ্ঞাকে সূর্যের উপহার।

অনন্ত তেজ সূর্যের। বেশিদিন সইতে পারলেন না সংজ্ঞা। তাই বনে গেলেন। সেখানে মগ্ন হলেন তপস্যায়।

অন্য একটি মেয়ে। নাম ছায়া। তার উপরই রইল স্বামীর ভার। দেখতে শুনতে ছায়া অনেকখানি সংজ্ঞারই মত। সূর্য ভুল করলেন। ছায়াকে মনে করলেন সংজ্ঞা। ছায়ার গর্ভে জন্ম হল দুই পুত্র ও এক কন্যার—শনৈশ্চর, সাবর্নি মনু আর তপতী।

একদিন রাগে আগুন হলেন ছায়া। শাপ দিলেন যমকে। নিজের জননী শাপশাপান্ত করবেন নিজের পুত্রকে! ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকল যমের এবং সূর্যেরও। ওঁরা বুঝলেন, এ মেয়ে যেই হোক সংজ্ঞা নয়।

অবশেষে ছায়াকে সব বলতেই হল। সূর্য ধ্যানে বসলেন। সন্ধান পেলেন কোথায় আছেন সংজ্ঞা। দেখলেন, সংজ্ঞা তপস্যামগ্ন। মানুষ রূপে নয়, ঘোড়ার আকারে।

সূর্যও ঘোড়ার রূপ নিলেন। সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হলেন। তিন পুত্র জন্ম নিল। দুজন অশ্বিনীকুমার আর অন্যজন রেবন্ত। রেতের অবসানে জন্ম, নাম রেবন্ত।

সূর্য সংজ্ঞাকে ফিরিয়ে আনলেন। সমস্যা রইল। সূর্যের তেজ কমাতে হয়। নইলে কি করে ঘর করবেন! বিশ্বকর্মা সমাধান করলেন। সূর্যের তেজ কমিয়ে দিলেন। ভ্রমিযন্ত্রে চাপিয়ে চেঁচে ফেললেন তেজ। প্রশমিত হলেন সূর্য। বিশ্বকর্মা কিছুটা পারলেন, পারলেন না কেবল সূর্যতেজের অক্ষয় অষ্টমাংশ চেঁচে ফেলতে।

সূর্যের শরীর থেকে চেঁচে নেওয়া হল বৈষ্ণব তেজ। ভূতলে পতিত হল পুঞ্জ পুঞ্জ তেজ। বিশ্বকর্মা তুলে নিলেন। নির্মাণ করলেন বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা। নির্মাণ করলেন আরও দিব্য সব অস্ত্র। সূর্যের তেজ, প্রচণ্ড তেজ। বিশ্বকর্মা সেই তেজ সঞ্চারিত করলেন কার্তিকে। কার্তিক দুর্ধর্ষ হলেন। সূর্য তেজ হল কার্তিকের শক্তি ।।

১৪· যাজ্ঞবল্ক্য

ব্রহ্মরাতের পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য। পরম ধর্মজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্য।

ব্যাস। তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন। বিশাল বৃক্ষের মত যে যজুর্বেদ তার সাতাশটি শাখারই প্রণেতা।

শিষ্য-পরিবৃত বৈশম্পায়ন। এক এক শাখা দিলেন এক এক শিষ্যকে। প্রিয় শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য। গুরুর সেবায় নিয়ত তৎপর।

অনেক ঋষি মিলিত হয়েছেন। ঋষিসভায় ঠিক হল, যিনি আসবেন না মহামেরুর এই সমাজে সাত রাতের পর ব্রহ্মহত্যার পাতকে লিপ্ত হবেন তিনি।

সবাই এলেন। এলেন না কেবল বৈশম্পায়ন। ঋষিদের শাপ। ফলবেই। সময় হল। নিজের ভাগিনেয়কে মাড়িয়ে মারলেন ঋষি বৈশম্পায়ন।

শিষ্যদের ডাকলেন বৈশম্পায়ন। বললেন ঃ ব্রহ্মহত্যা-পাতক নষ্ট হয় যে ব্রতে, অনুষ্ঠান কর তার। সকলেই করবে, নির্বিচারে করবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন ঃ এই সব ব্রাহ্মণের তেজ নিতান্তই স্বল্প। অথচ এ ব্রতে অশেষ ক্লেশ। ওঁরা মিছিমিছি ক্লিষ্ট হবেন, ফল হবে না কিছু। ওঁদের রেহাই দিন। আমি একাই পালন করব এ ব্রত।

বৈশম্পায়ন রুষ্ট হলেন। বললেন ঃ ব্রাহ্মণদের অপমান করছ। নিস্তেজ বলছ! হেলা করছ আমার আজ্ঞা। তোমার মত শিষ্যে প্রয়োজন নেই আমার। যা কিছু শিখেছ আমার কাছে এই মুহূর্তে পরিত্যাগ কর।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন ঃ আপনাকে ভক্তি করি বলেই বলেছি একথা। আপনি অন্যথা চিন্তা করছেন। আমারও প্রয়োজন নেই আপনার মত গুরুতে। এই নিন যা কিছু অধ্যয়ন করেছি আপনার কাছে।

যাজ্ঞবল্ক্য উদ্‌গিরণ করে দিলেন রুধিরাক্ত সাকার যজুর্বেদ। ব্রাহ্মণরা তিত্তির পক্ষীর রূপ নিলেন। গ্রহণ করলেন সেই উদ্‌গীর্ণ বিদ্যা। বেদের এই শাখার নাম তাই তৈত্তিরীয়।

অন্যসব শিষ্য গুরুর আদেশ পালন করলেন, ব্রত করলেন। বেদের যে শাখা এঁরা অবলম্বন করেছিলেন তা পেল চরকাধ্বর্যু নাম।

যাজ্ঞবল্ক্য বসে রইলেন না। প্রাণায়াম-পরায়ণ হলেন। ব্রতী হলেন সূর্যের ধ্যানে। স্তব করলেন সূর্যের ঃ মোক্ষের সিংহদ্বার যিনি, শুভ্রদীপ্ত সেই সবিতাকে নমস্কার। নমস্কার তাঁকে বেদ যাঁর তেজ, নমস্কার তাঁকে যিনি ঋক্, যজুঃ ও সামময়। যিনি বিষ্ণুস্বরূপ, যাঁর আলোয় চন্দ্রের অমৃত-আলো, যিনি সত্ত্বগুণের আধার, সেই সূর্যকে নমস্কার।

পরিতুষ্ট সূর্যদেব আবির্ভূত হলেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন ঃ কোন্ বরে অভিলাষ তোমার?

যাজ্ঞবল্ক্য বিনত হলেন। বললেন ঃ গুরুও জানেন না এমন যজুর্বেদ আমাকে দান করুন।

সূর্যদেব তাইই দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য পেলেন অযাতযামনামক যজুর্বেদ।

সূর্যদের আবির্ভূত হয়েছিলেন বাজীর রূপে। বাজীর বলা বেদ, তাই যাঁরা অধ্যয়ন করেন 'বাজী' নামেই রটত তাঁদের খ্যাতি॥

১৫. যমগীতা

মৈত্রেয় সুধোলেন ঃ জন্ম হলেই মৃত্যু, যমযন্ত্রণা। পাপের ক্ষয়ে স্বর্গবাস। কাজের মত কাজ করলে পাপক্ষয়, যমকবল থেকে নিষ্কৃতি। কিন্তু কি সেই কাজের মত কাজ ?

পরাশর বললেন ঃ ঠিক এই কথাটিই নকুল সুধিয়েছিলেন ভীষ্মকে। ভীষ্ম যা বলেছিলেন বলছি শোন।

ভীষ্ম বললেন ঃ কলিঙ্গ দেশের এক ব্রাহ্মণ সখা ছিলেন আমার। একদিন তিনি এলেন। বললেন, জাতিস্মর এক মুনিকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন। জাতিস্মর মুনি বলেছিলেন, এখন এমন আছে, ভবিষ্যতে হবে এমন। জ্ঞানী তিনি। যা বলেছিলেন হলও তাই। আমি আবার সেই ব্রাহ্মণকে দু'একটি কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও জাতিস্মর মুনির কাছ থেকে শোনা যা যা বললেন তার সবই সত্য হল। তুমি যা জিজ্ঞেস করেছ তাও সুধিয়েছিলাম একদিন। কলিঙ্গদেশের সেই ব্রাহ্মণ সেই জাতিস্মর মুনির কাছে যা শুনেছিলেন তাই বললেন। যা যা বলেছিলেন আমিও তোমাকে তাই তাই বলছি। শোন।

একদা যম ও যমকিংকরের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল। অতি গোপন সে আলাপ। জাতিস্মর মুনি সেই আলাপের কথাই বলেছিলেন ঐ ব্রাহ্মণকে।

হাতে পাশ। যমদূত। যম বললেন কানে কানে ঃ মধুসূদনের শরণাগত যারা তাদের ত্যাগ কর। বৈষ্ণব যারা নয় আমি কেবল তাদেরই প্রভু। মানুষের পাপপুণ্যের বিচার করি আমি। আমি যম। বিধাতাই নিযুক্ত করেছেন এ কাজে। হরি গুরু, তাই আমি তাঁর অধীন। আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তিনিই। সোনা সোনাই। কিন্তু বলয়ে কুণ্ডলে মুকুটে ভিন্ন। হরিও তেমনি। দেবে মানুষে পশুতে হরির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। হরিই সকল বস্তুর আত্মা—মনে মনে এই ভেবে যিনি প্রণাম করেন হরিকে তাঁর ধারে কাছেও যেও না।

যমদূত বলল ঃ হরির ভক্ত, কি করে তা বুঝব ?

যম বললেন ঃ ধর্ম করেন, টলেন না স্বধর্ম থেকে, জানবে তিনিই হরির ভক্ত। সুহৃদে বিপক্ষে যাঁর সমদৃষ্টি, পরের জিনিস যিনি হরণ করেন না, জীবহিংসা করেন না, মন যাঁর রাগাদিশূন্য, বিমল, তিনিই বিষ্ণুর ভক্ত। মোহ নেই মনে, বিষ্ণুর চিন্তা করেন—অন্য চিন্তা নয়, শুধু তাঁরই চিন্তা, তিনিও বিষ্ণুর ভক্ত। কেউ কোথাও নেই, সম্মুখে পরের সোনা—যিনি এই সোনাকে মনে মনে তুচ্ছ করবেন তাঁকে বিষ্ণুভক্ত বলেই ধরে নেবে। বিমল মন আর কলংকিত মন, তফাৎ অনেক। চাঁদের কিরণে যেমন হোমাগ্নির উজ্জ্বলতা থাকে না তেমনি রাগদ্বেষ যে মনে সে মন বিষ্ণুকে ধরতে পারেনা। সেই মনেই

বিষ্ণুর বাস যে মনে মাৎসর্য নেই, অভিমান নেই, মায়া নেই। যে মনে নির্মলতা, প্রশান্তি, হিতচিন্তা, মিত্রভাব সেই মনেই বিষ্ণুর আসন পাতা। হৃদয়ে যদি বিষ্ণু বহিরঙ্গে তবে আভাস, তিনি প্রিয়দর্শন। রমণীয় নবীন বৃক্ষ দেখলেই বোঝা যায় অভ্যন্তরে তার রম্যরসের ধারা। এরকম কাউকে দেখলে দূর থেকেই পালিয়ে এস।

সূর্য আছেন, অন্ধকার তিষ্ঠোতে পারেনা কোন মতেই। হৃদয়ে বিষ্ণু, পাপ টিকতে পারে না। নিষ্ঠুর ও মিথ্যা বাক্যে অভ্যস্ত, সদা অমঙ্গল কাজে রত—এমন মানুষের মনে বিষ্ণু বাস করেন না। পরের ঋদ্ধিতে যার ঈর্ষা, সাধুদের নিন্দায় যে পঞ্চমুখ, যে যাগ করে না, সাধুকে দান করে না, তার হৃদয়ও বিষ্ণুর আসন নয়। বন্ধু, পত্নী, পুত্রকন্যা বা পিতামাতার সঙ্গে বা ভৃত্যের সঙ্গে যে শঠতা করে, অর্থে তৃষ্ণার্ত হয়, সেও বিষ্ণুভক্ত নয়। গর্হিত অসৎ কাজে যার প্রবৃত্তি, নীচ সঙ্গে মেতে আছে বহুকাল, পাপের মধ্যেই যে ডুবে থাকতে চায়, বিষ্ণুভক্ত সে কখনই নয়। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়, আমি তুমি সমস্ত জগৎই তিনি—এই যাঁর বিশ্বাস তাঁকেও ছুঁয়ো না।

যাঁর হৃদয়ে বিষ্ণুর বাস তাঁর দৃষ্টি যতদূর চলে ততদূর আমার বা তোমার কিছু করার সাধ্যই নেই। অতএব ওধার মাড়িয়ো না।

যাঁর হৃদয়ে কেশব, যম বা যমকিংকর, যমদণ্ড, যমপাশ বা যমযন্ত্রণার কোন ভয়ই তাঁর নেই।

পরাশর বললেন ঃ এই যমগীতা ভীষ্ম বলেছিলেন নকুলকে। আমি বললাম, মৈত্রেয়, তোমাকে ৷৷

১৬. মায়ামোহ ও বেদাচারী দৈত্য

দিব্য একবছর ধরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একবার ভয়ানক এক যুদ্ধ হয়েছিল। হ্লাদ ও অন্যান্য দৈত্যেরা দেবতাদের হারিয়ে দিল।

দেবতারা ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা শুরু করলেন। তপস্যা চলল, জপ চলল। দেবতারা বললেন ঃ যে সব কথা বিষ্ণুর আরাধনার জন্য আমরা বলব তাতে যেন তিনি প্রসন্ন হন। যাঁর থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি, যাঁতে সবই একদিন বিলীন হবে তাঁর স্তব করার সাধ্য আমাদের নেই। কি কথায় যে স্তবের মত স্তব হবে তা আমরা জানিনে। তবু নিজেদের মঙ্গলের জন্য যেমন পারি তেমন করেই স্তব করি বিষ্ণুর।

এইভাবে দেবতারা কথার স্রোতে রচনা করলেন স্তব। বিষ্ণু দেখা দিলেন গরুড়ের পিঠে চেপে। হাতে-শঙ্খ, চক্র, গদা। দেবতারা বললেন ঃ যদি প্রসন্ন

হয়ে থাক, তাহলে দানবদের কবল থেকে আমাদের রক্ষা কর। হ্রাদ ও অন্য অসুররা ব্রহ্মার কথা মানেনি, ত্রিলোক অধিকার করেছে, যজ্ঞভাগও হরণ করেছে। একটা বিহিত কর। উপায় বল, বধ করি।

বিষ্ণু নিজের শরীর থেকে সৃষ্টি করলেন মায়ামোহ। দেবতাদের বললেন ঃ এই মায়ামোহ অসুরদের মোহিত করবে, ফলে বেদের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে, আর তখনই তোমরা ওদের বধ করতে পারবে। সৃষ্টি রক্ষার জন্য ব্রহ্মা আছেন। ব্রহ্মার কথা যারা মানে না, তারা মরে আমারই হাতে। কাজেই ভেব না, ভয় পেও না। মায়ামোহকে আগে আগে রেখে এগোও।

দেবতারা এলেন নর্মদাতীরে। সঙ্গে মায়ামোহ। অসুররা এখানেই তপস্যা করছে। মুণ্ডিতমস্তক দিগম্বর বেশে মিষ্টিসুরে মায়ামোহ অসুরদের বলল। কেন তপস্যা করছ ? কি ফল চাও—ঐহিক না পারলৌকিক ?

ঃ পারত্রিক, কেন তুমি কিছু বলবে নাকি ?

ঃ যদি মুক্তি চাও তাহলে আমার কথামত কাজ কর। যেমন যেমন বলব ঠিক তেমন তেমন ধর্ম কর, দেখবে মুক্তির দরজায় তোমরা দাঁড়িয়ে। মুক্তিই বল আর স্বর্গই বল, যা খুশি তাই মিলবে। এমন ধর্ম আর হয় না। তোমাদের মত মহা মহা শক্তিশালীর জন্যই এই ধর্ম।

মায়ামোহের কথার স্রোত প্রচণ্ড রূপে বইল। সে স্রোতে বিচিত্র সব তরঙ্গ, অদ্ভুত তার ভঙ্গ, মারাত্মক তার গতি। কোন্ দিকে বেঁকবে, কোন্ দিক থেকে ধাক্কা আসবে দানবরা আদপেই তা বুঝতে পারল না।

ঃ এতেই ধর্ম, অধর্ম ওতে ; এ সৎ, ও অসৎ ; মুক্তি আসে এতে, ওতে নয় ; এ পরম পরমার্থ, আর ওতে পরমার্থ তো নয়ই বরং জুটবে বিপরীত। এরকম কর, ও রকম নয় ; এতো কাপড়চোপড় পরা মানুষের ধর্ম, দিগম্বরদের ধর্ম হল এই।

এই ভাবে মায়ামোহ দানবদের ধর্মছাড়া করে তবে ছাড়ল।

বেদের ধর্ম ছাড়ল। মায়ামোহের মায়াতে পড়ে অসুরদের বুদ্ধিসুদ্ধিও লোপ পেল। নিজেদের মধ্যেই ওরা মায়ামোহের ধর্মটাকে ঘটা করে প্রচার করতে থাকল। এই ভাবে এ ওকে, সে তাকে নতুন ধর্ম ধরাল। অল্প সময়েই সমস্ত দানবের মধ্যেই নতুন এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়ল। বেদের ধর্ম ওদের মধ্যে আর রইল না।

মায়ামোহ আবার অন্য সাজে সাজল। পরনে লাল কাপড়, চোখে অঞ্জন। অন্য অসুরদের গিয়ে সে বলল ঃ যদি মুক্তি বা স্বর্গ চাও তাহলে পশুহিংসা বা ঐ ধরনের বদ স্বভাব ছাড়তে হবে। জগৎটা বিজ্ঞানময়। বড় বড় পণ্ডিতে বলেন···

ইত্যাদি কথার ছটায় মায়ামোহ অসুরদের ভুলাল।

ঃ জান না বটে, কিন্তু জেনে নাও এবার, বুঝে নাও, মনে রেখ…।

আবার অন্য রূপ ধরল মায়ামোহ। একেক বার এক এক পাষণ্ডের চেহারা আর নানা রকমের ছলাকলা। অসুররা ভুলল। বেদে স্মৃতিতে যা যা বলা আছে সব কিছুই ওরা ছাড়ল। বেদের নিন্দে করতেও কসুর করল না। দেবতাদের নিন্দে তো মুখে লেগেই রইল। যাগযজ্ঞ, যজন যাজন, ব্রাহ্মণ সবাইকেই ওরা খারাপ বলতে থাকল।

ঃ যে কাজে প্রাণীহিংসা, ধর্ম হয় নাকি তাতে—যুক্তি দিয়ে একথা কখনই মানা যায় না। ঘি আগুনে পুড়লে মহৎ ফল দেয় একথা নিতান্তই ছেলে-মানুষের। যজ্ঞে দেবতাদের ইন্দ্রের সঙ্গে শমী প্রভৃতি খটখটে সব কাঠ খেতে হয়, কিন্তু পশুরা বেশ তাজা সবুজ পাতা খায়, অতএব পশুরা দেবতাদের চেয়ে বড়। যজ্ঞে পশু বলি দিলে সে পশুর স্বর্গে গতি হয়। তাই যদি হয় তাহলে পশু কেন, নিজের পিতাকে বলি দিলেই তো হয়। শ্রাদ্ধে খায় একজন তৃপ্তি হয় অন্য জনের। মন্দ কথা নয়! বিদেশে যেতে হলে খাবারদাবার বইবার আর দরকার নেই। বাড়িতে বসে ছেলেরা ভক্তির সঙ্গে বেশ করে খেলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। অতএব সবই লোকের বিশ্বাসের উপর। ভাল করে ভেবে দেখ। যদি ভাবো তাহলে নিশ্চয়ই এসব আচার পায়ে ঠেলবে, আর ওতেই মঙ্গল। বেদের কথা আকাশ থেকে পড়েনি, যাতে যুক্তি মান্য তাই।

মায়ামোহ এই ভাবে ধীরে ধীরে অসুরদের মন এমন ভাবে মজাল যে বেদে কারুরই ভক্তিশ্রদ্ধা রইল না। সবাই ভুল করল, মন্দ পথে চলল। দেবতারাও মওকা পেলেন। যা বলেছিলেন বিষ্ণু তাই হল। মহা তোড়জোড় করে দেবতারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। যুদ্ধ শুরু হল। সেই ভয়ংকর দেবাসুরের যুদ্ধ।

অসুররা আগে সদাচারী ছিল, ধর্মপরায়ণ ছিল। রক্ষা কবচের মত কাজ করেছে তাদের সেই মতি গতি। কিন্তু তারা ধর্ম ছেড়েছে, কুপথে হেঁটেছে, কবচ নষ্ট হয়েছে, তাই দেবতাদের আক্রমণ সইতে পারল না। একে একে বিনষ্ট হল সবাই। বেদ ছিল তাদের বর্ম। মায়ামোহ ছাড়াল সেই বর্ম। খোলা বুক, দেবতাদের অস্ত্র প্রতিহত হল না, হাওয়ায় মাথা খুঁড়ল না, সোজা বিদীর্ণ করল ॥

১৭. শতধনু ও শৈব্যা

রূপে গুণে লক্ষ্মী। কাশীরাজ্যের কন্যা এমনতরই। পিতা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। কন্যার বিবাহ দিতে হবে। দিতে হবে ভাল ঘরে, ভাল বরে।

সচেষ্ট পিতা, কিন্তু অসম্মত কন্যা। পূর্বজন্মের সব কিছুই রাজকন্যার মনে ভাসে। মনের উপর দিয়ে ভেসে ভেসে যায়।

কন্যা কাশীরাজেরই, কিন্তু যেন পূর্বজন্মের সেই শৈব্যা, রাজা শতধনুর রাণী। শতধনুর সঙ্গে তাঁর মনের সব তারগুলিই বাঁধা পড়েছিল সুরে। এ জন্মেও আলগা হয়নি, বেসুরো হয়নি একটুও।

কত কপাল করেই না শৈব্যারূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল। গুণের শেষ ছিল না। মুখে সদা সত্য কথা, সবার উপরে দয়া। যেমন নরম তেমন মধুর স্বভাব। ধর্মকর্ম, ভাল আচারে সর্বদা মতি। রাজা শতধনুও তেমনি। দুজনে মিলে জনার্দনের আরাধনাতে তন্ময় হয়ে যেতেন। ভক্তির সঙ্গে নিত্য চলত তাঁদের জপ, হোম, দান, ধ্যান।

অবশেষে কর্মগুণে দুজনকে জন্ম নিতে হল দুজায়গায়। শৈব্যা হলেন কাশীরাজ-দুহিতা, আর শতধনু নিতান্তই এক সারমেয়।

কাশীরাজ্যের কন্যার ছিল দিব্যচক্ষু। জানতে পারলেন কোথায় আছেন শতধনু। বিদিশা নগরী। একটি গৃহ। সেখানে সেই সারমেয়, রাজা শতধনু।

কাশীরাজের কন্যা চললেন। ভালভাল খাবার দিলেন। সারমেয় লেজ নেড়ে নেড়ে খুশি জানাল। কাশীরাজের মেয়ে কিন্তু লজ্জা পেলেন।

সারমেয়কে তিনি প্রণাম করলেন। মনে করিয়ে দিলেন আগের জন্মের কথা ঃ

সেই যে তাঁরা ফিরছিলেন ভাগীরথীতে স্নান করে কার্তিকের এক পূর্ণিমায়। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল এক পাষণ্ড। শতধনু তাকে দেখলেন, শৈব্যাও। শৈব্যা ব্রত শুরু করেছিলেন, তাই কথা বললেন না। পাষণ্ডের মুখ দেখলেন বলে সূর্য দেখলেন। কিন্তু শতধনু কথা বললেন। পাষণ্ড হলেও সে তাঁর আচার্যের সখা। তাই আচার্যের খাতিরে কথা বললেন।

তারপর সারা হল বিষ্ণুর পুজো। ত্রুটি রইল না কোন।

কিছুকাল পরে শতধনুর মৃত্যু হল। শৈব্যাও স্বামীর চিতায় উঠলেন।

কাশীরাজের কন্যা সেই সারমেয়কে বললেন ঃ মহারাজ মনে করে দেখুন, নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়বে যে আপনি আসলে মহারাজ শতধনু। পাষণ্ডের সঙ্গে আলাপে যে পাপ তাতেই আপনার এই দশা আজ।

সারমেয় ভাবতে চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ ভাবল। অবশেষে তার মনে পড়ল। বিষণ্ণ হয়ে চলে গেল এক পাহাড়ের চূড়োয়। লাফিয়ে পড়ল নীচে। মরল, কিন্তু আবার জন্মাল। এবার শৃগাল।

রাজকন্যা আবার দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন স্বামীকে। গেলেন কোলাহল

পর্বতে। স্বামীকে পেলেন, দেখলেন, বললেনঃ মনে কি করতে পারেন আগের জন্মের কথা ? মনে কি পড়ে না আপনার ?

শৃগাল মনে করতে পারল এবং অনাহারে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করল।

কিন্তু রক্ষা নেই। আবারও জন্ম। এবার বৃক।

এবারও কাশীরাজের মেয়ে এসে মনে করিয়ে দিলেনঃ আপনি রাজা শতধনু। বৃক নন। আগে সারমেয় ও শৃগাল হয়ে জন্মেছিলেন। মনে কি পড়ে মহারাজ ?

বৃকের শরীরও শতধনু ত্যাগ করলেন। হলেন শকুন।

রাজকন্যা বললেনঃ আপনি শকুনের মত ব্যবহার করবেন না। আপনি কে তা স্মরণ করুন, আপনার স্মরণ হবে, নিশ্চয়ই হবে।

শকুন থেকে শতধনু কাক হলেন।

আবারঃ মহারাজ, বহু রাজা যাঁকে একদিন বলি নিবেদন করত সেই আপনি বলিভুক হলেন !

আবার দেহত্যাগ ও নতুন জন্ম। কাক গেল। হল ময়ূর। শৈব্যাও যা কিছু খেতে ময়ূরেরা ভালবাসে তাই দিয়ে ময়ূরটিকে বশ করলেন।

এদিকে রাজা জনক অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। শৈব্যা ময়ূরকে স্নান করালেন, নিজেও করলেন। তারপর সেই যজ্ঞে রাজা কেমন করে সারমেয় থেকে শৃগাল, শৃগাল থেকে বৃক এবং শেষে ময়ূর হয়ে জন্মেছেন তা মনে করিয়ে দিলেন।

এবারও সেই আগের মত হল। দেহত্যাগ করল ময়ূর। কিন্তু এবার আর পশুপক্ষী নয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে স্নান করেছেন, তাই মানুষ। একেবারে জনক রাজার পুত্র রূপেই হল তাঁর জন্ম।

সময় হল। রাজার মেয়ে রাজাকে এসে বললেন, সম্মত তিনি বিবাহে।

স্বয়ংবর সভার আয়োজন হল। জনক রাজার পুত্রও এসেছেন সে সভাতে। তাঁকেই বরণ করলেন রাজার কন্যা। শৈব্যা বরণ করলেন শতধনুকে।

এবার অনেক সুখ, অনেক আনন্দ। বিদেহে রাজত্ব করলেন, অনেক যজ্ঞ করলেন, অনেক দান করলেন। অবশেষে রাজা ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিলেন। রাণী সহমরণে গেলেন। তারপর দুজনেই চললেন ইন্দ্রলোকে, এক লোক থেকে অন্য লোকে—সুখ আনন্দের অজস্র বন্যা যেখানে ॥

১৮. গানে বিপত্তি

রৈবতের চিন্তার শেষ নেই। কন্যা রেবতী। অনন্য রূপ, অনন্য গুণ। যোগ্য বর মিলছে না। অনেক খুঁজেও বর মিলল না।

রৈবত ধরনা দিলেন ব্রহ্মার কাছে। যা হোক একটা কিনারা হবেই হবে। কিন্তু গোল বাধল, গুলিয়ে গেল সব।

ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মা বসে আছেন। গান গাইছেন দুই গন্ধর্ব। একজন হা হা, অন্যজন হূ হূ। হা হা হূ হূ গান করছেন। অতিতান সহযোগে ষড়জ, মধ্যম গান্ধার প্রভৃতি স্বরপরিবর্তনে পরম মনোরম সুর সৃষ্টি হল। রাজা রৈবত মুগ্ধ হলেন। সব অমৃত হল। সেই অমৃতের স্রোতে ভেসে গেলেন তিনি। কিন্তু কোথায় তা জানতে পারলেন না। কেমন করে বিকল বিবশ হল মন তাও বুঝতে পারলেন না। ডুবে গেলেন। ডুবে ডুবেই ভেসে গেলেন। এক যুগ, দুই যুগ, অনেক যুগ কেটে গেল। রৈবতের মনে হল মুহূর্ত মাত্র।

গান শেষ হল। প্রণতি জানিয়ে ব্রহ্মাকে নিবেদন করলেন, যোগ্য বরের খোঁজ চাই।

ব্রহ্মা সুধোলেন ঃ কেমন বর হলে মনের মত হয় তোমার?

রৈবত নাম করে গেলেন অনেকের। আরেকবার প্রণাম করলেন ব্রহ্মাকে। বললেন ঃ এদের কার হাতে মেয়েকে দেব? আপনার মত কি?

ব্রহ্মা মাথাটা সামান্য নুইয়ে হেসে বললেন ঃ যাদের কথা বললে পৃথিবীতে তাদের পুত্র পৌত্র এমনকি প্রপৌত্ররাও বেঁচে নেই এখন। গান শুনছিলে, ঐ ফাঁকে পেরিয়ে গেছে অনেক যুগ। আটাশের মনু—তাঁর শাসনেরও চার যুগ প্রায় পেরুবে পেরুবে। চতুর্থ কলিযুগ শুরু হতে দেরি নেই তেমন। তোমার কালের কেউই আর বেঁচেবর্তে নেই। মেয়েকে অন্য কোন বরে দাও।

বৈবতের মনে বিস্ময়, ভয়, ভাবনা। জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখন তাহলে কার হাতে দিই মেয়েকে?

সপ্তলোকের গুরু ব্রহ্মা রৈবতকে বললেন ঃ যিনি সনাতন এবং সর্বস্বরূপ নাম দিয়ে নির্দেশ করা যায় না যাঁকে, যাঁর অনুগ্রহে আমি প্রজাদের সৃষ্টিকর্তা, যিনি সকলের কারণ সেই বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। যে পুরীর নাম পূর্বে ছিল কুশস্থলী সেই পুরীই এখন হয়েছে দ্বারকা। সেই দ্বারকায় রয়েছেন বিষ্ণুরূপী বলদেব। তাঁকেই উপহার দাও এই কন্যা। পত্নীরূপে তিনিই গ্রহণ করুন। বলদেব অনন্য, বেরতীও অনন্যা। অতএব সুন্দর হবে এ মিলন, কাম্যও তাই।

রৈবত পৃথিবীতে এলেন। যুগ বদলেছে। যা যেমনটি ছিল তা আর তেমনটি নেই। ছিল তেজ, বীর্য, বিবেক—সময়ের ছোঁয়ায় সবেতেই ভাঁটার টান। তেজ নিভে এসেছে, বীর্য আছে ছিটে ফোঁটা, বিবেকের দশা নিতান্তই হীন। আগে মানুষের আকার ছিল বিরাট, এখন খর্ব।

রাজা রৈবত নিজের পুরী কুশস্থলীতে এসে পৌঁছুলেন। চেনা যায় না, না যাবারই কথা।

বলদেবকে যথারীতি কন্যাদান করলেন। বলদেব খর্ব, কিন্তু রেবতীকে দেখলেন বিরাট। রেবতীকে ছোট করে নিলেন। লাঙ্গলের ডগা দিয়ে নুইয়ে

আগের যুগের দুর্বহা বরাঙ্গনাকে পরের যুগের মত সুসহা সহাঙ্গনা করে নিলেন বলদেব ।।

১৯· শশাদ ও ককুৎস্থ

দেবতা ও অসুর—কেবল যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ। দেবতারা জেতেন, অসুরেরা মরে। অসুরেরা জেতে, দেবতারা জব্দ হন। পালিয়ে পালিয়ে উপায় খোঁজেন, মতলব আঁটেন। বিষ্ণু, শিব কিংবা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েন।

ত্রেতাযুগে দেবতাদের একবার এই দশা হয়েছিল। ওঁরা শরণ নিলেন বিষ্ণুর, তুষ্ট করলেন পুজো আচ্চায়। বিষ্ণু-নারায়ণ বললেন ঃ বুঝেছি তোমরা কি চাও। কি করে তোমাদের আশা পুরবে এবার তা শোন।

রাজর্ষি শশাদ। তাঁর পুত্র পরঞ্জয়। মহাবীর। ক্ষত্রিয়দের গর্ব। শরীরে ভর করবেন নারায়ণ। অসুরদেরও বধ করবেন একে একে। পরঞ্জয়কে অসুর-বধের জন্য খুঁচিয়ে তুলতে হবে। আর এ কাজটি করতে হবে দেবতাদেরই। নারায়ণের কথায় দেবতারা ভরসা পেলেন, খুশিও হলেন খুব। নারায়ণকে ওঁরা প্রণাম করলেন। তারপর গিয়ে হাজির পরঞ্জয়ের কাছে।

পরঞ্জয়ের পিতা শশাদ। প্রকৃত নাম বিকুক্ষি। শশাদ নাম পাওয়া। নামের পিছনে এক মহা লজ্জা। ওঁর পিতা ইক্ষ্বাকু। মনুর এক হাঁচি থেকে জন্ম তাঁর। একদা ইক্ষ্বাকু পাঠালেন বিকুক্ষিকে শ্রাদ্ধের মাংস আনতে। বিকুক্ষি বনে বেরিয়ে হরিণ ইত্যাদি পশু হনন করলেন। শেষে শ্রান্ত হলেন, ক্লান্ত হলেন। ক্ষুধা, প্রচণ্ড এক ক্ষুধা। বিকুক্ষি কাতর, অবসন্ন। ক্লান্ত চোখে চকচক করে উঠল একটি শশক। শশকটি ভক্ষণ করলেন বিকুক্ষি, চাঙ্গা হলেন। তারপর পিতার কাছে এনে দিলেন মাংস। ইক্ষ্বাকু কুলের পুরোহিত বশিষ্ঠ। তাঁকে বলা হল দেখতে। তিনি রায় দিলেন ঃ অপবিত্র এ মাংস। নষ্টের জন্য দায়ী বিকুক্ষিই। এর থেকে একটি শশক দুষ্ট বিকুক্ষিই ভক্ষণ করেছে।

গুরুর এই কথা শুনে পিতা পুত্রকে ত্যাজ্য করলেন। বিকুক্ষি নাম পেলেন শশাদ।

পিতার মৃত্যু হল। বিকুক্ষি রাজত্ব করলেন। কোন ফাঁক ছিলনা তাঁর শাসনে। ধার্মিক রাজা, তাই রাজর্ষি।

এদিকে দেবগণ শশাদ-পুত্র পরঞ্জয়কে এসে ধরে পড়লেন ঃ আমরা অরাতিবধ করব, তোমার সাহায্য না হলেই নয়।…বিমুখ কর না আমাদের।

পরঞ্জয় বললেন, অবশ্যই তিনি সহায় হবেন, তবে যুদ্ধ করতে দিতে হবে

ইন্দ্রের কাঁধে চেপে। এ না হলে তিনি সম্মত নন।

দেবতারা ও ইন্দ্র রাজী হলেন। উপায় যখন নেই, তখন আর কি করা!

যুদ্ধ হল। ইন্দ্র বৃষের আকার ধারণ করলেন। পরঞ্জয় তাঁর কাঁধে চেপে মহা উৎসাহে যুদ্ধ করতে লাগলেন। স্বয়ং ভগবানের তেজ কাজ করছে তাঁর মধ্যে। একে একে সব অসুর শেষ হল। ইন্দ্রের ককুৎ প্রদেশে চেপে যুদ্ধ করেছিলেন, নাম হল ককুৎস্থ।

পিতা শশাদের নামে লজ্জার কালো, পুত্রের ককুৎস্থ নামে মহিমার আলো॥

২০. মান্ধাতার জন্ম

মহা দুঃখ যুবনাশ্বের। রাজা, কিন্তু অপুত্রক। তাই মুনিদের আশ্রম করলেন আশ্রয়।

দিন যায়। মুনিদেরও মায়া হল। তাঁরা যজ্ঞ করলেন।

যজ্ঞ শেষ হল। কিন্তু হল মধ্যরাত্রে। গোলও বাধল ওতেই।

মন্ত্রপূত জলের কলসী বেদীর মধ্যে রেখে মুনিরা শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালেই রাণীকে খাইয়ে দেওয়া হবে ঐ জল।

এদিকে যুবনাশ্বের পেয়েছে দারুণ পিপাসা। শ্রান্ত হয়ে মুনিরা শুয়েছেন। জলের জন্য ওঁদের ঘুমের ব্যাঘাত করা ঠিক হবে না। ভুল করে মন্ত্রপূত ঐ জলই রাজা পান করলেন।

ঘুম থেকে উঠে মুনিরা দেখলেন জল নেই। ওঁরা সুধোলেনঃ জল কি হল? মন্ত্রপূত জল। ছিল রাণীর জন্য। খেলে তিনি হতেন মহাবীর এক পুত্রের জননী। কিন্তু কি হল সে জল?

রাজা বললেনঃ না জেনে আমিই পান করে ফেলেছি। কি হবে?

যা হবার তা হল। সময় এল। রাজার দক্ষিণ কুক্ষি ফুঁড়ে জন্ম হল পুত্রের। অদৃষ্ট শুভ। রাজা মরলেন না। কিন্তু মুনিরা ভাবনায় পড়লেনঃ কার দুধে বাঁচবে এ শিশু?

দেবরাজ ইন্দ্র এলেন। বললেনঃ ভাবনা কি? আমাকে ধয়ন করবে।

ইন্দ্রকে ধয়ন করে বাঁচল। শিশুর নাম হল মান্ধাতা।

ইন্দ্র শিশুর মুখে আঙুল পুরে দিলেন। শিশু চুষতে লাগল। আঙুল দিয়ে অমৃত বেরিয়েছিল। মান্ধাতা এক দিনেই বড় হয়ে গেলেন।

তারপর পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে সুখে রাজত্ব করলেন মান্ধাতা। বলা হয়, সূর্যের যেখানে উদয় সেখান থেকে শুরু করে যেখানে সূর্যের অস্ত সে পর্যন্ত সমস্ত জায়গাই নাকি ছিল মান্ধাতার রাজ্যের মধ্যে॥

২১. মহর্ষি সৌভরি

তপস্যামগ্ন ঋষি সৌভরি। তপে তপে জলতলে কাটল বারো বছর।

সৌভরি ধ্যান করেন। নাতিপুতি নিয়ে খেলে বেড়ায় মৎস্যরাজ সম্মদ। সৌভরি দেখেন সম্মদ ঘুরে বেড়ায়, সামনে পিছনে পাশে একগাদা নাতিপুতি। ওরা খুশিতে খেলে। সম্মদের লেজে চাপে, বুকে চাপে, মাথায়ও। ওরা খেলে খুশির খেলা, সম্মদও মাতে সে খুশিতে। সৌভরি দেখেন, অন্যমনা হন। ভাবেন কি সুখেই না আছে সম্মদ—নাতিপুতি, খেলাখুশি, শুধুই খুশি। মাছের মত খারাপ জন্ম, তবু ওর অত সুখ। আমি যদি পারতাম নাতিদের নিয়ে এরকম নেচে খেলে কাটিয়ে দিতে।

জলের জীবন থেকে বেরিয়ে এলেন সৌভরি। ইচ্ছে বিয়ে করেন, সংসার করেন। কিন্তু মেয়ে কোথায়? বয়স হয়েছে ঢের। কে দেয়? চললেন মান্ধাতার কাছে। পঞ্চাশটি মেয়ে তাঁর।

সৌভরি এসেছেন। গণ্যমান্য ঋষি। মান্ধাতা ঋষিকে বন্দনা করলেন। সৌভরি বসলেন। বললেন ঃ স্থির করেছি বিবাহ করব। তোমার কন্যা সম্প্রদান কর। ফিরিয়ো না। ককুৎস্থকুলে চেয়ে না পেয়ে ফিরে যায় না কেউ। পৃথিবীতে রাজা আছেন অনেক, মেয়েও তাঁদের ঢের। কিন্তু তোমারই ভাল কুল। কারণ কিছু চাইলে তা দেওয়াই তোমাদের ব্রত। তোমার পঞ্চাশটির একটি আমাকে দাও। ভয় হচ্ছে না পেয়ে ফিরব। দুঃখ পাব।

রাজা পড়লেন ফাঁপরে। ঋষি বুড়ো থুত্থুড়ো। ফিরিয়ে দিলে শাপশাপান্ত করতে পারেন? মুখ নীচু করে রাজা ভাবেন।

সৌভরি বললেন ঃ ভাবছ কেন? অসম্ভব কিছু তো বলিনি। যে মেয়ে দেবার দাও। কৃতার্থ হব আমি। ওতেই তো আমার পাওয়া হল। ভাববার কি আছে অত?

সৌভরির শাপের ভয়ে খুব নরম হয়ে রাজা বললেন ঃ আমাদের কুলের নিয়ম যে অন্য প্রভু। সৎ কুলে জাত বরপুরুষকে মেয়েরাই বেছে নেয় ইচ্ছেমত। এখানে শুধু আপনার ইচ্ছে। তাদের যদি না হয়? তাই ভাবছি কি করা উচিত। কিনারাও পাচ্ছি নে কিছু।

সৌভরি ভাবলেন, তিনি বুড়ো, মেয়েরা তাই মত করবেনা। রাজা এই ভেবেই হয়ত এসব বলছেন। রাজাকে তিনি বললেন ঃ নিয়ম বজায় থাকুক, আমি তাইই করছি। আমাকে শুধু মেয়েদের মহলে ঢুকবার অনুমতি দাও। বর্ষবরকে হুকুম দিয়ে দাও শুধু। যদি কেউ চায় আমাকে, তবেই বিয়ে করব। না চায়, চলে যাব।

শাপের ভয়ে রাজা বর্ষবরদের ডেকে হুকুম দিলেন ঃ ঢুকতে দাও এঁকে।

মেয়েদের মহলে ঢুকবার সময় সৌভরি ভুবনভোলানো রূপ ধরলেন। মহলের পাহারাদার মেয়েদের বলল ঃ আপনাদের পিতার আজ্ঞা—পাণিপ্রার্থী এই ঋষিকে কেউ বরণ করতে চাইলে রাজা সেইমতই কার্য সম্পন্ন করবেন।

মেয়েরা কোলাহল করে উঠল ঃ আমি আগে, আমি আগে।

সবাই আনন্দের সঙ্গে বরণ করল সৌভরিকে। তারপর বেধে গেল গোল। কেউ বলে ঃ কেন চেষ্টা করছ। আমি এঁকে বরণ করেছি। তুমি যোগ্য নও এঁর। ভগবান ওঁকে আমার জন্য, আমাকে ওঁর জন্য সৃষ্টি করেছেন। থাম তোমরা।

কেউ বলল ঃ আহা, ইনি যখন ঘরে ঢুকছেন তখন আমিই তো বরণ করলাম।

ঃ ইঃ, আমি করলাম, এখন কিনা উনি।

এইভাবে মেয়েদের মধ্যে বেধে গেল মহা ঝগড়া।

শেষ পর্যন্ত একে একে সবাই যখন সেই অনিন্দ্যসুন্দর ঋষিকে বরণ করে নিল তখন মেয়ে মহলের রক্ষক রাজাকে গিয়ে সব কথা জানাল। রাজার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল ঃ কি সব বলছ আজে বাজে ?…আমি কি করব ?… …আমি কি কিছু বলেছি ! ইত্যাদি নানা কথা বলতে লাগলেন মান্ধাতা। হয়ত এ সময় নিজের মাথার চুল ছিঁড়তেও ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। কিন্তু উপায় নেই কোন। ইচ্ছে নেই, তবু রাখতে হল কথা।

সৌভরি মেয়েগুলিকে নিয়ে তুললেন নিজের আশ্রমেই। এসেই যিনি দ্বিতীয় বিধাতার মত সেই মহাশিল্পী বিশ্বকর্মাকে ডাকলেন। আদেশ দিলেন প্রত্যেক মেয়ের জন্য পৃথক পৃথক প্রাসাদ তৈরি করে দিতে। প্রত্যেক প্রাসাদেই থাকবে সরোবর। তাতে পদ্ম আর হাঁস। থাকবে উপবন, রমণীয় শয্যা, সুন্দর আসন, আর চমৎকার সব সাজসজ্জা। রইল অনপায়ানন্দ নামে এক মহানিধি।

তারপর সুখ, শুধু সুখ। মান্ধাতার মেয়েরা ভালভাল হরেক খাবারদাবার অনেক সুখ ও তৃপ্তির সমুদ্রে ডুবে রইল। অতিথি কুটুম্ব দাসদাসীদেরও ডুবিয়ে রাখল। ঢেউ উঠল, উঠতে থাকল—শুধু তৃপ্তির ঢেউ।

চিন্তা উঠল রাজার মনে—না জানি মেয়েরা তাঁর কেমন আছে। সুখে না দুঃখে, না দুঃখেসুখে।

ঋষির আশ্রমে রাজা এলেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। মনোরম উপবন, মনোহর সরোবর। জ্বলজ্বলে স্ফটিকে তৈরি প্রাসাদ। চাউনি ঠিকরে যেতে থাকল।

একটি প্রাসাদে প্রবেশ করলেন রাজা। মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। বহুকাল পরে দেখা। স্নেহে ভরা বাবার মন। আদর জানালেন মেয়েকে। স্নেহ আনন্দ

আকুলতা গলে মিশে চোখ দুটোকে ভরিয়ে তুলল। টলটল করতে থাকল আর জ্বলল স্ফটিকের মত স্নেহের আলো।

মেয়েকে সুধোলেন ঃ ভাল আছ তো ? দুঃখকষ্ট নেই তো কোন ! কোন অভাব ? ঋষি ভালাবাসেন তো ? বাড়ির কথা মনে করে মন খারাপ কর না তো ?

ঃ এখানে কিসের অভাব বাবা। সবই তো আছে। সুন্দর প্রাসাদ, উপবন, পদ্মদীঘি, পাখিদের গান, মনের মত খাবারদাবার, গয়নাগাঁটি, কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, প্রসাধনের যাবতীয় সামগ্রী—সবই আছে। কিছুরই অভাব নেই। তবু বাপের বাড়ির কথা কে ভুলতে পারে ?…

একটু থেমে মেয়ে বলল আবার ঃ দুঃখ নেই তাও হয়ত ঠিক নয়। আছে, বোনেদের জন্য বড় কষ্ট হয়। ঋষি আমার এখানেই সব সময় থাকেন, অন্য কোন বোনের কাছে যান না। তাই ওদের বড় দুঃখ।

আরেক মেয়ের বাড়ি গেলেন রাজা। তাকেও সুধোলেন সব খুঁটিয়ে। খুঁটিনাটি সব সুখের কথা সেও বলল। এও বলল আগের জনের মত ঃ স্বামী সর্বক্ষণ থাকেন আমারই পাশে পাশে, একেবারে কাছটিতে। বোনেদের কাছে একদম যান না।' ভাল লাগে না তাই।

একে একে সব প্রাসাদেই রাজা গেলেন। তত্ত্বতল্লাস করলেন। সবাই সেই এক কথা বলল। সেই একই সুখ একই দুঃখ। বিস্ময় ও আনন্দ ঢেউ হয়ে হয়ে ভেঙ্গে পড়তে থাকল রাজার মনের তটে। অবশ হল তাঁর মন।

সৌভরি নির্জনে ছিলেন। রাজা গেলেন তাঁর কাছে। বন্দনা করে বললেনঃ কি অপূর্ব আপনার সিদ্ধি। সবই দেখলাম প্রভু। এমন বিভূতিবিলাস অন্য কারও আর দেখিনি। মনে হয় এসব আপনার তপের কিঞ্চিৎ প্রকাশ।

রাজা ফিরতে পারলেন না রাজ্যে। ঋষির কাছে রয়ে গেলেন কিছুকাল। সাধ মিটিয়ে সুখ করলেন। তারপর ফিরলেন রাজধানীতে।

সময় বসে থাকে না। সে চলে। চলল। সৌভরির দেড়শো ছেলে হল। ছেলেদের উপর তাঁর মমতাও বাড়তে থাকল দিন দিন। তিনি ভাবতেন, সবসময় ভাবতেন ছেলেদেরই কথা। আহা কি মিষ্টি বোল ওদের মুখে, কবে যে শিখবে হাঁটতে ! এরা কি একদিন বড় হবে, যুবক হবে ? পারবেন কি দেখে যেতে এদের বিয়ে, এদের ছেলেপুলে ?

ভাবনার শেষ নেই, ইচ্ছেরও। যত ভাবেন, নতুন ইচ্ছে ততই মাথা চাড়া দিয়ে ভেসে উঠে। তা পূর্ণ হয়, আবার আর এক ইচ্ছে। ইচ্ছের পর ইচ্ছে। যেন ক্ষয় নেই, লয় নেই। সৌভরি ভাবলেন, লক্ষ লক্ষ বছরেও এ শেষ মানবে না। কেবলি নতুন নতুন ইচ্ছে গজিয়ে উঠতে থাকবে। ছেলে চলতে শিখল, বলতে শিখল, বড় হল, বিয়ে হল, ছেলে হল—একের পর এক এর সবই তো

দেখলেন তিনি। তবু মন বলে, ছেলের ছেলে দেখব, তার ছেলে দেখব। যতদিন না মরণ ততদিন এই এক লীলা। যার মনে শত ইচ্ছের ওঠা পড়া, যে ওতে একান্ত আসক্ত, ভগবানে লীন হতে কোনকালেই সে পারে না।

সৌভরির মনে অনুতাপের দহন শুরু হল। কি জীবনে ছিলেন, আর কি জীবনে আছেন! মাছের সঙ্গে পড়ে তাঁর মন দুলেছিল। তাই বিয়ে এবং একের পর এক ইচ্ছের ঢেউ। আসলে শরীর ধারণ করলেই দুঃখ। তাঁর একের দুঃখ দেড়শোতে পরিণত। পরে তাদেরও ছেলেপুলে হবে। ওঁর দুঃখ ছড়িয়ে পড়বে আরও। একা হলেই মুক্তি সহজ। সঙ্গ করলেই জন্মে বহু দোষ। যার যোগ সম্পূর্ণ সেও সঙ্গদোষে নীচে নামে, ছোট হয়। সিদ্ধি যার কম, সে যায় গোল্লায়।

কি বিচিত্র! রূপমোহে, সঙ্গমোহে এতকাল এ সত্যটা বোঝেন নি সৌভরি। লজ্জায় ক্ষোভে বিষণ্ণ বিক্ষিপ্ত হল তাঁর মন। নারায়ণ, নারায়ণ স্মরণ করলেন বারংবার।

কি বিচিত্র! মোহের এ কি আকর্ষণ! এত সুখ করলেন, পঞ্চাশ গৃহে পঞ্চাশ গৃহিণীসহ পঞ্চাশরূপে তিনি সঙ্গ করলেন। তবু তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই।

না, যে তপঃশক্তি তিনি সুখভোগের প্রেয়কর্মে ব্যবহার করেছেন, এবার বিষ্ণুযোগে তা শ্রেয়োসাধনায় ব্যবহার করবেন।

সৌভরি মনকে শাসন করলেন। দুঃখে যাতে না ডুবতে হয়, নিজেকে যাতে ভগবানে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাই তিনি করবেন। এই তাঁর পণ। যার শুরু নেই শেষ নেই, আগা নেই গোড়াও নেই, যিনি ছাড়া কোন সত্য নেই—সেই বিষ্ণুর শরণ নেবেন সৌভরি।

অনুতাপের আগুনে প্রদীপ্ত সৌভরি বিষ্ণুসাধনায় বসলেন কৃতাঞ্জলি ॥

২২. পুরুকুৎস ও সর্পকুল

সাত পাতালের মধ্যে রসাতলও একটি। এই রসাতলে বাস করত ষাট কোটি গন্ধর্ব।

গন্ধর্বরা একবার সর্পদের সমস্ত রত্ন ও আধিপত্য হরণ করেছিল। সর্পেরা বিষ্ণুর কাছে গেল। বলল: গন্ধর্বদের ভয়ে আমরা অস্থির। এ ভয় কি নষ্ট হবে না?

ভগবান অভয় দিলেন। বললেন: মান্ধাতার পুরুকুৎস নামে যে পুত্র তার শরীরে ভর করে দুষ্ট গন্ধর্বকুল বিনাশ করব।

সর্পেরা বিষ্ণুকে প্রণাম করে ফিরে গেল রসাতলে। তারপর পুরুকুৎসকে রসাতলে নিয়ে আসবার জন্য পাঠাল নর্মদাকে। নর্মদা তার কাজ করল। নিয়ে গেল পুরুকুৎসকে। ভগবানের তেজ ও বীর্য জমা হয়েছিল পুরুকুৎসের মধ্যে। গন্ধর্বদের নির্মূল করে তিনি ফিরলেন।

সর্পসমাজের যারা মাথা তারা মিলিত হল। প্রসন্ন হয়ে নর্মদাকে ওরা বর দিল। বলল ঃ যে কেউ তোমার নাম নেবে, সাপের ভয় তার দূর হবে।। 'সকালে নর্মদাকে নমস্কার, রাত্রে নর্মদাকে নমস্কার। নর্মদা, তোমাকে নমস্কার, সাপের বিষ থেকে রক্ষা কর আমাকে'—এ কথা যে উচ্চারণ করবে, দিন বা রাত্তির যখনই হোক সাপে তাকে দংশন করবে না। এমনকি নর্মদাকে মনে ভেবে বিষ পান করলেও সে রক্ষা পাবে।

পুরুকুৎসকে তারা বর দিল। বলল ঃ তোমার বংশ কখনই বিনষ্ট হবে না ।।

২৩. পৃথিবীপতি সগর

পুরুকুৎসের বংশের সপ্তদশ পুরুষের নাম বাহু। হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দের কাছে একবার বাহু পরাজিত হলেন।

পরম পরাজয়। বনে চলে এলেন রাজা বাহু। এখানেই ওঁর এক রাণী পুত্রবতী হলেন। কিন্তু হিংসার জ্বালায় সতীনে দিল বিষ। এমনই বিষ যে পেটের ছেলে রয়ে গেল পেটেই। সাত বছর পরে তবে জন্ম হল সগরের। তাও হত না যদি না রাণী ঋষির কথামত কাজ না করতেন।

রাজা বাহু ঔর্বঋষির আশ্রমে মারা গেলেন। রাণীও রাজার চিতায় একই সঙ্গে পুড়ে মরবেন। সব ঠিকঠাক।

ঔর্ব ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। সবই তাঁর জানা। আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন ঃ এ কাজ ভাল নয়, করবেন না আপনি। আপনার উদরে যে বিরাট এক মহাবীর বাস করছেন, তিনি পৃথিবীর অধিপতি হবেন, শত্রু জয় করবেন, যজ্ঞও করবেন বহু। এ চেষ্টা ঠিক নয়, অতএব করবেন না, করবেন না একাজ।

রাণী চিতায় উঠলেন না। ঋষির মান রাখলেন। তাঁর আশ্রমেই পেলেন আশ্রয়। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই জন্ম হল মহাতেজী এক ছেলের। ইনিই বিখ্যাত সগর।

সগরের উপনয়ন হল। ঔর্ব তাঁকে শেখালেন বেদ প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যা।

সগর বড় হলেন। বালকটি রইলেন না আর। মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তপোবনে কেন আমরা আছি ? আমার পিতা কে, কোথায়ই বা তিনি ?

একে একে মা সব বললেন। সগরের রাগ দেখে কে! পিতার রাজ্য যারা কেড়ে নিয়েছে তাদের তিনি বধ করবেনই। এই তাঁর পণ।

যেমন কথা তেমনি কাজ। হৈহয়রাজারা মারা পড়লেন সগরের হাতে। আহত হল শক, যবন, কম্বোজ, পারদও পহ্লবরা। ওরা শরণ নিল সগরের কুলগুরু বশিষ্ঠের।

বশিষ্ঠের কথায় সগর নিরস্ত হলেন। শত্রুদের প্রাণে মারলেন না, তবে সাজিয়ে দিলেন পরাভবের নানা সজ্জায়। যবনদের দিলেন মাথা মুড়িয়ে, শকদের আধমাথা কামিয়ে, পারদদের লম্বা চুল রইল ঝুলে, আর মুখ বোঝাই লম্বা দাড়ি হল পহ্লবদের।

রাজ্যের বহির্দেশে আত্মগোপন করে তারা বাঁচল ॥

২৪. অশ্বমেধের ঘোড়া

কশ্যপের কন্যা আর বিদর্ভরাজের কন্যা, সুমতি আর কেশিনী—সগর-রাজার দুই রাণী। ছেলে নেই। শান্তি নেই। তাই সুমতি আর কেশিনী আরাধনা করলেন মহর্ষি ঔর্বের।

ঔর্ব বললেন ঃ দুই বর দেব। এক বরে মাত্র একটি, অপর বরে ষাট হাজার। যার যেটা খুশি।

কেশিনী চাইলেন একটি ছেলে। সুমতি নিলেন ষাট হাজারের বর।

ঔর্বের উত্তর ঃ তাই হবে।

কেশিনীর একটি ছেলে হল। নাম অসমঞ্জস। ছোট থেকেই ছেলেটি বড় বেয়াড়া আর দুর্দান্ত হয়ে উঠল। সগর ভাবলেন, বয়স হলে শুধরে যাবে। কিন্তু স্বভাব শুধরোল না। যেমন তেমনই রইল। সগর তাই ছেলেকে ত্যাগ করলেন।

সুমতির ষাট হাজার ছেলেই হল। কিন্তু তারাও বকে গেল অসমঞ্জসের সংসর্গে পড়ে। জগতের যত যজ্ঞ সব ওরা পণ্ড করে বেড়াত। দেবতারা চিন্তায় পড়লেন।

মহাশক্তি ঋষি কপিলের। দেবতারা গিয়ে ধরে পড়লেন ওঁকে। বললেন ঃ সগরের ছেলেরা যা কাণ্ড শুরু করেছে তাতে জগতের বড় বদ হাল হয়ে পড়েছে। আর্তের পরিত্রাণের জন্যই তো আপনার জন্ম। আপনিই পারেন যাহোক কিছু বিহিত করতে।

কপিল বললেন ঃ অল্পদিনের মধ্যেই নিপাত যাবে ওরা।

এই সময় সগর রাজা শুরু করলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ। যজ্ঞের ঘোড়া রাখবার ভার পড়ল তাঁর ছেলেদের উপর।

কিন্তু ঘোড়া চুরি গেল। কে একজন ঘোড়া চুরি করে পাতালে গিয়ে ঢুকল। ঘোড়াটিকে সেখানেই রাখল লুকিয়ে। খোঁজ খোঁজ। সগর ছেলেদের ঘোড়া খুঁজে আনতে পাঠালেন।

ছেলেরা পথে দেখল ঘোড়ার খুরের চিহ্ন। তাই ধরে চলল। পথ আর শেষ হয় না। এক একজন এক এক যোজন খুঁড়ে হাজির হল গিয়ে পাতালে। সেখানেই তারা দেখল, দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোড়াটি। কিছু দূরেই কপিল।

মহর্ষি কপিল বসেছিলেন। তাঁর তেজে উপরনীচ আটদিক আলোয় একেবারে আলোময়। শরৎ আকাশের সূর্যের মত সে আলো।

ঃ যজ্ঞ পণ্ড করে দিতে চায়, এইই চুরি করেছে ঘোড়া, মার্ মার্ ব্যাটাকে। —বলতে বলতে অস্ত্র উঁচিয়ে ধেয়ে গেল ওরা কপিলের দিকে।

কপিল চোখ তুলে একবার তাকালেন। চাউনির চেহারা গেল পালটে। তাঁর তেজ আগুন হয়ে বেরুল। জ্বলেপুড়ে মরল সাগরের সবগুলি ছেলে।

সগর খবর পেলেন। ছেলেরা কপিলের তেজে পুড়ে মরেছে। সগর নাতিকে পাঠালেন ঘোড়া আনতে। অসমঞ্জসের ছেলে অংশুমান। চলল সে খুড়োদের খোঁড়া পথে।

কপিলের কাছে গিয়ে অংশুমান স্তব করল তাঁর। প্রসন্ন হলেন কপিল। বললেন ঃ এই সেই অশ্ব, পিতামহকে গিয়ে দাও। আমি প্রসন্ন তোমার স্তবে। বর প্রার্থনা কর। স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনবে তোমার পৌত্র।

অংশুমান চাইলেন ঃ আপনার কোপে যাঁরা নিহত, তাঁরা যেন স্বর্গে যেতে পারেন।

কপিল বললেন, ঃ বলেইছি তোমার পৌত্র স্বর্গ থেকে মর্ত্যে গঙ্গাকে নামিয়ে আনবে। সেই গঙ্গার জল এদের অস্থিতে পড়লেই স্বর্গে যাবে এরা। গঙ্গার উৎপত্তি বিষ্ণুর পায়ের অঙ্গুষ্ঠ থেকে। এর জলের এমনই মহিমা যে তা বলবার নয়। কোন কিছু কামনা করে গঙ্গাস্নান করলে তা পূরণ হয়। মৃতের অস্থি চর্ম কেশ শরীরের কিছু একটাও যদি গঙ্গায় পড়ে তাহলেও তার স্বর্গলাভ।

অংশুমান প্রণাম করলেন কপিলকে। সগরকে এনে দিলেন সেই ঘোড়া। তাঁর যজ্ঞও শেষ হল। মাঝ থেকে পাপগুলো ছাই হয়ে পড়ে রইল পাতালে।।

২৫. মিত্রসহ : রাজা ও রাক্ষস

সৌদাস মিত্রসহ গেছেন মৃগয়ায়। বনের পথে চলেছেন, হঠাৎ দেখলেন একজোড়া বাঘ। বনের সবগুলি হরিণকেই বাঘদুটি সাবাড় করে বসে আছে।

রাজা মিত্রসহ তীর ছুঁড়ে একটি বাঘকে নিহত করলেন। বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল মিত্রসহের মনে। মরবার সময় বাঘটি বিরাট হাঁ করে রাক্ষসের চেহারা নিল। অন্য বাঘটি 'শোধ নেব এর' বলে কোথায় যে মিলিয়ে গেল চিহ্ন মিলল না কোথাও।

মিত্রসহ যজ্ঞ করলেন। বশিষ্ট হলেন পুরোহিত। যজ্ঞ শেষ হল। বাইরে এলেন বশিষ্ট।

বশিষ্ট রাজাকে বললেন: যজ্ঞ তো শেষ হল, এবার আমাকে মাংস খাওয়ানো কর্তব্য। ব্যবস্থা কর, আমি আসছি।

রাঁধুনি এসে রাজার আজ্ঞা নিয়ে গেল। মাংস রেঁধে রাজার কাছে রেখে গেল। রাজা সৌদাস মিত্রসহ সোনার বাটিতে মাংস সাজিয়ে বসে রইলেন।

বশিষ্ট এলেন। যত্ন করে রাজা তাঁকে ঐ মাংস নিবেদন করলেন। কিন্তু এ কি, কার মাংস, কিসের মাংস নিবেদন করা হল বশিষ্টকে? এ কি নির্বোধ কৌতুক মিত্রসহের? ধ্যানে বসলেন বশিষ্ট। বুঝলেন, সোনার বাটিতে সাজানো রয়েছে নরমাংস।...তাহলে নবমাংস তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছে?

রাগে অন্ধ হয়ে শাপ দিলেন বশিষ্ট: জেনেশুনেও অখাদ্য পরিবেশন! তুমি রাক্ষস হবে।

রাজা একেবারে থ। বশিষ্টই বললেন করতে, আর করার পর উনিই করছেন শাপশাপান্ত! রাজা বললেনও; দেব, আপনিই তো এরকম করতে বললেন।

বশিষ্ট যেন আকাশ থেকে পড়লেন: অ্যাঁ আমি বলেছি?

আবার ধ্যানে বসলেন মুনি। জানতে পারলেন সব। বুঝলেন এ সবই সেই বাঘের কারসাজি। সেই তাঁর শরীর ধরে রাজাকে ঠকিয়েছে, আবার সেই বাঁধুনি সেজে নরমাংস রেঁধে সাজিয়ে দিয়ে গেছে।

রাজার প্রতি মায়া হল বশিষ্টের। বললেন: বেশিদিন ভুগতে হবে না। মাত্র বারটা বছর।

এদিকে রাজাও রেগে আগুন। কিনাদোষে শাপের ভোগ কেন ভুগবেন তিনি? তিনিও অঞ্জলি করে জল নিয়ে শাপতে উঠলেন বশিষ্টকে।

রাণী মদয়ন্তী ছিলেন তাই রক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে 'কি করেন কি করেন' বলে তিনি ছুটে এলেন। বললেন: কুলগুরুকে শাপ দেওয়া কখনই উচিত নয়।

রাজা নিবৃত্ত হলেন। শাপজল ফেলা নিয়ে হল সমস্যা। মাটিতে ফেললে

শস্য যাবে জবলে, আকাশে ছুঁড়লে মেঘ যাবে উড়ে। তাই রাজা সেই জল নিজের পায়ে ফেললেন। রাগের আগুনে গরম সে জল সইল না পায়ে। কালচে বিশ্রী হয়ে গেল পা দুখানি। নামও হল তাই কল্মাষপাদ।

শাপের তিনদিনের দিন রাজা মিত্রসহ বনে বনে ঘুরতে থাকলেন হন্যে হয়ে। এখন তিনি রাক্ষস। মানুষ খেয়ে আর তাঁর মেটে না। মানুষ পান, ধরেন, আর খান।

একদিন এক কাণ্ড হল। এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। বসে আছেন বিভোর হয়ে। হঠাৎ দেখলেন, সামনে ভীষণ রাক্ষস। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পড়িমরি করে ছুটলেন বনের পথে। মিত্রসহ রাক্ষসও ছুটলেন। ব্রাহ্মণকে ধরলেন হাতের মুঠোয়।

ব্রাহ্মণী কিন্তু রাক্ষসকে চিনেছিলেন। কাতর হয়ে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষে চাইলেন! বললেনঃ মহারাজ, আপনি রাক্ষস নন, ইক্ষ্বাকু কুলের তিলক মিত্রসহ। দয়া করুন। আপনারও স্ত্রী আছেন। অতএব দয়া করুন, অধর্ম করবেন না।

রাজা কান দিলেন না ব্রাহ্মণীর বিলাপে। বাঘ যেমন তার শিকারকে ভোজন করে তেমনি তিনি ব্রাহ্মণকে ভোজন করলেন।

ব্রাহ্মণী রাগে দুঃখে তখনই শাপ দিলেনঃ আমার তৃপ্তি না হতেই স্বামীকে খেয়েছ, স্ত্রী থেকে তুমিও সুখী হবে না, মিলিত হলেই বিনষ্ট হবে।

ব্রাহ্মণী আগুনে আত্মাহুতি দিলেন।

বার বছর অতিক্রান্ত হল। মিত্রসহ শাপমুক্ত হলেন, রাজা হবেন। কিন্তু পড়লেন এক শাপ থেকে আর এক শাপের উপকূলে।

রাজা রাণীর সঙ্গে মিলিত হতে গেলেন। কিন্তু মদয়ন্তী রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণীর সেই দুঃসহ অভিশাপের কথা। রাজাকে দূরে দূরে থাকতে হল, রাণীকেও। প্রাণরক্ষার সুদুঃসহ তপস্যায় মিত্রসহকে হয়ে যেতে হল ব্রহ্মচারী॥

২৬. খট্বাঙ্গ দিলীপ

খট্বাঙ্গ দিলীপ। অনন্ত তাঁর মহিমা। সপ্তর্ষিরা এক শ্লোকে এই মহিমাই গান করেছেন। তাঁরা বলেছেনঃ পৃথিবীতে খট্বাঙ্গ দিলীপের মত আর কেউই জন্মাবে না।

দেবে অসুরে সংগ্রাম। দেবতারা সাহায্যপ্রার্থী হলেন খট্বাঙ্গ দিলীপের। বরণ করলেন তাঁকে। অনন্তবীর্য খট্বাঙ্গ দিলীপ।। তাঁর হাতেই বিনষ্ট হল অসুরকুল। দেবতারা খুশি হলেন। বর দিতে চাইলেন।

খট্বাঙ্গ বললেনঃ আগে বলুন কতদিন অবশিষ্ট আছে আমার আয়ু।

ঃ এক মুহূর্ত।

ঃ যদি বর দিতেই হয়, আর নিতান্তই যদি দিতেই চান, তাহলে এমন বর দিন⋯ ।

বলতে বলতে দিব্যরথে চেপে মুহূর্তেরও কম সময়ে দিলীপ মর্ত্যে এসে পেঁৗছলেন। বলতে লাগলেনঃ যেহেতু ব্রাহ্মণরা নিজের থেকেও আমার প্রিয়, যেহেতু আমি কখনোই নিজের ধর্ম লঙ্ঘন করিনি, যেহেতু দেবতামানুষ বৃক্ষপশু সবেতেই বিষ্ণু দেখেছি, তাই আজ সেই পরমদেবতা ভগবান বিষ্ণুকে যেন আমি পাই।⋯

বলতে বলতে খট্বাঙ্গ দিলীপ বিষ্ণুতে বিলীন হলেন।

তাই সপ্তর্ষিরা খট্বাঙ্গ দিলীপের মহিমা গান করেন আব বলেনঃ এমনটি আর হবে না। জেনেছিল মুহূর্তমাত্র আয়ু তার অবশিষ্ট। তারই মধ্যে পৃথিবীতে এসে সৎপাত্রে দান করে ত্রিলোকই জয় করে নিল ।।

২৭· শাপ ও প্রতিশাপ

ইক্ষ্বাকুর ছেলে নিমি। যজ্ঞ করবেন তিনি। হাজার বছর ধরে চলবে যজ্ঞ। বশিষ্টকে বরণ করলেন হোতৃত্বে।

বশিষ্ট বললেনঃ ইন্দ্র পাঁচশো বছর ধরে এক যজ্ঞ করবেন। তিনিও বরণ করেছেন আমাকে। অতএব আপনি অপেক্ষা করুন। ইন্দ্রের যজ্ঞ সারা হলেই শুরু করব আপনার যজ্ঞ।

রাজা নিমি কিছু বললেন না। বশিষ্ট ভাবলেন রাজা তাঁর কথায় রাজী। নিশ্চিন্ত মনে ইন্দ্রের যজ্ঞ শুরু করলেন তিনি!

নিমি বশিষ্টের জন্য বসে রইলেন না। গৌতম ও অন্যান্য ঋষিদের সাহায্যে যজ্ঞের কাজ আরম্ভ করিয়ে দিলেন। যজ্ঞ চলল, চলতে থাকল।

বশিষ্ট ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করলেন। শেষ করেই তাঁর মনে পড়ল, নিমির যজ্ঞ করতে হবে। এক মুহূর্ত বয়ে যেতে দিলেন না। সোজা চলে এলেন। কিন্তু যা দেখলেন তাতে রাগে অন্ধ হলেন বশিষ্ট। তাঁকে অবজ্ঞা! নিমির এত বড় স্পর্ধা! শাপ দিলেন বশিষ্ট। নিমি তখন ঘুমিয়ে। তা সত্ত্বেও বশিষ্টের শাপ বর্ষিত হলঃ আমাকে হেলাফেলা, অতএব দেহহীন হবে তুমি।

রাজা নিমিও চটে গেলেন ভয়ানক। কিছুই জানেন না তিনি। ঘুমিয়ে ছিলেন শান্তিতে। তাঁর সঙ্গে আলাপ না করেই বশিষ্ট শাপ দিলেন। অতএব, ‘এই দুষ্ট গুরু বশিষ্টেরও দেহ থাকবে না’। শাপের জবাবে শাপ।

নিমির দেহ রইল না। আত্মা রইল হাওয়ায় মিশে। বশিষ্ঠের তেজ মিশল মিত্রাবরুণের তেজে।

তারপর মিত্রাবরুণ থেকে বশিষ্ট অন্য শরীর লাভ করলেন। নিমির মৃতদেহ মনোহর তৈল ও গন্ধে লিপ্ত হল। তাই পচে গলে নষ্ট হল না। এমন রইল যেন সদ্য মরেছেন রাজা।

যজ্ঞ শেষ হল। যজ্ঞের ভাগ নিতে দেবতারা এলেন। গৌতম ও অন্যান্য মুনিরা ছিলেন ঋত্বিক। দেবতাদের ওঁরা বললেনঃ যজমানকে বর দিন।

দেবতারা বর দিতে চাইলে নিমি বললেনঃ আপনারা সংসারের দুঃখজ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারেন। শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ যে কি নিদারুণ দুঃখের তা আপনাদের অজানা নয়। শরীর গ্রহণ করতে আর আমি চাইনে। কিন্তু আমি যেন সকল মানুষের নয়নে বাস করতে পারি। এই বরই আমাকে প্রদান করুন।

দেবগণ নিমিকে সমস্ত মানুষের নেত্রে অবস্থান করালেন। তাই নিমি বেঁচে রইলেন চোখের পাতায়, উন্মেষ ও নিমেষে।

নিমি অপুত্রক ছিলেন। মুনিরা রাজ্যজুড়ে হৈচৈ কাণ্ড বেধে যাবার আশঙ্কা কবলেন। অরণি দিয়ে নিমির শরীর ওঁরা মন্থন করতে লাগলেন। পুত্র জন্মাল। ইনিই জনক। পিতার দেহ থেকে জন্ম, তাই জনক। পিতা বিদেহ হন, বৈদেহ নাম হল পুত্রের। মন্থনে জন্ম, অতএব মিথি নামেও তাঁর পরিচিতি ॥

২৮· চন্দ্র ও বুধ[১]

ব্রহ্মার পুত্র অত্রি। অত্রির পুত্র চন্দ্র। নক্ষত্রসমূহ, ওষধি ও দ্বিজগণের অধিপতি হলেন চন্দ্র। ব্রহ্মার কৃপাতেই চন্দ্রের এই সম্মান। চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। সবসেরা যে আধিপত্য তাতে অধিষ্ঠিত হলেন তিনি। ফলে অহংকারে ভরে উঠল চন্দ্রের মন। তিনি অন্ধ হলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নীকে হরণ করলেন।

বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে নিবেদন করলেন তারাহরণের ঘটনা। ব্রহ্মা অনুরোধ করলেন চন্দ্রকেঃ ফিরিয়ে দাও তারাকে।

দেবর্ষিরা প্রার্থনা করলেন বারবার। কিন্তু চন্দ্র টললেন না। তারাকেও ফিরিয়ে দিলেন না।

দৈত্যের গুরু শুক্র বৃহস্পতিকে পছন্দ করতেন না আদৌ। বৃহস্পতি শুক্রের শত্রু। শুক্র তাই চন্দ্রের পক্ষে দাঁড়ালেন। চন্দ্রের দিকে জম্ভ, কুজম্ভ

ইত্যাদি তাবৎ দৈত্যদানব গেল দাঁড়িয়ে। রুদ্র বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার শিষ্য। বৃহস্পতির পক্ষে এলেন তিনি। ইন্দ্রও দেবসৈন্য নিয়ে বৃহস্পতিকে সাহায্য করলেন। দুই পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হল। তারার জন্য এই যুদ্ধ ঘটেছিল বলে এর নাম তারকাময়।

একপক্ষে রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ, অন্যপক্ষে শুক্রাচার্য ও দৈত্য-দানবেরা। অস্ত্রে অস্ত্রে প্রচণ্ড ঘর্ষণ, জগৎ কেঁপে উঠল। ব্রহ্মার শরণ নিল সবাই। ব্রহ্মা এসে যুদ্ধ নিবারণ করলেন। তারাকে ফিরিয়ে দিলেন বৃহস্পতির হাতে।

তারা তখন সন্তানবতী। বৃহস্পতি বললেন, তুমি আমার পত্নী, অন্যের পুত্র ধারণ করা তোমার পাপ, অতএব ত্যাগ কর একে।

বৃহস্পতির কথামত তারা মুঞ্জতৃণগুচ্ছে পুত্র ত্যাগ করলেন। ত্যাগ করার সাথে সাথেই সেই পুত্র এমন অনিন্দ্যকান্তি বিকীর্ণ করতে থাকল যা দেবতাদের তেজকেও লজ্জা দিতে পারে।

বৃহস্পতি কুমারের দিকে সস্নেহে তাকিয়ে রইলেন। চন্দ্রও চোখ ফিরাতে পারলেন না। দুজনের মনেই তখন অনেক ইচ্ছা, রঙ। দুজনেই প্রসন্ন, স্নেহ রসে সিক্ত।

দেবতাদের মনে সন্দেহ এল। তারাকে তাঁরা শুধোলেন, সত্যি করে বল দেখি এ সন্তান চন্দ্রের না বৃহস্পতির ?

তারা লজ্জায় নুয়ে পড়েছেন তখন। কথা সরল না মুখে। বারবার দেবতারা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কার এ পুত্র ? চন্দ্রের না বৃহস্পতির ?

তারা নীরব।

মায়ের আচরণে ক্ষুণ্ণ হল সেই কুমার। শাপ দিতে উঠল মাকে। বলল ঃ তোমার স্বভাব নিতান্তই মন্দ, তা না হলে পিতার নাম বলছ না কেন ? বলি-হারি লজ্জা ! আমার শাপে আজ থেকে তোমার মত মন্থরভাষিণী হতে কেউ পারবে না।

ব্রহ্মা এসে সেই কুমারকে নিবৃত্ত করলেন। তারাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ছেলে কার বল, লুকিয়ো না।

লজ্জায় জড়সড় তারা। কথা সরছে না। জিব অবশ, আড়ষ্ট, কোনরকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন ঃ চন্দ্রের।

চন্দ্র এগিয়ে এলেন। ধন্য ধন্য করলেন ছেলের। বললেন ঃ তুমি যথার্থই প্রাজ্ঞ, তাই বুধ হল তোমার নাম।

আনন্দে, খুশিতে তৃপ্তিতে, প্রসন্ন প্রশান্তিতে এই সময় উচ্ছ্বসিত হল, দীপ্যমান হল চন্দ্রের কপোলকান্তি ॥

২৯. পুরূরবা ও উর্বশী

পুত্র চান মনু। মিত্র ও বরুণকে খুশি করতে যজ্ঞ করলেন। মনুর পত্নী কন্যাপ্রার্থী। হোতা কন্যালাভের সঙ্কল্প করলেন। ইলার জন্ম হল। কিন্তু মিত্রাবরুণের অশেষ অনুগ্রহ। কন্যা হল পুত্র, ইলা হল সুদ্যুম্ন।

ভগবানের কোপ পড়ল সুদ্যুম্নের উপর। তাই কন্যা বনতে হল তাকে। সুদ্যুম্ন ইলা হল।

বুধের আশ্রম ছিল কাছেই। ইলা একদিন বেড়াচ্ছিলেন সেই আশ্রমের ধারে কাছে। বুধ তাকে দেখলেন, মোহিত হলেন। বুধ ইলাকে উপহার দিলেন পুরুরবা নামক এক পুত্র।

পুরুরবা জন্মালেন। ইলাকে যাতে সুদ্যুম্নে ফিরিয়ে আনা যায় পরম ঋষিরা তার জন্য শিবের আরাধনা করতে থাকলেন। ইলা সুদ্যুম্ন হলেন।

আগে স্ত্রী ছিলেন, সুদ্যুম্ন রাজ্যভাগ পান নি তাই। বশিষ্টের কথায় পিতার কাছ থেকে প্রতিষ্ঠান নামক নগর পেলেন সুদ্যুম্ন। সুদ্যুম্ন নগরটিকে দান করলেন পুরুরবাকে।

পুরুরবা যজ্ঞ করছিলেন বহু, দানেও ছিলেন মুক্তহস্ত। শরীরে তাঁর লাবণ্যের ভরা জোয়ার, মনে প্রচণ্ড তেজ, মুখে নিত্য সত্য কথা। তাই দেখামাত্রই উর্বশী ভালবাসলেন পুরুরবাকে।

মিত্রাবরুণের শাপ ছিল। একদিন না একদিন মনুষ্যলোকে তাঁকে বাস করতেই হত। তাই মনুষ্যলোকে এলেন, পুরুরবাকে দেখলেন, ভাল লাগল, ভালবাসলেন। পুরুরবাও দেখলেন উর্বশীকে, বিস্মিত হলেন ঃ এক অঙ্গে এমন দিব্যকান্তি, এমন স্বর্গীয় লাবণ্য, এমন মুক্তোঝরানো হাসি! ভাল লাগল পুরুরবারও। দুজনের নয়নে নয়ন মিলল, কেউই পারলেন না ফিরাতে। জগতের সমস্ত প্রয়োজন ফুরাল তাঁদের কাছে, সব ভুললেন। এক মহানীরবতার মধ্যে শুধু এক বাসনা জেগে রইল, জ্বলল অকম্পিত শিখা বিস্তার করে ঃ পুরুরবা চান উর্বশীকে, উর্বশী পুরুরবাকে।

সে অখণ্ড নীরবতা ভেঙে পুরুরবা উচ্চারণ করলেন ঃ ভাল লেগেছে তোমাকে, পেতে চাই তোমাকে, মিলতে চাই তোমার সাথে, প্রসন্ন হও।

লজ্জা পেলেন উর্বশী। কথা গেল জড়িয়ে। বললেন ঃ আমার প্রতিজ্ঞা যদি রাখেন তাহলে আপনার ইচ্ছাতে আমার সম্মতি আছে।

ঃ কি তোমার পণ ?

ঃ পুত্রসম এই মেষদ্বয়। এরা সব সময়ই থাকবে আমার শয্যার পাশে। আমার সম্মুখে কখনও বিগতবস্ত্র হতে পারবেন না। আর আমার আহার মাত্র ঘৃত।

ঃ তাই হবে।

রাজার আমোদ আহ্লাদের সীমা থাকল না। কখনো অলকায় চিত্ররথ বনে, কখনো রমণীয় উপবনে, আবার কখনো পদ্মহ্রদে—মানস সরোবরে চলল তাঁদের প্রমোদবিহার। সুখ, সুখ, সুখের পর সুখ, আমোদ আহ্লাদ, আমোদের পর আহ্লাদ—ক্রমাগত সুখ আহ্লাদ—অবিরাম অফুরান। সরোবরের রাশি রাশি পদ্ম আমোদ হল, অজস্র আলো হাওয়া, তাদের দল খোলে একের পর এক, সুখ বাড়ে উর্বশীসঙ্গে পুরূরবার, পুরূরবা-সঙ্গে উর্বশীর। মনের ফাঁক গলে ছ হাজার বছর চলে গেল। কলায় কলায় বেড়ে পূর্ণিমার চাঁদ হল উর্বশীর ভালবাসা। স্বর্গের আরাম, সুখ সব ভুললেন তিনি।

এদিকে উর্বশী নেই। অপ্সরা, সিদ্ধ, গন্ধর্বদের কাছে সব যেন শূন্য মনে হল, ফ্যাকাশে পানসে মনে হল সুরলোক।

রাজার কাছে উর্বশীর প্রতিজ্ঞার কথা জানতেন বিশ্বাবসু। গন্ধর্বদের সঙ্গে মিলে একরাত্রে উর্বশীর একটি মেষ হরণ করলেন তিনি। আকাশে বাতাসে সেই মেষের কাতর ডাক ছুটোছুটি করল, ধ্বনি তুলল, প্রতিধ্বনি জাগাল।

উর্বশী চঞ্চল হলেন। বললেনঃ আমি অনাথা, কে আমার পুত্র হরণ করছে, কার যে শরণ নিই আমি।

রাজা উঠতে পারছেন না। বিগতবস্ত্র তিনি। উঠলে যদি দেখে ফেলে উর্বশী। এই ভয় রাজাকে ক্লীব করে রাখল।

দ্বিতীয় মেষটিও অপহৃত হল। সাড়া উঠল আকাশে বাতাসে। উর্বশী আর্ত হলেন। বললেনঃ নিতান্ত অনাথা আমি, স্বামীহীন। যার আশ্রয়ে আছি সেও কাপুরুষ! কে আমার সন্তানকে রক্ষা করবে?

পুরূরবা জ্বলে উঠলেন। ভাবলেন, এখন অন্ধকার, দেখতে পাবে না উর্বশী। উঠে পড়লেন লাফিয়ে। হাতে নিলেন খড়্গ। 'তবেরে দাঁড়া শেষ করি তোদের' বলতে বলতে ছুটলেন। ঠিক সময়টি বুঝে গন্ধর্বরা সৃষ্টি করলেন বিদ্যুৎ। আলোয় ঝলসে উঠল সর্বদিক। উর্বশী রাজাকে দেখলেন। রাজার পণ ভঙ্গ হয়েছে। উর্বশীর থাকা চলে না আর এক দণ্ডও। অতএব তিনি চলে গেলেন।

গন্ধর্বদের কাজ হাসিল হয়েছে। মেষে কি দরকার তাঁদের। ছেড়ে দিয়ে তাঁরাও পালালেন।

পুরূরবা দুটো মেষই ধরলেন, হৃষ্ট তাঁর মন। কিন্তু বাজ পড়ল যেন মাথায়। উর্বশী নেই, নেই, কোথাও নেই। উন্মত্ত হলেন রাজা। ছুটে বেড়ালেন দিকে দিকে চতুর্দিকে। দিনের পর দিন এই বিগতস্বস্ত্র পুরূরবাকে পাগলের মত হয়ে ছুটে বেড়াতে দেখা গেল। অবশেষে দেখা মিলল। উর্বশীই তো।

কুরুক্ষেত্রের অন্তোজ্ঞ সরোবর। সেখানেই রাজা দেখলেন উর্বশীকে, সঙ্গে চারজন অপ্সরা।

মণিহারা ফণি, উর্বশীহারা পুরূরবা। রাজা বললেন ঃ কি নির্দয় কি নির্মম তুমি! এসো, আবার আমার হও।

উর্বশী বললেন ঃ বিবেক হারিও না, বৃথা চেষ্টা কেন করছ? এখন তোমার পুত্র আমার গর্ভে। এক বছর পর এসো, তোমার এক পুত্র হবে, তখন না হয় একরাত্রির জন্য তোমার সঙ্গেই থাকব।

রাজা খুশি হলেন। ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

উর্বশী অন্য অপ্সরাদের বললেন ঃ ইনিই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা, ভালবেসে এঁর সঙ্গেই এতকাল ছিলাম।

অপ্সরারা বলল ঃ ইস্ কি চমৎকারই না দেখতে! আমাদেরও ইচ্ছে যায়, মন বলে থাকি ওঁর সাথে।

এক বছর পেরুল। রাজা এলেন। দেখা হল উর্বশীর সঙ্গে। উর্বশী রাজার হাতে পুত্র আয়ুকে তুলে দিলেন। আগের কথা রাখলেন। রাত কাটল। উর্বশী পাঁচটি পুত্র দান করবেন বলে কথা দিলেন। রাজাকে বললেন ঃ গন্ধর্বরা আমাকে খুশি করতে চায়, তাই বর দিতে চাইছে তোমাকে। কি চাই বল।

রাজা বললেন ঃ শত্রুরা পরাজিত, ইন্দ্রিয়ের শক্তি বজায় আছে পুরো, বরং দিন দিন বাড়ছে, অথচ মাত্রা ছাড়ায় নি, সৈন্যসামন্ত অঢেল, রাজকোষ পরিপূর্ণ। কিছুরই অভাব নেই। আছে এক অভাব, সে অভাব উর্বশীর। তাই উর্বশীর সঙ্গ চাই পেতে, দিন কাটাতে চাই উর্বশীরই সাহচর্যে।

গন্ধর্বরা রাজাকে এক অগ্নিস্থালী দিলেন। বললেন ঃ বেদের নিয়ম পালন করে উর্বশীর সঙ্গ চেয়ে তিনভাগ করে রোজ যজন করবেন এই অগ্নির। তাহলেই চাওয়া আপনার পাওয়া হবে।

অগ্নিস্থালী নিয়ে রাজা পুরূরবা নিজের রাজধানীর পথে পা বাড়ালেন। বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে নিজেকে বোকা ঠাউরে বসলেন রাজা। ভাবলেন ঃ নিরেট বোকা আমি। অগ্নিস্থালী আনলাম, অথচ উর্বশীকে আনা হল না।

অতএব বনের মধ্যেই পরিত্যক্ত হল সেই অগ্নিস্থালী। রাজধানীতে রাত্রি। রাজার চোখে ঘুম নেই। ভাবতে থাকলেন ঃ উর্বশীর সঙ্গ পাবার জন্য গন্ধর্বরা অগ্নিস্থালী দিল, আর আমি কিনা বনের মধ্যে ফেলে এলাম সেটি!

বনে চললেন রাজা। ফেলে আসা ধন খুঁজে-পেতে নিয়ে আসবেন তিনি। কিন্তু পেলেন না। শমীগর্ভে অশ্বত্থ গাছ দেখে ভাবলেন ঃ এখানেই ফেলেছিলাম, সেই স্থালীই এই অশ্বত্থ গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একেই নিয়ে যাই রাজধানীতে। এই অশ্বত্থকেই করব যজ্ঞের সমিধ। আর সেই আগুনকে ভজব

ভালভাবে।

অশ্বত্থ কেটে যজ্ঞের কাঠ তৈরি হল। আঙুলের মাপে কেটে গায়ত্রী মন্ত্র পড়লেন রাজা। যত অক্ষর এই মন্ত্রে ততগুলো আঙুলমাপের কাঠ উৎপন্ন হল। কাঠে কাঠে ঘষে তিনরকম আগুন জ্বাললেন পুরূরবা। বেদের নিয়ম মেনে হোম হল। প্রার্থনা করলেন উর্বশীর সঙ্গ। এইভাবে বহু রকমের যজন করলেন পুরূরবা। আর তারই পুণ্যে গতি হল তাঁর গন্ধর্বলোকে, যেখানে মিলল উর্বশীর নিত্যসঙ্গ॥

৩০. চরুবিভ্রাট

কুশাশ্ব চাইলেন ইন্দ্রের মত একটি পুত্র। কিন্তু সাধ করলেই সব মেলে না। তপস্যা চাই। অতএব কুশাশ্ব শুরু করলেন ঘোর তপস্যা। রকমসকম দেখে ইন্দ্র চিন্তিত হলেন। অন্য কেউ তাঁরই মত পরাক্রান্ত হয়ে উঠবে এ তিনি সইবেন না। ইন্দ্রের ভাবনা ধরে গেল। শেষে নিজেই জন্ম নিলেন কুশাশ্বের পুত্র হয়ে। এই পুত্রই গাধি। সত্যবতী এই গাধির কন্যা।

একদিন ঋচীক দেখলেন সত্যবতীকে। পছন্দ হল। গাধির কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁর কন্যাটিকে। ঋচীক বৃদ্ধ ও ক্রোধী। গাধি মত করলেন না। কন্যার মূল্য হিসেবে তাই চেয়ে বসলেন এক হাজার ঘোড়া। যেমন-তেমন ঘোড়া নয়—কানগুলো হবে কালো, শরীর হবে সাদা আর ছুটবে বায়ুর বেগে।

ঋষি ঋচীক। তিনিও দমবার পাত্র নন। চলে গেলেন বরুণদেবের কাছে। নিয়ে এলেন এক হাজার ঘোড়া। গাধি যেমনটি চেয়েছিলেন, ঠিক তেমনটি। ঋচীক গাধিকে ঘোড়াগুলো উপহার দিলেন। বিনিময়ে পেলেন সত্যবতীকে।

সত্যবতীর সন্তান চাই। ঋচীক চরু বানালেন। সত্যবতীর ইচ্ছে তাঁর মায়েরও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এক পুত্র হয়। নানাভাবে ঋচীককে তিনি খুশি করলেন। জানালেন তাঁর ইচ্ছের কথা। ঋচীক প্রস্তুত করলেন আর এক চরু। সত্যবতীকে বললেন: এই চরু তোমার, আর এইটি তোমার মায়ের।

ঋচীক বনে গেলেন। সত্যবতীর মা বললেন: নিজের ছেলেটি খুব ভাল হোক এটা সকলেই চায়। বৌয়ের ভাই—সে যেমন তেমন একটা হলেই হল। কাজেই তোমার চরুটা যে ভাল তাতে আমার সন্দেহ নেই। আমার কিন্তু তোমারটাই চাই।

সত্যবতীর মা আরো বললেন: আমার ছেলেকে পৃথিবী পালন করতে হবে। বলবীর্য দিয়ে ব্রাহ্মণের কোন্ দরকারটি মিটবে?

এসব শুনে সত্যবতী নিজের চরুটি মাকে দিয়ে দিলেন, আর মায়েরটি

খেলেন নিজে।

ঋচীক বন থেকে ফিরে এলেন। সত্যবতীকে দেখেই সব বুঝলেন। বললেন এ কি অকাজ করে বসে আছ! মহাপাপ করেছ যে। এ কাজ তো তোমার সাজে না। তোমার শরীর যেরকম রৌদ্র দেখাচ্ছে তাতে মনে হয় নিশ্চয়ই তুমি তোমার মায়ের চরুটি খেয়ে বসে আছ। ও চরুতে যে অসীম বীর্যের সমাবেশ করেছিলাম, আর তোমারটিতে ছিল শান্তি, জ্ঞান, তিতিক্ষা। অথচ উল্টো ঘটিয়ে বসলে। তোমার পুত্র হাতে ধরবে অস্ত্র, মারণ কাজে হবে তার নিষ্ঠা। তোমার ভাই হবে শান্তিকামী ব্রাহ্মণ।

সত্যবতী ঋচীকের পা জড়িয়ে ধরে বললেনঃ জেনে করিনি। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার পুত্র যেন অমনটি না হয়, বরং পৌত্র হোক অমনি।

ঋচীক বললেনঃ আচ্ছা তাইই হবে। এরপর সত্যবতী লাভ করলেন জমদগ্নিকে। আর তাঁর মাতা লাভ করলেন বিশ্বামিত্রকে।

পরে সত্যবতী হয়ে গেলেন কৌশিকী নদী। জমদগ্নি রেণুরাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করলেন। জন্ম হল নারায়ণের অংশভূত সেই পরশুরামের যিনি সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করেছিলেন।।

৩১. রজি ও ইন্দ্র

রাজার নাম রজি। পাঁচশো তাঁর পুত্র। প্রচণ্ড পরাক্রম তাদের। দেবে ও দানবে সমর উপস্থিত। দেবতারা চান দানবদের নিধন করতে, দানবরা চায় দেবতাদের বধ করতে। উভয় পক্ষই ব্রহ্মার কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন পক্ষের জয় হবে?

ব্রহ্মা বললেনঃ রজি যাদের পক্ষে অস্ত্র ধরবেন জয় হবে তাদেরই।

দৈত্যরা রজির দরজায় এল। সাহায্য চাই। রজি বললেনঃ যদি আমাকে ইন্দ্রত্বে বরণ করা হয় তাহলেই সাহায্য করতে পারি।

দৈত্যরা বললঃ এক রকম বলে অন্যরকম আমরা করি না। আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ, তাঁর জন্যই আমাদের এই আয়োজন। আপনার কথা আমরা রাখতে পারব না।

অতএব দৈত্যরা চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেলেন দেবতারা। তাঁদেরও সেই একই আবেদন। রজিরও এক কথাঃ ইন্দ্রত্ব দিতে হবে।

দেবতারা কথা দিলেনঃ আপনিই আমাদের ইন্দ্র হবেন।

রজি দেবতাদের সহায় হয়ে যুদ্ধ করলেন। তাঁর মহা ভয়ঙ্কর সব অস্ত্রে দানবসৈন্য বিনষ্ট হল। দেবতাদের জয় হল।

ইন্দ্র প্রণত হলেন। মাথা রাখলেন রজির পদতলে। বললেন ঃ ভয় থেকে রক্ষা করেছেন, তাই আপনি আমাদের পিতা। আমি ত্রিলোকের ইন্দ্র, সেই আমি আপনার পুত্র, অতএব লোকসমূহের মধ্যে আপনিই সর্বোত্তম।

রজি হেসে বললেন ঃ শত্রুও যদি চাটুবাক্যে প্রণতি জানায় তাহলেও তাকে উপেক্ষা করা যায় না। আপনজন হলে তো কথাই নেই।

রজি খুশি হয়ে ইন্দ্রত্বের দাবী ছেড়ে দিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। যিনি ইন্দ্র ছিলেন তিনিই রয়ে গেলেন।

রজির মৃত্যু হল। নারদ এসে রজির পুত্রদের পরামর্শ দিলেন, প্রেরণা দিলেন। বললেন ঃ এক হিসেবে ইন্দ্র তোমাদের ভাই।

রজির পুত্ররা ইন্দ্রের কাছে দাবী জানালেন ঃ আমরা তোমার ভাই। আমরাও রাজ্যের অংশ চাই।

ইন্দ্র নারাজ হলেন। ফলে যুদ্ধ হল। কিন্তু রজির পুত্ররাই ছিলেন বেশি পরাক্রান্ত। ইন্দ্র পরাভূত ও পদচ্যুত হলেন।

বহুকাল অতীত হল। ইন্দ্র আর যজ্ঞভাগ পান না। একদিন নিরিবিলিতে বৃহস্পতিকে পেয়ে বললেন ঃ বদরীফল পরিমাণ সামান্য একটু ঘি দিয়ে কি আমাকে তৃপ্ত করতে পারেন ?

ইন্দ্রের এই বিষণ্ণ প্রার্থনায় বৃহস্পতি বললেন ঃ আগে চাইলে কি পেতে না ? তোমার জন্য করতে কোন্ কাজে আমার আপত্তি ?

বৃহস্পতির কাজ বাড়ল। রজিপুত্রদের বুদ্ধির বিকার ঘটাতে হবে, জড়াতে হবে মোহজালে। চলল নানা অভিচার-ক্রিয়া। ইন্দ্রের তেজ বাড়াতে হবে, চলল হোম।

রজিপুত্রদের মোহে পেয়ে বসল। ব্রহ্মে দ্বেষ দেখা দিল, ধর্ম ছাড়লেন, বেদ আর মানতে চাইলেন না।

এদিকে বৃহস্পতির কল্যাণে তেজ বেড়েছে ইন্দ্রের। রজিপুত্ররা ধর্মভ্রষ্ট, অতএব দুর্বল। তাই সহজেই নিহত হলেন ইন্দ্রের হাতে। ইন্দ্র স্বর্গ দখল করলেন ॥

৩২. যযাতির সুমতি

যযাতি শুক্রের জামাতা। শুক্র শাপ দিয়েছিলেন। অকালে জরা এল যযাতির। শুক্র অবশ্য প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই উপায়ও একটা হয়েছিল।

শুক্রের কথামত যযাতি তাঁর জরা সংক্রমিত করার জন্য বড় ছেলে যদুকে বললেন ঃ তোমার মাতামহের শাপ, তাই আমার এই জরা। তাঁর অনুগ্রহ

পেয়েছি, যদি গ্রহণ কর তাহলে হাজার বছরের জন্য এ জরা তোমাতে নামিয়ে দিতে পারি। ভোগে তৃপ্ত হতে পারিনি, ইচ্ছে আরো ভোগ করি। তুমি রাজি হও।

কিন্তু সম্মত হলেন না যদু। যযাতি শাপ দিলেন ঃ তোমার বংশে কেউই রাজার যোগ্য হবে না।

একে একে দ্রুহ্যু, তুর্বসু ও অনুর কাছে গেলেন রাজা। আবেদন জানালেন। রাজা গ্রহণ করবেন তাঁদের যৌবন, আর তাঁদের শরীরে সঞ্চারিত করবেন নিজের জরা।

রাজি হল না কেউ। সবার বরাতেই জুটল পিতার অভিশাপ।

শেষমেষ ছোট ছেলে পুরুর কাছে এলেন যযাতি। তাঁর ইচ্ছের কথা বললেন।

পুরু বললেন ঃ এ তো আপনার মহান অনুগ্রহ।

পুরু রাজার জরা লাভ করলেন, আর রাজা পুরুর যৌবন নিয়ে ঝলমল করে উঠলেন।

যযাতি নতুন করে যৌবন পেয়েছেন। বহু বাসনাই তাঁর রয়ে গেছে অচরিতার্থ। এবার মিলেছে সুযোগ। বিষয়ভোগ প্রজাপালন দুইই যযাতি করতে থাকলেন। বিশ্বাচীর সঙ্গে চলল ভোগের মহোৎসব। কামনার অন্ত দেখবেন, প্রতিদিনই এ ইচ্ছে তাঁর মনে থাকে, প্রতিদিনই ওতেই তন্ময় হয়ে যান যযাতি।

রাজা যযাতি উপভোগ করেন, যত করেন ইচ্ছে বাড়ে তত। দিন যেতে থাকল, সব কিছুই আরো বেশি, অনেক-বেশি করে তাঁকে আঁকড়ে ধরতে থাকল। যা রমণীয় দিনে দিনে তা বরণীয়, আরো বরণীয়, আরো আরো রমণীয় মনে হতে থাকল।

অবশেষে একদিন যযাতি ভাবলেন, বুঝলেন এবং বললেনও ঃ ভোগের বাসনা ভোগ করে মেটানো যায় না, বরং বাড়ে। এ যেন ঘি দিয়ে আগুন নেবানোর চেষ্টা। কোন বিষয়ের ভোগেই তৃপ্তি মানে না মানুষ, মানতে চায় না, মানা সম্ভবও নয়। তাই ভোগের নয়, ত্যাগের পথই শ্রেয়। বাসনা ত্যাগেই শান্তি। সবেতেই পাপ একথা না ভেবে, সবই এক ভাবলে সব কিছুতেই সুখের ছোঁয়া মিলতে পারে। যা মন্দমতি মানুষ ছাড়তে পারে না, শরীর ক্ষয় হয়ে গেলেও যা ক্ষয় মানে না সেই তৃষ্ণার পাটটি মন থেকে চুকিয়ে ফেলতে পারলেই সুখের সাগরে ডুবে থাকা সম্ভব। মানুষের শরীরে জরা আসে, চুল পাকে পড়ে, দাঁতও ক্ষয় হয় নড়বড় করে পড়েও যায় এক সময়। কিন্তু ধনের আশা, জীবনের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই কোথাও। নিত্যনতুন রঙ, রঙের পর রঙের ছোপ চাপে তার উপর। হাজার বছর পুরে গেল, সব সময়ে ডুবে আছি বিষয়ে,

তৃষ্ণা তবু বেড়েই চলেছে।

যযাতি ঠিক করলেন, আর নয়। ঢের হয়েছে। সব কিছু ছেড়েছুড়ে এবার মন সঁপে দেবেন ব্রহ্মে। দ্বিধা থাকবে না, দ্বন্দ্বও না, মায়া মমতাও নয়—নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তে পরম প্রসন্ন মনে চরে ফিরবেন বনের হরিণদের সঙ্গে।

পুরুকে যৌবন ফিরিয়ে দিলেন যযাতি। রাজ্য বেঁটে দিলেন ছেলেদের মধ্যে। পুরুকে বসালেন পৃথিবীপতির আসনে।

অতঃপর জরাগ্রস্ত যযাতির বনগমন ও তপস্যা ।।

৩৩. কার্তবীর্যার্জুন

কৃতবীর্যের পুত্র। নাম তাই কার্তবীর্য। অর্জুনও তাঁর আর এক নাম। সহস্র বাহু ইনি। সপ্তদ্বীপের অধিপতিও।

ভগবানের অংশে অত্রিকুলে জন্ম দত্তাত্রেয়ের। অর্জুন আরাধনা করেছিলেন এঁর। বর পেয়েছিলেন বেশ কটি। সেই বরেই অর্জুন সহস্রবাহু। অধর্মের নাশ করেছিলেন, ধর্মবলে পৃথিবী জয় করেছিলেন, প্রতিপালনও করলেন ধর্মে মতি রেখে। শত্রু তাঁকে হারাতে পারেনি কোনদিন, মরণ বরণ করেছিলেন সেই তাঁরই হাতে ভুবনজোড়া যাঁর খ্যাতি। দত্তাত্রেয় প্রসন্ন হয়েছিলেন। অর্জুন বর চেয়েছিলেন, তিনি দিয়েছিলেন। সবই সম্ভব হয়েছিল তাই।

সপ্তদ্বীপবতী বসুমতীকে পালন করেছিলেন অর্জুন। ত্রুটি বা কোন ফাঁক ছিল না এ পালনে। সফল শাসক অর্জুন।

একটা নয়, দুটো নয়, দশ হাজার যজ্ঞ করেছিলেন তিনি। বলা হয়ঃ বহুতর যজ্ঞ করেছিলেন অর্জুন, দান করেছিলেন প্রচুর। অতুলনীয় তিনি। এমন কোন রাজা ছিলেন না যিনি দাঁড়াতে পারেন তাঁর পাশে। শুধু কি তাই? অনন্ত তপস্যাও ছিল তাঁর, বিনয়েও ছিলেন বিগলিত। কেই বা পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় মাথায় হতে পারেন অর্জুনের? অনন্য তিনি এমনিতে নন। জিনিস নষ্ট হয় কোন্ না দেশে? অর্জুনের রাজ্যে হত না তাও।

রাজা অর্জুন রাজত্ব করলেন পঁচাশি হাজার বছর। একটানা এতগুলো বছর, কিন্তু স্বাস্থ্য রইল অটুট, শ্রী রইল, বল রইল, পরাক্রমেও ভাঁটা এল না কোনদিন।

অর্জুন একদিন স্নানে নেমেছেন নর্মদায়। নর্মদার জল চঞ্চল হল তাঁর খেলায়। মদ খেয়েছিলেন প্রচুর। মত্ত তিনি। মত্ত মদে, মত্ত খেলায়। ঠিক এমনি সময়ে গর্বেমত্ত রাবণ আক্রমণ করলেন অর্জুনের রাজ্য। রাবণ মত্ত—

দেবতাদের হারিয়েছেন, দৈত্যেরা বশীভূত, গন্ধর্বরাজারা পদানত। অতএব রাবণ দম্ভে অন্ধ।

কিন্তু অর্জুন, দত্তাত্রেয়ের বরে বলীয়ান সহস্রবাহু অর্জুন রাবণকে প্রতিহত করলেন, বন্দী করলেন। ব্যাধ বাঁধে পশুকে, অর্জুন বাঁধলেন রাবণকে। নগরের এক নির্জন প্রান্তে ঠাঁই হল বন্দী রাবণের।

পরশুরামের জন্ম নারায়ণের অংশে। তাঁরই হাতে মৃত্যু ঘটল এই মহাবীর অর্জুনের ।।

৩৪. জ্যামঘের শ্রেষ্ঠত্ব

রাজা জ্যামঘ শ্রেষ্ঠ। যাঁরা জন্মেছেন এ যাবৎ তাঁদের মধ্যে, যাঁরা জন্মাবেন তাঁদের মধ্যেও।

শ্রেষ্ঠ তিনি ঠিকই। তবে সব দিক দিয়ে নয়। একটি মাত্র দিক থেকে। পত্নীর বশীভূত এমন স্বামীটি মিলবে না কোথাও—কেউ কোনদিন ছিলেন না, কেউ হবেনও না কোনকালে।

জ্যামঘের ভাগ্যবতী পত্নী শৈব্যা। ছেলেপুলে হল না তাঁর। হবার আশাও ছিল না কোন। নিঃসন্তানই রয়ে গেলেন জ্যামঘ, ধরে নেওয়া হল হয়ে থাকবেনও। কারণ আর একটা ভার্যা যে গ্রহণ করবেন এমন সাহস তাঁর ছিল না। দুর্ধর্ষ বীর জ্যামঘ। কিন্তু নিদারুণ ভয় তাঁর শৈব্যাকে।

যুদ্ধে গেছেন জ্যামঘ। প্রচণ্ড যুদ্ধ। হাতিঘোড়ার দারুণ দাপাদাপি, পেষাপেষি, ডাকাডাকি। মুখরিত যুদ্ধক্ষেত্র। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

এক এক করে বিপক্ষ দলের সবাই ঘায়েল হল। জ্যামঘের দাপটে যে যেদিকে পারল পালিয়ে পরিত্রাণ পেল। নগরের লোক দিকবিদিক বনবাদাড়ের হিসেব করল না, বউ ছেলেমেয়ে টাকাকড়ির কথা ভাবল না—যে যেদিকে পারল ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে ছুটল।

সবাই পলায়িত। রাজা বিস্ময় মানলেন। দেখলেন এক রত্ন—রাজকন্যা। পালাতে পারেনি কোথাও। ভয়ে মুখে বাবা দাদার নাম, 'বাঁচাও বাঁচাও'—এই আর্ত প্রার্থনা। চোখদুটো বড়বড়, ভয়ে আরো আয়ত হয়েছে, ত্রাসে চঞ্চল তার কালো তারা। রাজকন্যা সুন্দরী। এই ভয়বিহ্বল মুহূর্তে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। জ্যামঘ দুচোখ ভরে দেখলেন। ভাল লাগল তাঁর। ভাবলেন: বন্ধ্যার স্বামী আমি। হয়ত ভগবানেরই অনুগ্রহ। সন্তান লাভের জন্য এই কন্যা হয়ত তিনিই উপহার দিয়েছেন। একে আমি বিবাহ করব। রথে তুলে নিই। পরে শৈব্যার আজ্ঞা নিয়ে চুকিয়ে ফেলা যাবে অনুষ্ঠানের পাট।

রাজা রাজকন্যাকে রথে তুলে নিলেন। তাঁর পাশেই তাকে বসালেন।

যুদ্ধ জিতেছেন রাজা জ্যামঘ। তিনি ফিরছেন নগরে। অতএব দেবী শৈব্যা এসেছেন নগরের দ্বারে। সঙ্গে অনেক আত্মীয় পরিজন, অমাত্য দাসদাসী। পৌরজনও এসেছেন ভিড় করে।

শৈব্যা রাজাকে দেখতে পেলেন। খুশি হতে পারলেন না। রাগে ফুলতে থাকলেন।

রাজার বামপাশে সুন্দরী রাজকন্যা। শৈব্যার ঠোঁট কাঁপল, ফুলল। রাজাকে বললেন ঃ আগেই জানি অত্যন্ত চপল তোমার মতি। কিন্তু কাকে বসিয়েছ ওখানে ?

রাণীর চোখেমুখে কালবৈশাখীর ছায়া। জ্যামঘ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। যা এল মুখে তাই ফেললেন বলে। ভাবনাচিন্তার ক্ষমতা তাঁর লোপ পেয়েছিল। ঢোক গিলে বললেন ঃ এ আমার পুত্রবধূ।

শৈব্যা বললেন ঃ আমার পুত্র হয়নি, অন্য পত্নীও নেই তোমার। তোমার পুত্রই বা এল কোত্থেকে, পুত্রবধূই বা আসে কি করে ?

রাজা বললেন ঃ ভবিষ্যতে তোমার যে পুত্র হবে একে তারই বধূ করে আনা হয়েছে।

শৈব্যার মুখে হাসির ঝিলিক খেলল। বললেন ঃ বেশ, তাই হবে।

সন্তান হবার বয়স বিগত হয়েছিল শৈব্যার। তবু তাঁর সন্তান হয়েছিল। গ্রহদের সুনজর তখন শৈব্যাতে, জ্যামঘেও। একদিন গ্রহরা যখন পরম প্রসন্ন এমন এক শুভ মুহূর্তে পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে আলাপ হল রাজা ও রাণীর মধ্যে। পুত্রবতী হলেন শৈব্যা। বিদর্ভ সেই পুত্রের নাম।

যে কন্যাকে বিবাহ করবেন জ্যামঘ সেই কন্যাকেই করতে হল বিদর্ভের বধূ।

তাই বলা হয় ঃ রাজা জ্যামঘ শ্রেষ্ঠ। যাঁরা জন্মেছেন এ যাবৎ তাঁদের মধ্যে যাঁরা জন্মাবেন তাঁদের মধ্যেও।

৩৫· স্যমন্তক মণি

পরম ভাগ্য সত্রাজিতের। সূর্যদেব সখা হয়েছিলেন তাঁর।

সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যের স্তব করছিলেন সত্রাজিৎ। তন্ময় তদ্গত সত্রাজিৎ। একান্ত করে সূর্যেই বাঁধা পড়েছিল তাঁর মন। তরঙ্গের ভঙ্গি ছিল না সে মনে, আবর্তের ঘূর্ণিও নয়। ভেসে ছিল একটি মাত্র নিটোল সোনালী বুদ্বুদ—সূর্যবুদ্বুদ।

সন্তুষ্ট হলেন সূর্য। এসে দাঁড়ালেন সত্রাজিতের সামনে। ছায়াছায়া এক মূর্তি, অথচ দীপ্ত।

সত্রাজিৎ বললেন ঃ আকাশে দেখেছি আপনাকে, কিন্তু সে তপ্ত বহ্নিপিণ্ড। সামনে একেবারে কাছটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন, অথচ অন্যতর কিছু তো দেখছি নে।

সত্রাজিতের কথা মন দিয়ে শুনলেন ভগবান সূর্য। গলায় ছিল তাঁর স্যমন্তক মণি। সেটি খুলে সরিয়ে রাখলেন একপাশে।

সূর্যকে দেখতে পেলেন সত্রাজিৎ। দুচোখ মেলে চোখভরে দেখলেন সূর্যকে। ঈষৎ পিঙ্গল তাঁর দুই চোখ, শরীরে তামাটে আভা। আকারে ছোটখাটটি, কিন্তু সব মিলিয়ে উজ্জ্বল ; দিব্য এক লাবণ্য।

বিনতি করলেন সত্রাজিৎ। সূর্য চাইলেন ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করতে। সত্রাজিৎ চাইলেন স্যমন্তক মণিটি। পেলেনও।

সত্রাজিতের গলায় স্যমন্তক মণি। সূর্যের দীপ্তি ছড়াল। জ্যোতির বান এল। চারিদিক আলোয় আলোময় হল। সত্রাজিৎ প্রবেশ করলেন দ্বারকায়। চলন্ত জ্যোতির এক পুঞ্জ। দ্বারকার লোকে ঠাওরাল সূর্য আসছেন। ইনিই ভগবান সূর্য।

পৃথিবীর ভার হরণ করতে ভগবান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন। দ্বারকার লোক এল তাঁর কাছে। প্রণতি জানিয়ে জানাল ঃ স্বয়ং ভগবান আপনি। সূর্যদেব আসছেন আপনাকে দেখতে।

শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন। হাসলেন তাই। বললেন ঃ আদিত্য নন, উনি সত্রাজিৎ। স্যমন্তক মণি দিয়েছেন আদিত্য। সেটি ধারণ করেছেন সত্রাজিৎ। রচিত হয়েছে আলোর মণ্ডল, আদিত্য বলে ভুল হচ্ছে। চঞ্চল হবার মত কিছু নয়। তোমরা দেখ, শঙ্কা কর না কোন।

কৃষ্ণের কথায় নিজের নিজের বাড়ি ফিরল সবাই। সত্রাজিৎও যত্ন করে মণিটি ঘরে তুলে রাখলেন। দিব্যমণি। স্বর্ণস্রাবী মণি। রোজ আট ভার স্বর্ণ পেতে থাকলেন সত্রাজিৎ। অনাবৃষ্টি বন্ধ হল দেশে। ভয় গেল হিংস্র জন্তুর। আগুনের ভয়, চোরের ভয়ও দূর হল একেবারে। স্যমন্তক মণির এমনই গুণ।

কৃষ্ণ ভাবলেন ঃ এ মণি মানায় রাজা উগ্রসেনকে। মণিটির উপর তাই নজর পড়ল তাঁর। গোত্রভেদের ভয় ছিল মনে, হরণ করলেন না তাই।

সত্রাজিৎ বুঝলেন, কৃষ্ণের চোখ পড়েছে মণিতে। ভয় পেলেন, যদি চেয়ে বসেন কৃষ্ণ। তাই ভাই প্রসেনকে দিলেন।

স্যমন্তক মণি স্বর্ণস্রাবী ঠিকই। কিন্তু ধারণ করতে হত শুচি হয়ে। অশুচি অবস্থায় যে অঙ্গে ধরত বিপন্ন হত তার প্রাণ।

স্যমন্তক মণি পেয়েছেন প্রসেন। গলায় পরলেন সেটি। ঘোড়ায় চড়ে

বেরুলেন মৃগয়ায়। অশুচি ছিলেন প্রসেন। সিংহের হাতে মারা পড়লেন তাই। ঘোড়া গেল, প্রসেনও শেষ। সিংহ মণিটি নিয়ে যাবে যাবে এমন সময় ভল্লুকদের অধিপতি জাম্ববান দেখল সিংহকে। বধ করল তাকে। জাম্ববান মণিটি পেল, নিয়ে এসে খেলতে দিল সুকুমারকে, তার ছেলেকে।

এদিকে প্রসেন ফেরেন না, ফিরলেনও না। কানাকানি হল যদুকুলে। কৃষ্ণকেই সন্দেহ করল সবাই। কৃষ্ণেরই লোভ ছিল মণিটিতে, অথচ পান নি। প্রসেনকে উনিই বধ করেছেন। নির্ঘাৎ এ তাঁরই কাজ।

কৃষ্ণের কানে গেল এ অপবাদ। খুরের দাগ মাটিতে। প্রসেনেরই ঘোড়ার খুর। যদুসৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ বেরুলেন প্রসেনের সন্ধানে। খুরের চিহ্ন দেখে দেখে কৃষ্ণ এসে পৌঁছলেন সেই বনে। দেখলেন, প্রসেন নিহত, তাঁর ঘোড়াটিও। আশপাশের মাটিতে সিংহের পায়ের দাগ। সবাই দেখল, বিশ্বাসও করল। কৃষ্ণ অব্যাহতি পেলেন অপবাদ থেকে। কিন্তু থামলেন না ওখানেই। এগুলেন সিংহের পায়ের ছাপ দেখে দেখে। কিছুদূর এগুতেই নজরে পড়ল মরে পড়ে আছে সিংহটি। লক্ষ্য করে বুঝলেন এ কাজ ভল্লুকের। পায়ের ছাপ আবার তাঁকে সাহায্য করল। একটি পাহাড়ের ধারে এসে পৌঁছুলেন। সৈন্য সমাবেশ করলেন সেখানে। তারপর ভল্লুকের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ঢুকে পড়লেন একটি গুহায়। ঢুকবার পথেই কৃষ্ণ শুনলেন ঃ সিংহ প্রসেনকে বধ করেছে, জাম্ববানও সিংহকে হনন করেছেন। কেঁদো না, স্যমন্তক মণি তোমারই।

ধাই লোভ দেখাচ্ছে ফুটফুটে একটি ছেলেকে। শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন। আরো এগুলেন। দেখলেন ধাইয়ের হাত জ্বলছে। স্যমন্তক মণি তার হাতে।

কৃষ্ণের চোখ স্যমন্তকে। চাহনিতে লোভ। ধাইয়ের নজরে অপরিচিত পুরুষের কুনজর ধরা পড়ল। চিৎকার করে উঠল সে ঃ বাঁচাও ; বাঁচাও।

জাম্ববান ধারে কাছেই ছিল। ধাইয়ের আর্তনাদ কানে যেতেই ছুটে এল। রাগে গরগর করছে জাম্ববান। কৃষ্ণকে দেখল সামনে। বেধে গেল দুজনে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। একুশ দিন পেরিয়ে গেল, যুদ্ধের শেষ হল না।

যদু সৈন্যেরা কৃষ্ণের অপেক্ষায় বসে বসে হয়রান হল। কৃষ্ণ আর বেরোন না। সাত-আটদিন আশায় আশায় বসে শ্রান্ত হল তারা। হাই তুলল, বড় বড় নিশ্বাস ফেলল। সাব্যস্ত করল কৃষ্ণ নির্ঘাৎ নিহত হয়েছেন গুহামধ্যে। তা না হলে শত্রুজয়ে এতদিন তাঁর লাগবার কথা নয়।

সৈন্যরা ফিরে এল দ্বারকায়। বলল ঃ কৃষ্ণ নিহত।

আপনার জন যারা ছিল কৃষ্ণের, তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। শ্রাদ্ধ করল তারা। শ্রদ্ধায় ভরা তাদের মন, কৃষ্ণের উদ্দেশে তারা নিবেদন করল অন্নজল।

অনেক দিন ধরে যুদ্ধ করে করে কৃষ্ণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। খাবার-দাবারের অবকাশ ছিল না। জাম্ববানেরও সেই দশা। কিন্তু শ্রাদ্ধের অন্নজলে কৃষ্ণ বল ফিরে পেলেন। তাই সহজেই হারিয়ে দিলেন জাম্ববানকে।

জাম্ববান প্রণাম জানাল কৃষ্ণকে। বলল ঃ আপনি স্বয়ং ভগবান, অজেয়। অসুর, সুর, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, সবাই মিলেও ভগবানকে জয় করতে পারে না। আমরা তো কোন ছার। পৃথিবীর সামান্য মানুষ আমরা। বলবীর্যই বা তেমন কই আমাদের। আপনি যে আমাদের প্রভু, জগতের গতি, নারায়ণের অংশ এ বিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না আর মনে।

কৃষ্ণ বললেন, বিষ্ণুর অবতার তিনি। পৃথিবীর ভার হরণের জন্য তাঁর জন্ম।

কৃষ্ণ জাম্ববানের কথায় প্রীত হয়েছিলেন। তার অঙ্গ স্পর্শ করলেন। সমুদয় ক্ষত নিরাময় হল জাম্ববানের, বেদনারও শান্তি হল।

জাম্ববান প্রণতি জানাতে থাকল। কন্যা জাম্ববতীকে পত্নীরূপে উপহার দিল কৃষ্ণকে। স্যমন্তক মণিটিও নিবেদিত হল কৃষ্ণের পায়ে। একান্ত প্রণত। মণিরত্ন নেওয়া সংগত নয়। তবু কৃষ্ণ নিলেন। অপবাদের কালি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে স্যমন্তক তাঁকে নিতেই হল।

কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরলেন। সঙ্গে জাম্ববতী। দ্বারকায় হর্ষের তরঙ্গ উঠতে থাকল। দ্বারকার মানুষ কৃষ্ণছাড়া হয়ে বৃদ্ধ বনেছিল, কৃষ্ণ পেয়ে যুবক হল। ভাগ্যি মানল সবাই। কৃষ্ণ বললেন সব বৃত্তান্ত। সত্রাজিতের হাতে তুলে দিলেন স্যমন্তক মণি। অপবাদ ঘুচল।

সত্রাজিৎ বুঝলেন, কৃষ্ণের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়েছেন। ভয় পেলেন মনে মনে। যে করেই হোক কৃষ্ণকে প্রসন্ন করতে চাইলেন। কন্যা দান করে নিশ্চিত হলেন। কৃষ্ণ পেলেন সত্যভামাকে।

সত্যভামার প্রতি অনেকেরই আকর্ষণ ছিল। অক্রূর, কৃতবর্মা, শতধন্বা সবাই চেয়েছিলেন সত্যভামাকে। কিন্তু পেলেন না। ভাবলেন, সত্রাজিৎ অবজ্ঞা করেছে তাঁদের। শত্রু হল শত্রুতা।

অক্রূর, কৃতবর্মা উত্তেজিত করলেন শতধন্বাকে ঃ সত্যভামাকে আমরা সবাই চেয়েছিলাম। কিন্তু আমলই দিল না আমাদের। আমাদের ডিঙিয়ে কৃষ্ণকে দিল মেয়ে। এরপরও হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন আপনি? এরপরও কি করে যে সহ্য করছেন সত্রাজিৎকে? এখুনি ওকে বধ করে স্যমন্তক মণিটি কেড়ে নিলে উচিত কাজ হয় আপনার। কৃষ্ণ পিছনে লাগলে আমরা আছি কি করতে?

শতধন্বা বললেন ঃ ঠিক আছে। দেখছি।

কৃষ্ণ গেছেন বারণাবতে। জতুগৃহ দাহ হয়েছে। পাণ্ডবদের প্রকৃত বৃত্তান্ত

দুর্যোধন জেনেছেন। তথাপি তিনি উদাসীন। কুলের মান দুর্যোধনের হাতে। মান রাখছেন না তিনি। সাধারণ সৌজন্যও হারিয়ে বসে আছেন। কৃষ্ণ গেছেন বারণাবতে। উদ্দেশ্য দুর্যোধনকে ঠিক পথটি দেখিয়ে দেওয়া।

কৃষ্ণ দূরে। সুযোগ নিলেন শতধন্বা। সত্রাজিৎ ঘুমে অচেতন। শতধন্বা বধ করলেন সেই অবস্থাতেই। স্যমন্তক মণি হাতিয়ে নিতেও ভুল হল না তাঁর।

পিতা হত। স্যমন্তক মণি অপহৃত। শোক যত না বাজল বুকে, ক্রোধ ঝড় তুলল তার অনেক বেশি বড় করে। সত্যভামা উত্তেজিত হলেন, ক্রোধে আত্মহারা হলেন। রথ হাঁকিয়ে বারণাবতে এসে হাজির হলেন তিনি। কৃষ্ণকে বললেন ঃ আমাকে আপনার হাতে দেওয়ায় শতধন্বা অন্ধ হয়েছিলেন রাগে। পিতাকে হত্যা করেছে তাই, স্যমন্তক মণিও অপহরণ করেছে। এত বড় অপমান মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়াই যদি ঠিক মনে করেন তবে তাই করুন।

মনে মনে কিন্তু তুষ্ট হলেন কৃষ্ণ। ভাব দেখালেন অন্য। চোখ বড় বড় হল, বাগে লাল হল। বললেন ঃ এ অপমান তো আমাকেই। কখনোই সহ্য করব না। কিন্তু বড় উঁচুডালের পাখি, গাছ উপড়ে না ফেললে শেষ করা যাবে না। দুঃখের কথা আর কেন বল সত্যভামা, ব'ল না। এর একটা বিহিত আমি করবই।

কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরলেন। চুপিচুপি বলদেবকে বললেন ঃ সিংহের হাতে প্রসেন হত, সম্প্রতি সত্রাজিৎও শতধন্বার হাতে শেষ হয়েছেন। আপাতত স্যমন্তক মণির মালিক বলতে কেউ নেই। এ অবস্থায় স্যমন্তক আমাদের সম্পত্তি। অতএব উঠুন, শতধন্বাকে নিধন করতে হবে। আয়োজন করুন। দেরি নয় আর।

কৃষ্ণের কথায় বলদেব সম্মত হলেন। উদ্যোগী হলেন কৃষ্ণ ও বলরাম।

শতধন্বা জানতে পারলেন। বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসছে। মনে পড়ল কৃতবর্মার আশ্বাস, অক্রূরের প্রতিশ্রুতি।

শতধন্বা কৃতবর্মার কাছে গেলেন। সাহায্য চাই। কৃষ্ণ আসছেন যুদ্ধ করতে। কৃতবর্মা বললেন ঃ হেন সাধ্য তাঁর নেই যে যুদ্ধ করেন কৃষ্ণ ও বলরামের বিরুদ্ধে।

শতধন্বা অক্রূরের কাছে গেলেন। সেই এক প্রার্থনা। অক্রূর বললেন ঃ আমি তো কোন্ ছার! জগতে এমন কে আছে যে এঁটে উঠবে ওঁদের সঙ্গে? যাঁর পায়ের ঘায়ে তিন লোক কাঁপে, যাঁর দাপে মহামহা অসুরও নিপাত গেল, যাঁর চক্র কেউ ঠেকাতে পারে নি আজ পর্যন্ত, সেই চক্রীর সঙ্গে যুদ্ধ করব! এ কখনো হয়? একে কৃষ্ণে রক্ষা নেই, তায় বলদেব দোসর। মদে মুদিত চোখ। একবার তাকাবেন শুধু। শত্রু ঠাণ্ডা। বড় বড় হস্তী যিনি আকর্ষণ করেন

অপূর্ব কৌশলে, সেই হলধরের সঙ্গে করব যুদ্ধ! আপনি অন্য কারো কাছে যান।

শতধন্বা বললেনঃ তাহলে স্যমন্তক মণিটি অন্তত গচ্ছিত রাখুন।

ঃ রাখতে পারি, কিন্তু কাকপক্ষিটিও যেন জানতে না পায় এ মণির খোঁজ। মরণকালেও বলতে পারবেন না কাউকে।

সম্মত হলেন শতধন্বা। স্যমন্তক মণি নিলেন অক্রূর।

শতধন্বা পলায়ন করলেন। প্রচণ্ড বেগে এক বড়বা তাঁকে নিয়ে ছুটল। কৃষ্ণ ও বলদেবের রথ ছুটল শতধন্বার পিছন পিছন। শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক—এই চার অশ্বের ষোল খুরে ধুলো উড়ল।

বড়বা শত যোজন পথ চলতে পারে। তত পথ সে অতিক্রমও করল। আরো চলতে হল তাকে। কিন্তু পারল না। মিথিলার বনের ধারে প্রাণত্যাগ করল বড়বা। শতধন্বা পায়ে ছুটেই পালাতে থাকলেন। পথ ছেড়ে বিপথে নামলেন, আবার বিপথ থেকে পথে।

কৃষ্ণকেও রথ থেকে নামতে হল। বলদেবকে বললেনঃ আপনি রথেই থাকুন। অধমটাকে শেষ করেই ফিরে আসব। বড়বার মৃতদেহ দেখেছে ঘোড়াগুলো। ওধারে রথ নিয়ে যাওয়াটা ঠিকও হবে না।

বলদেব রথে রইলেন। কৃষ্ণ ছুটলেন। দুই ক্রোশ ছুটে শতধন্বাকে দেখতে পেলেন। চক্র ছুঁড়লেন। শতধন্বার মুণ্ড লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কাছে এলেন কৃষ্ণ। শতধন্বার কাপড়চোপড় হাতড়ে অনেক খুঁজেও স্যমন্তক মণির খোঁজ মিলল না।

বলদেবকে কৃষ্ণ বললেনঃ ছুটোছুটি সার। বৃথাই শতধন্বাকে মারা। আসল দ্রব্যই মিলল না।

বলদেব ভুল বুঝলেন। কৃষ্ণকে বিশ্বাস করলেন না। বললেনঃ ছিছি এত লোভ তোমার! আমার কাছে মিথ্যে কথা! নেহাৎ ছোটভাই, তাই ক্ষমা করছি তোমাকে। কিন্তু দূর হও আমার সামনে থেকে। যেখানে খুশি যাও। খুব শিক্ষা হয়েছে। ভাই বন্ধুবান্ধব কাউকে দরকার নেই আমার।

কৃষ্ণ বহু বোঝালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বিদেহপুরীতে প্রবেশ করলেন বলদেব। বিদেহের রাজা জনক বলদেবকে পরম সমাদর করলেন। বলদেব সেখানেই রয়ে গেলেন। দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধ শেখালেন এখানে থাকতেই।

কৃষ্ণ দ্বারকাতেই ফিরে এলেন। কৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ। তিন বছর পেরিয়ে গেল। সবাই জানল, বুঝল, কৃষ্ণ মিথ্যে বলেন নি বলদেবকে। বভ্রু, উগ্রসেন, ও আরো অনেকে বিদেহরাজ্যে এলেন। বোঝালেন, বিশ্বাস করালেন বলদেবকে। তিনি দ্বারকায় এলেন।

এদিকে ভাবনা ধরে গেছে অক্রূরের। সোনা ঢালে স্যমন্তক মণি। দিন দিন সোনা, থরে থরে জমছে, অনেক সোনা। কিন্তু কি করবেন এ দিয়ে। ঠিক করলেন, যাগযজ্ঞই একমাত্র রাস্তা।

যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে হনন করলে পাপ—ব্রহ্মহত্যার মহাপাপ। অক্রূর ভাবলেন যজ্ঞে দীক্ষিত তিনি। স্যমন্তক মণির জন্য কৃষ্ণ তাঁকে হত্যা করবেন না এ অবস্থায়।

অক্রূর দীক্ষার বর্ম আঁটলেন। বাষট্টি বছর ধরে যজ্ঞ চলল।

অক্রূরের কাছে স্যমন্তক। অক্রূর থাকেন দ্বারকায়। দুর্ভিক্ষ-মড়ক দূর হয়েছিল দ্বারকা থেকে। কিন্তু দ্বারকা থেকে তাঁকে পলায়ন করতে হল। ভোজরা ছিল অক্রূরের দলে। সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনষ্ট করল ওরা। ভোজরাও পালাল দ্বারকা থেকে। সঙ্গে অক্রূরও।

অক্রূর গেলেন, সঙ্গে স্যমন্তক মণিটিও। দ্বারকায় শুরু হল নানা উৎপাত। হিংস্র জন্তুর ভয় দেখা দিল। দ্বারকার লোকে ত্রস্ত। অনাবৃষ্টি, এল মড়ক। দ্বারকার শান্তি গেল।

কৃষ্ণ, বলদেব, উগ্রসেন—এমনি আরো অনেকে মিলিত হলেন। পরামর্শ হল, আলোচনা হল। কৃষ্ণ বললেনঃ একদিনেই এত উপদ্রব! কারণ কি? কিছু একটা আছেই আছে।

অন্ধক বৃদ্ধ মানুষ। তিনি বললেনঃ অক্রূরের বাবা শ্বফল্ক যেখানে থাকতেন, অনাবৃষ্টি মড়ক এ ধরনের বাজে উৎপাতও দূর হত সেখান থেকে। কাশীরাজের রাজ্যে একবার মারাত্মক অনাবৃষ্টি হল। কি করা? শ্বফল্ককে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে। শ্বফল্কও এলেন, সঙ্গে করেই যেন এনেছিলেন বৃষ্টিকে। বৃষ্টি এল। প্রচুর বৃষ্টি। এই সময় কাশীরাজের পত্নী ছিলেন গর্ভবতী। গর্ভে ছিল এক কন্যা। সময় হল, প্রসব হল না। বারো বছর কাটল। কিন্তু কন্যা রয়ে গেল গর্ভেই। ভূমিষ্ঠ হল না। কাশীরাজ সেই মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তুমি নিষ্ক্রান্ত হচ্ছ না কেন? মিছিমিছি মাকে কষ্ট দিচ্ছ। আর আমারও তো তোমাকে দেখবার ইচ্ছে হতে পারে।

গর্ভ থেকেই মেয়ে উত্তর করলঃ যদি রোজ ব্রাহ্মণদের প্রত্যেককে এক একটি গাভী দান করতে পারেন তাহলে তিন বছর পর আমি ভূমিষ্ঠ হব।

কাশীরাজ গাভী দান করতে থাকলেন। তিনবছর পেরুল। মেয়ের জন্ম হল। নাম হল গান্দিনী। শ্বফল্ক উপকার করেছিলেন কাশীরাজের। অর্ঘ্য হিসেবে গান্দিনীকে পেলেন। গান্দিনী সারাজীবন গাভী দান করে গেছেন। অক্রূরের মা এই গান্দিনী, বাবা শ্বফল্ক। এমন বাবা-মায়ের ছেলে যে সে চলে গেছে। দর্ভিক্ষ হবে, মড়ক দেখা দেবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। অক্রূরের দোষ দেখার দরকার নেই, যে করেই হোক তাকে নিয়ে এস।

কৃষ্ণ, বলদেব, উগ্রসেন সবাই আশ্বাস দিলেন। অক্রূরকে দ্বারকায় আনা হল।

স্যমন্তক মণি অক্রূরের কাছে। দ্বারকা থেকে তাবৎ উৎপাত দূর হল।

কৃষ্ণ ভাবলেন, অক্রূর শ্বফল্ক ও গান্দিনীর ছেলে এটা কারণ হতে পারে, কিন্তু তেমন কোন কারণ নয়। অন্যকোন বড় কারণ না থেকেই যায় না। স্যমন্তক মণিরই এমন প্রভাবের কথা শোনা যায়। স্যমন্তক মণিই আছে অক্রূরের কাছে। তা না হলে যার তেমন কিছু সঙ্গতি নেই কি করে একটার পর একটা যজ্ঞ সে করে চলে। যত ভাবলেন ততই মনে হতে থাকল কৃষ্ণের স্যমন্তকমণি অক্রূরেরই কাছে।

একটা দরকারের ছল খাড়া করলেন কৃষ্ণ। সভা করলেন নিজের বাড়িতে। সবাইকে ডাকা হল। অক্রূরও এসেছেন। সভা বসল। চারিয়ে দরকারটা কৃষ্ণ পরিষ্কার করলেন সভায়। কথায় কথায় পরিহাস করে অক্রূরকে বললেন ঃ দানে বদান্য আপনি। সবাই বলে, আমরাও বলি। আর কেনা জানে যে শতধন্বা আপনাকেই দিয়ে গেছেন স্যমন্তক রত্ন। রাজ্যের উপকারী সে রত্ন। আপনার কাছে আছে, থাকুক. ক্ষতি কি এমন! স্যমন্তকের প্রসাদ সকলে সমভাবেই তো পাচ্ছি আমরা। কিন্তু সমস্যা অন্য। বলদেবের ধারণা যে রত্নটি আমার কাছে। ভুলও বুঝেছেন আমাকে। আমাদের ভাই-ভাই সম্পর্কে চীড়ও ধরেছে সামান্য। বলদেবকে স্যমন্তক মণিটি যদি একবার দেখান তাহলে আমাদের মধ্যে পূর্বপ্রীতি ফিরে আসে আবার।

স্যমন্তক অক্রূরের কাছেই। সমস্যায় তাঁর মন দুলল। মিথ্যে বলে রেহাই মিলবে না। খোঁজ করতে পারে ওরা। অথচ আবরণ মাত্র কাপড়ের। অতএব ছল নয়, চাতুরীও নয়, সরল হলেই মঙ্গল। কোন গলিখুঁজি নয় আর, একেবারে সিধেপথেই চললেন অক্রূর। বললেন ঃ শতধন্বা আমাকেই রত্নটি দিয়ে যান, আমার কাছেই রয়েছে। শতধন্বার মৃত্যু হল। ভেবেছিলাম চেয়ে নেবেন আপনি। আজ হোক কাল হোক আপনি যখন চাইবেনই তখন বলে আর মুখ নষ্ট করিনি। তাতে হয়ত ভাবতে পারতেন রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সামান্য কষ্ট সইতেও আমি নারাজ। স্যমন্তক ধারণ করে এতদিন বহু কষ্ট সয়েছি। মনে ভোগের ইচ্ছে, অথচ উপায় নেই। এতদিন সমস্ত সুখ থেকেই বঞ্চিত ছিলাম আমি। কিন্তু আর নয়। আপনি নিন, যাকে হয় তাকে দিন। বেঁচে যাই আমি।

অধরবস্ত্রে ঢাকা ছোট্টমত কি একটা বের করলেন অক্রূর। খুব হালকা একটি সোনার কৌটো। মুখ খুললেন। সভা ভাসল দীপ্তিতে। যদুসমাজের শতশত চোখ স্নান করল দিব্যদ্যুতিতে। তাঁরা দেখলেন অক্রূরের হাতে সোনার ছোট্ট কৌটো, তাতে স্যমন্তকমণি।

অক্রূর বললেন ঃ এই সেই মণি, শতধন্বা আমাকে দিয়েছিলেন, আমি দিচ্ছি, যাঁর হয় নিন।

সভার সবাই মুগ্ধ বিস্মিত। চোখে চোখে স্যমন্তকেরই দ্যুতি। বলদেব ভাবলেন, এ কৃষ্ণেরও আমারও। বলদেবের মনে ইচ্ছের ঢেউ। সত্যভামার পৈত্রিক সম্পত্তি। অতএব স্যমন্তক মণি তাঁকে টানবেই, পেতেও চাইবেন জোরের সঙ্গে, চোখে মুখে সেই দাবী। বলদেবকে নিরীক্ষণ করলেন কৃষ্ণ। বুঝলেন। কৃষ্ণ সত্যভামার মুখ চোখ লক্ষ্য করলেন। কৃষ্ণের মন আয়না হল। সত্যভামার ইচ্ছের ছায়া পড়ল তাতে, কাঁপল। নিজের উপরও সংশয় হল কৃষ্ণের। অক্রূরকে বললেন ঃ আমার অপবাদ ঘুচল। এই কারণেই সবাইকে দেখানো হ'ল স্যমন্তক মণি। বলদেবের যেমন অধিকার এ রত্নে, আমারও তেমন। সত্যভামার পিতৃধন, সে হিসেবে তিনিই এর অধিকারী। স্যমন্তক ধারণ করতে হলে শুচি ব্রহ্মচারী থাকতে হয়। আমার পক্ষে অসুবিধে, কারণ আমার ষোলহাজার পত্নী। সত্যভামার পক্ষেও সম্ভব নয়। বলদেব মদিরা পান ছাড়তে পারবেন না। অতএব তিনিও ধারণ করতে পারবেন না। কাজেই সবাই মিলে দানবীর অক্রূরকেই অনুরোধ করছি, তিনিই ধারণ করুন এ রত্ন। তিনিই যোগ্য। রাজ্যের কল্যাণও হবে তাহলে। আর অক্রূরও আশা করি এতে অসম্মত হবেন না।

অক্রূর স্বীকৃত হলেন। স্যমন্তক মণি দুলল অক্রূরের গলায়। অক্রূর সূর্য হলেন।

স্যমন্তকের দীপ্তি ঢাকা পড়েছিল। এবার জ্বলল। পুঞ্জে পুঞ্জে দ্যুতি ছড়াল স্যমন্তক, ছড়াতে থাকল। অক্রূরের গলায় স্যমন্তক। সবাই দেখল, দেখতে থাকল—অক্রূর সূর্য হয়েছেন ॥

৩৬. হিরণ্যকশিপু ঃ রাবণ ঃ শিশুপাল

হিরণ্যকশিপু, রাবণ, শিশুপাল একই ব্যক্তি। ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও নাম। হিরণ্যকশিপু হত হয়েছিলেন ভগবানের হাতে, রাবণ ও শিশুপালও তাই। হিরণ্যকশিপু মরলেন, মুক্ত হলেন না। রাবণও জন্ম নিলেন। শিশুপাল মুক্তি পেলেন, মিলিত হলেন ভগবানের সঙ্গে।

হিরণ্যকশিপুর নিধনের সময় ভগবান নৃসিংহের চেহারা ধরেছিলেন। ইনিই যে সেই বিষ্ণু এ ভাবনা মনে আসেনি হিরণ্যকশিপুর। ভেবেছিলেন এ এমন এক প্রাণী যার সৃষ্টি অশেষ পুণ্য থেকে। এ ভাবনাই ধীরে ধীরে বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর মনে। একই চিন্তা উঠেছিল, পড়েছিল, অবশেষে স্থির হয়েছিল। তাই পরের জন্মে লাভ হল অমেয় ঐশ্বর্য

সম্পদ। অনন্ত ভোগে কাটল রাবণের জীবন। হিরণ্যকশিপু হয়েছিলেন রাবণ।

রাবণ দশানন, কামনার দাস। জানকীতে তাই তাঁর আসক্তি। রামচন্দ্রই ভগবান। তাঁকে শুধু দেখেছিলেন রাবণ। ভগবান বলে বুঝতে পারেন নি। তবু তাঁর হাতে মরণ। তাই চেদির মত বড় কুলে জন্ম হল। রাবণ হলেন শিশুপাল। ঐশ্বর্য প্রচুর, ভোগও করলেন শিশুপাল। তবু এ জন্মেই মিলল মুক্তি, মিলন পরমের সঙ্গে।

নানা কারণে শিশুপালকে বাধ্য হয়েই ভগবানের নাম আনতে হত মনে। অনেক জন্মের বিদ্বেষ। প্রায়ই নিন্দায় মুখর হতেন শিশুপাল। বিষ্ণুর নিন্দা করবেন, সেও নাম আনতে হত মুখে। বহুকালের শত্রু। মন থেকে সরিয়ে রাখা বড় সহজ কথাটি নয়। শিশুপালও পারেন নি। বেড়াতে বেরিয়েছেন শিশুপাল, মনে বিষ্ণুর চেহারা। নাইতে নেমেছেন, কি খেতে বসেছেন, মনে ভেসে উঠে বিষ্ণুর কথা। শুয়ে ঘুমিয়েও পার নেই। চিরশত্রু, অতএব শিশুপালের মনে সেই শত্রু ভগবানের রূপ। সুন্দর চোখ, হার মানায় পদ্মকেও। পরিধানে উজ্জ্বল পীতবর্ণের বস্ত্র। কেয়ূর কিরীট ও কটকে সাজানো শরীর, প্রশস্ত বুক, চার বাহু—শোভিত শঙ্খে চক্রে গদা ও অসিতে। সব মিলিয়ে দিব্য এক মূর্তি। শিশুপালের মনে বারবার ঘোরাফেরা এই মূর্তির।

আক্ষেপসময় শিশুপালের। মুখে উচ্চারিত ভগবানেরই নাম। মনে ভগবানেরই ভাবনা। চক্রক্ষেপণ করেছেন ভগবান। ঘুরতে ঘুরতে চক্র এগিয়ে আসছে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে পুঞ্জ পুঞ্জ তেজ। আক্ষেপসময় শিশুপালের, চোখে এই ছবি। এরকম মনের অবস্থা যখন, ভগবানের চক্রে সেই সময়েই শিশুপাল হত হলেন।

শিশুপাল পাপ থেকে মুক্ত হলেন। লীন হলেন ভগবানে।

ভক্ত ভগবানকে পায়। ভক্তি আছে, পাবেই তাই। ভক্তি যদি না থাকে, শুধু জেগে থাকে বিদ্বেষ, তবু যদি স্মরণ করা হয় তাঁকে, পরমপদ মেলা ভার নয় তবে॥

৩৭০ ভরত ও ভরদ্বাজ

চক্রবর্তী রাজা। নাম ভরত। দেবগণ গান রচনা করেছিলেন এঁরই নামে। বলেছিলেন: মাতা চর্মময় পাত্র মাত্র। পুত্র পিতারই। পিতারই অধিকার পুত্রে। যার ঔরসে জন্ম, পুত্র হয় তারই মত। অতএব হে দুষ্মন্ত, ভরণ কর এই পুত্রের। অপমান হেনো না শকুন্তলাকে। পুত্রই পিতার গতি। যমগৃহে

থেকে পুত্রই উদ্ধার করে পিতাকে। শকুন্তলা সত্যই বলেছেন যে, তুমিই এই পুত্রের পিতা।

ভরতের বহু পত্নী। একে একে তাদের নটি পুত্র হল। কিন্তু ভরত বললেন ভয়ের কথা : এরা আমার মত নয়।

পত্নীদের ভয় হল। রাজা ত্যাগ করতে পারেন তাদের। অতএব নটি পুত্রই বিনষ্ট হল। মাতা নষ্ট করলেন নিজ পুত্র।

এরপর ভরতের আর পুত্র হল না। বিফল ভরত বিষণ্ণ। পুত্র চাই, মরুৎস্তোম যজ্ঞ করলেন ভরত। মরুৎরা পুত্র দিলেন। নাম ভরদ্বাজ।

ভরদ্বাজের জন্ম উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে। দীর্ঘতমার পদতল প্রহারে ক্ষিপ্ত বৃহস্পতির বীর্যে সমুৎপন্ন হলেন ভরদ্বাজ।

বৃহস্পতি বললেন মমতাকে : আমাদের দুজন হতেই এর জন্ম, তুমি একে ভরণ কর।

মমতাও বললেন : তুমি ভরণ কর, আমাদের দুজন থেকেই এর জন্ম।

বৃহস্পতি গেলেন একদিকে। মমতা অন্যদিকে ! শিশু পড়ে রইল পরিত্যক্ত হয়ে। নাম তাই ভরদ্বাজ।

ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ হল। মরুৎরা ভরদ্বাজকে দিলেন। ভরত পুত্র পেলেন। ভরদ্বাজের আর এক নাম তাই বিতথ ॥

৩৮. শান্তনু ও বৃষ্টি

অতিবৃদ্ধ। হাতে ছুঁলেন তাঁকে। বৃদ্ধ হলেন যুবক। শান্তি নেই মনে। তিনি ছুঁলেন। মনে নেমে এল শান্তির বারাণসী। নাম তাই শান্তনু।

এমন যে শান্তনু তাঁর রাজ্যে বৃষ্টি নেই। বারোটা বছর কাটল একভাবে। বৃষ্টি নেই, বৃষ্টি নেই। রাজ্যময় হা বৃষ্টি হা বৃষ্টি। পুড়ে ছাই হতে শুরু হল সব। রাজ্য প্রজা যায় যায়। বিচলিত শান্তনু। ব্রাহ্মণদের শুধোলেন : কি আমার অপরাধ, যার জন্য মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন বৃষ্টির দেবতা।

ব্রাহ্মণরা বললেন : দেবাপি আপনার বড় ভাই। তিনি থাকতে পৃথিবী ভোগ করছেন আপনি। তাই এই অনাবৃষ্টি।

: কি করা তাহলে ?

যতদিন দেবাপি পতিত হবার মত মারাত্মক কোন দোষ না করছেন, ততদিন এ রাজ্য তাঁর। যাঁর রাজ্য তাঁকে দিন।

মন্ত্রী অশ্মসারীও শুনলেন ব্রাহ্মণদের কথা। দেবাপি বনে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পাঠালেন বড় বড় সব বলিয়ে-কইয়েকে। বেদের বিরুদ্ধে খই ফোটে

তাদের মুখে।

দেবাপি সাদাসিধে সরল লোক। তাঁর মন ভাঙ্গানো কঠিন হল না তেমন। বলিয়েকইয়েদের কথার ফেনায় ভেসে গেলেন তিনি। বেদে অবিশ্বাস এল, বেদে যাকে ভাল বলে তিনি করতে থাকলেন তার উলটোটি।

রাজ্য ছাড়তে হবে। শান্তনু দুঃখিত, শোকার্ত। ব্রাহ্মণদের পাঠিয়ে নিজেও চললেন বনে, দেবাপির কাছে। দেবাপিকে ফিরিয়ে আনবেন শান্তনু।

ব্রাহ্মণরা দেবাপিকে বুঝালেন: বড়ভাই আপনি। রাজত্বও করবেন আপনি। বেদে এইরকম বিধানই আছে।

দেবাপি বেদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন। উলটো উলটো কথাও শুনিয়ে দিলেন প্রচুর।

ব্রাহ্মণদের বুঝতে বাকি রইল না। ছন্ন হয়েছে দেবাপির মতি। উনি পতিত। অতএব শান্তনুকে বললেন: বেশি কথার প্রয়োজন নেই, চলে আসুন। বেদের নিন্দা এঁর মুখে। ইনি পতিত। অতএব আপনিই রাজত্ব করুন। দোষ নেই এতে।

শান্তনু রাজ্যে ফিরলেন। রাজত্ব করা শুরু করলেন। দোষমুক্ত তিনি। বৃষ্টির দেবতা প্রসন্ন। তাই বৃষ্টি, বৃষ্টি, প্রচুর বৃষ্টি॥

৩৯. জন্মের উদ্যোগ

বসুদেব বিবাহ করলেন দেবকীকে। এই বিবাহে বরও বধূর রথ চালিয়েছিলেন কংস।

কংস সারথি হয়েছিলেন। রথ চলছে। আকাশ থেকে দৈববাণী হল। মেঘের গর্জনের মত গম্ভীর স্বর। আকাশ গমগম করল। কংস শুনলেন: বর ও বধূকে বহন করছ, কর। ঐ সেই বধূ। ওরই অষ্টম গর্ভে জন্ম হবে তোমার মৃত্যুর।

মহাবীর কংস। খড়্গ উঠালেন। দেবকীকে হত্যা করবেন।

বসুদেব মিনতি করলেন: বধ কর না। কথা দিচ্ছি, যারা জন্ম নেবে তাদের সকলকেই তুলে দেব তোমার হাতে।

কংস আশ্বস্ত হলেন। নিরস্ত হলেন।

পৃথিবী এসেছেন সুমেরু পর্বতে। এখানে বাস দেবতাদের। পৃথিবী পীড়িত। বহুভারে গ্রস্ত। ব্রহ্মা ও দেবগণের কাছে তাই আগমন।

পৃথিবী বললেন: অগ্নি সুবর্ণের, সূর্য গোসমূহের গুরু। আমার ও লোকসমূহের গুরু নারায়ণ। প্রজাপতিরও পতি তিনি। মূর্তিতে প্রকটও নন

তিনি। আপনারা সেই বিষ্ণুরই অংশ। আদিত্য, মরুৎ, রুদ্র, বসু, বহ্নি— সকলেই বিষ্ণুরই রূপ। যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, দানব, গন্ধর্ব, সর্প, অপ্সরা সবেতেই বিষ্ণু। গ্রহ নক্ষত্র, আকাশ, সবই বিষ্ণুময়। তবু সবই সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঠছে, পড়ছে, ভাঙছে। সম্প্রতি মর্ত্যলোক ক্লিষ্ট। কালনেমি ও অন্যান্য দৈত্যের দাপে প্রজাদের শান্তি যেতে বসেছে। কালনেমি বিষ্ণুর হাতে মারা যায় বটে, কিন্তু এখন সে কংস। সঙ্গে জুটেছে অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ, বাণাসুর। আরো আছে। অনেক, অসংখ্য। সৈন্যও এদের অনেক, অসংখ্য। চলে ফিরছে আমারই বুকে। বড় ভার। সইতে পারছিনে, বইতেও না। আপনারা কিছু কমিয়ে দিন। নইলে যেতে বসেছি রসাতলে।

দেবতাদের দ্বারা ব্রহ্মা প্রচোদিত হলেন। বললেনঃ পৃথিবীর কথা সত্য। বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি মহাদেব বা আপনারা সবাই নারায়ণাত্মক। চলুন ক্ষীরসাগরের উত্তরতটে, হরিকে আরাধনা করি। হরিই ধর্মকে বাখেন, তিনিই রাখবেন। আসুন আমরা সকলে তাঁকে নিবেদন করি।

ব্রহ্মা এলেন, দেবগণও। প্রণত ব্রহ্মা, বিনত দেবগণ। বাতাসে কাঁপল স্তবের ধ্বনি। হরি এলেন। তিনি তুষ্ট। বললেনঃ তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হবে। ··কিন্তু কি অভিলাষ?

দেবতাদের সম্মুখে হরির বিশ্বরূপ। দেবতারা স্তব্ধ, স্তম্ভিত, ভীত। ব্রহ্মা আবার স্তব করলেন। স্তবে স্তবে হরির আরতি হল।

ব্রহ্মা বললেনঃ পৃথিবী ভারগ্রস্ত। মহা মহা দুষ্ট সব অসুরের দাপে পৃথিবী ক্ষুব্ধ। প্রসন্ন হও, প্রতিকার কর। কি করার আছে আমাদের? যদি থাকে আজ্ঞা কর।

ভগবানের দুইগাছি কেশ। সাদা আর কালো। বললেনঃ এই কেশ দুগাছিই অবতীর্ণ হবে পৃথিবীতে। ভার হরণ করবে, শান্তিসুখ আসবে ফিরে। দেবতারাও জন্ম নিন পৃথিবীতে। যুদ্ধ করতে থাকুন উন্মত্ত অসুরদের সঙ্গে। আমার দৃষ্টি পড়বে। ধুলো হবে পাপ। দেবভাবে পরিপূর্ণ দেবকী। তারই অষ্টমগর্ভে ঐ কেশ জন্ম নেবে। কংসকে ধ্বংস করবে।

অন্তর্হিত হলেন হরি। দেবগণ ফিরে এলেন। একে একে নক্ষত্রেরা খসে খসে পড়ল। দেবতারা পৃথিবীতে জন্ম নিলেন।

নারদ কংসকে সংবাদ দিলেনঃ স্বয়ং ভগবান জন্ম নেবেন দেবকীর অষ্টম গর্ভে।

কংস ক্রুদ্ধ হলেন। বসুদেব ও দেবকী বন্দী হলেন।

বিষ্ণু তৎপর হলেন।

নিদ্রাদেবী, বিষ্ণুরই মহামায়া ইনি। মোহের জাল বিছিয়ে বসে আছেন।

জগৎ তাই মুগ্ধ, অবশ, আচ্ছন্ন।

বিষ্ণু নিদ্রাকে পাঠালেন। হিরণ্যকশিপুর বিখ্যাত ছয়পুত্র স্থাপিত হল দেবকীর গর্ভে।

বসুদেব প্রতিশ্রুতি পালন করলেন। একে একে ছটি পুত্রই তুলে দিলেন কংসের হাতে।

সপ্তম গর্ভে স্থাপিত হল বিষ্ণুর শেষ নামক অংশ।

বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণী। দেবকীর গর্ভে কংসের ভয়। বিষ্ণুর বলা ছিল নিদ্রাকে। দেবকীর সপ্তম গর্ভ রোহিণীতে স্থাপন করলেন তিনি। লোকে বলল, দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে। গর্ভ সঙ্কর্ষণে জন্ম। নাম তাই সঙ্কর্ষণ। পুত্র নয়, একটা বিরাট পর্বতের শুভ্রচূড়া।

বিষ্ণু বলেছিলেন নিদ্রাকে ঃ এরপরই আমি প্রবিষ্ট হব দেবকীর জঠরে, আর তুমি যশোদার গর্ভে। শ্রাবণের কৃষ্ণা অষ্টমীর রাত্রে হবে আমার জন্ম। বসুদেব যশোদার ঘরে যাবে। শয্যা বদলে হবে সন্তানবদল। আমি হব যশোদার, তুমি দেবকীর। কংস তোমাকেই গ্রহণ করবে, পাথরের উপর ছুঁড়ে ফেলবে। তুমি তখন থাকবে আকাশে। ইন্দ্র ভগিনী হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করবেন। শুম্ভনিশুম্ভ একে একে মারা পড়বে তোমারই হাতে। তুমিই বিভূতি, সন্নতি, তুমিই কীর্তি ক্ষান্তি, ধৃতি, পুষ্টি, তুমিই লজ্জা, ঊষা ঃ তুমিই সব। দুর্গা, আর্যা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রকালী, ভদ্রা ক্ষেমঙ্করী বলে তোমাকেই যারা ধ্যান করবে তাদের তাবৎ অভীষ্টই হবে সিদ্ধ।।

৪০. কৃষ্ণের জন্ম

বিষ্ণু যেমন বলেছিলেন নিদ্রাও সেইমত করলেন। একে একে ছটি গর্ভ দেবকীর গর্ভে বিন্যস্ত করলেন। অবশেষে সপ্তম গর্ভ, দেবকী থেকে রোহিণীতে স্থাপন।

বিষ্ণু অবতীর্ণ হবেন। সপ্তমের পর অষ্টম। বিষ্ণুর পালা। দেবকীর গর্ভে বিষ্ণু প্রবেশ করলেন। ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। আকাশের গ্রহতারা মঙ্গল আলো ঢালল, ঋতুতে ঋতুতে বিচিত্র সাজ চড়ল প্রকৃতির অঙ্গে। অনিয়ম রইল না এক বিন্দুও। গ্রহরা চলল ঠিক ঠিক কক্ষপথে। প্রকৃতি প্রসন্ন, চরাচরে প্রশান্তি। দেবকী জ্বললেন। জ্বলতে থাকলেন, বিকীর্ণ করতে থাকলেন অনন্ত তেজ। চোখে সয় না এমন তেজ, শত্রুর মনে জ্বালা জাগায় এমন তেজ।

অদৃশ্য হয়ে দেবতারা রইলেন দেবকীরই পাশে পাশে। বিষ্ণুকে গর্ভে ধরেছেন। অসামান্য দেবকী। দেবতারা স্তব করতে থাকলেন।

সময় হল। বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন। জগৎ যেন পদ্ম। সূর্যকিরণ চাই, পদ্ম দল মেলবে। বিষ্ণু সূর্য হলেন, আবির্ভূত হলেন।

ভগবানের জন্মদিন। সমস্ত মানুষের মন আহ্লাদে ভরে উঠেছিল চাঁদের সুধায় ভেসে। লোকসমূহ যেমন আহ্লাদের সরোবরে স্নান করে ঠিক তেমনি। কোথা দিয়ে কি হল কেউ জানতে পেল্ল না। কিন্তু আকাশ নির্মল রইল, অত্যন্ত নির্মল। সাধুদের মনে নেমে এল অনন্ত শান্তি। কোথায় কি হল কেউ জানল না। কিন্তু বায়ু শান্ত, নদ নদী প্রসন্ন প্রশান্ত। সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ল গান। গন্ধর্বদের গানে গানে অপ্সরাদের নাচে নাচে ভুবন প্লাবিত হল, দুলতে থাকল। আগুন জ্বলল, কিন্তু কত স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল। মধ্যরাত্রে মেঘ গর্জন করল, কিন্তু কত মৃদু অথচ গম্ভীর। অন্তরীক্ষে দেবগণ পুষ্পবর্ষণে উতলা। পুষ্পবর্ষণ, সঙ্গে মন্দ মন্দ মেঘ গর্জন। পুলকে কেঁপে কেঁপে বাতাসে ভাসল।

বিষ্ণু ভূমিষ্ঠ হলেন। চতুর্বাহু, অঙ্গে পদ্মদলের কান্তি, বুকে আঁকা শ্রীবৎসচিহ্ন। বসুদেবের বুঝতে বাকি রইল না। স্তব করলেন। বললেন ঃ প্রভু, মানুষী চেহারা নিন। আমার ঘরে অবতীর্ণ আপনি। কংস জানলে সর্বনাশ হবে।

দেবকী বললেন ঃ হে দেবদেবেশ, নিজের মায়ায় শিশুরূপে বিরাজ করছেন। প্রসন্ন হোন। চতুর্ভুজরূপ উপসংহার করুন। অবতার রূপে কংস যেন জানতে না পায়।

ভগবান বললেন ঃপুত্র চেয়েছিলে, আমার স্তব করেছিলে। আজ তা পেলে।

বিষ্ণু তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন।

সেই রাত্রেই বসুদেব দিব্য সেই শিশুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কেউ তাঁকে দেখতে পেল না, কেউ তাঁকে বাধা দিল না।

রক্ষীরা ঘুমে অচেতন। নিদ্রা মোহিত করেছেন।

বসুদেব চলেছেন। তাঁর পিছনে বৃষ্টির লক্ষ ফণা। ফণা ছড়িয়ে বৃষ্টি বসুদেবকে ঢেকে নিয়ে চলেছে।

সামনে যমুনা। তরঙ্গে ক্ষুব্ধ আবর্তে সঙ্কুল। বসুদেব যমুনা পার হলেন। মাত্র এক হাঁটু জল। যমুনার তীরে নন্দ ও অন্যান্য বহু গোপ। কংসকে তারা কর দেবে। বসুদেব তাদের দেখলেন। তারা বসুদেবকে দেখতে পেল না। নিদ্রাদেবী ঘুম ছড়িয়ে দিয়েছেন।

যশোদাও অদ্য আচ্ছন্ন, বিমোহিত। তাঁর একটি কন্যা হয়েছে। বসুদেব যশোদার পাশটিতে শিশু বিষ্ণুকে শুইয়ে দিলেন। ফিরে এলেন কন্যাটিকে কোলে নিয়ে।

জেগে উঠে যশোদা দেখলেন, একটি নীলপদ্ম। তাঁর পুত্র হয়েছে। যশোদা

আনন্দে ফেটে পড়তে চাইলেন। কোমল শ্যামবর্ণ। অঙ্গ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে কোমল আলো, চোখ জুড়িয়ে আসে। সুধা আছে ও আলোয়।

দেবকীর পাশে স্থাপিত হল সেই কন্যা। শিশু কাঁদল। রক্ষীরা কংসকে খবর দিল।

কংস এলেন। যেন যম। দেবকী কাকুতি করলেন ঃ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

কংস কন্যাটিকে পাথরের উপর ছুঁড়ে ফেললেন। কিন্তু কন্যা রয়ে গেলেন আকাশে। তিনিই মহাদেবী নিদ্রা। আট বাহুতে আয়ুধ ধারণ করে মহৎরূপে সংস্থিত হলেন তিনি আকাশে। অট্ট অট্ট হাস্য ভেসে এল। কংস শুনলেন ঃ আমাকে নিক্ষেপ করে কি হবে ? যিনি তোমার সাক্ষাৎ মৃত্যু তিনি জন্মেছেন। আগের জন্মেও তোমাকে তিনি বধ করেছিলেন। অতএব উপায় কর যাতে হিত হয় তোমার।

দিব্য মাল্যে ও চন্দনে ভূষিতা দেবী নিদ্রা। সিদ্ধগণ স্তুতি করলেন। তারপর বিলীন হলেন মহাশূন্যে। বায়ু মণ্ডলে ভাসতে থাকল তাঁর সেই হাসি। কংস শুনতে থাকলেন ঃ যিনি তোমার সাক্ষাৎ মৃত্যু তিনি জন্মেছেন। অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হতে হতে উদ্ধত কংসের কানে কেবলই বাজতে থাকল এই এক কথা ।।

৪১· কংসের ভয়

কংস উদ্বিগ্ন। ভয় বাসা বাঁধল মনে।

ভয় ব্যাধ হল, মন মৃগ। তাড়না করে ফিরল বন থেকে বনান্তরে।

কংস অশান্ত, চঞ্চল। মনে ভয়। মুখে সাহস, আস্ফালন। কংস কথার উত্তপ্ত বাতাসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন ভয়কে।

প্রলম্ব, কেশী, অরিষ্ট, পুতনা। অসুরদের এরা মাথা। কংস তাদের ডাকলেন। বললেন ঃ অমিতবীর্য দেবতারা তাপিত। নিতান্তই দুরাত্মা ওরা। তা না হলে যত্নপর হয় কংসনিধনে! কিন্তু আমি কংস। তোয়াক্কা রাখিনা কারো। ইন্দ্রের বীর্য তো ছিঁটেফোঁটা। তাপস মহাদেব সামান্য তাপসই। ছলে কৌশলে অসুর বধ করেন যে বিষ্ণু তাঁকেও আমি ধরিনে। আদিত্যসমূহে বসুগণ বা অগ্নির দৌড় যে কতদূর তাও জানি। দেবতারা আমার কাছে পরাজিত। তাদের এমন সামর্থ্য হবে না যে আমাকে বধ করে। অমরপতি ও আমার যুদ্ধ তো আপনারা দেখেছেন। আমার তাবৎ বাণ পৃষ্ঠদেশে বহন করতে করতেই পলায়ন করেছিলেন তিনি। ইন্দ্র অনাবৃষ্টি করেছিল আমার রাজ্যে। আমার বাণে বাণে বিদ্ধ হল মেঘমালা। বৃষ্টি হল।

জরাসন্ধ গুরু। তিনি ছাড়া পৃথিবীর কোন্ রাজা আমার বাহুবলকে ভয় না করেন ? কেই বা নতিস্বীকার করেন নি ? দেবগণ তো নিতান্তই ছেলে-মানুষ। ওরাই কিনা নেমেছে আমার মৃত্যুর ষড়যন্ত্রে। আমার হাসি পাচ্ছে। কিন্তু তবু…।

কংসের সুরে দুশ্চিন্তার লয়ঃ…কিন্তু তবু হাত গুটিয়ে বসে থাকা বা শুধু বসে বসে হাস্য করা আমার উচিত নয়। পৃথিবীতে যারাই যাগে যজ্ঞে আগ্রহী, যারাই যশস্বী, তাদেরই বধ করবে ; এবং নির্বিচারে। নিশ্চিত জেনো. ওতেই দেবতাদের অপকার। দেবকীর সেই কন্যা আমাকে যা জানিয়ে গেছে তা কখনোই মিথ্যে নয়। আমার মৃত্যু অবতীর্ণ হয়েছে। গত জন্মেও ঐ একই হাতে আমার মৃত্যু হয়েছিল। কাজেই পৃথিবীর সমস্ত বালকের উপরই লক্ষ্য রাখতে হবে। যাকেই মনে হবে অসাধারণ, তাকেই হত্যা। শক্তি বেশি দেখলেই হত্যা। এবং বেশ যত্ন নিয়ে, অতি সুচারুরূপে হত্যা।

কংস বুঝলেন বৃথাই কারাগারে আটকে রেখেছেন বসুদেব ও দেবকীকে। ওঁদের তিনি মুক্তি দিলেন। বললেন, বৃথাই বিনষ্ট করেছি আপনাদের সন্তান। আমার বিনাশের জন্য অন্য কেউ জন্মেছে অন্য কোথাও।

কংস সান্ত্বনা দিলেনঃ দুঃখ করবেন না। মরণ লেখা ছিল কপালে। আয়ু শেষ হয়েছিল। তা না হলে ঐভাবে কেউ মরে ?

দেবকী ও বসুদেবকে কংস মুক্তি দিলেন। কিন্তু কংসের ভয় দূর হল না। মনে নীরন্ধ্র ভয়। বারবার উঠছে পড়ছে, পড়ছে উঠছে, ঘুরছে, ঘুরছে, তাড়া করে ফিরছে। কংস ব্যতিব্যস্ত, দিশাহারা ॥

৪২. পুতনার প্রাণান্ত

পুত্র জন্মেছে। নন্দ খুশি।

বসুদেব এসেছেন। মুক্তি পেয়েই তিনি চলে এসেছেন। খুশিখুশি নন্দ। বসুদেব দেখলেন, বুঝলেন। বললেনঃ বৃদ্ধ হয়েছেন, পুত্র লাভ হয়েছে এই বয়সে। আপনি ভাগ্যবান। কর দিতে এসেছিলেন। সে কাজ সম্পন্ন। অতএব আর দেরি নয়। বিলম্ব করবেন না। গোকুলে ফিরুন। যত তাড়াতাড়ি ততই মঙ্গল।

এই কথা বলতেই বসুদেবের আসা। রোহিণীর গর্ভজাত তাঁর পুত্রকে নিয়ে ভাবনা।

রাজকর দেওয়া হয়েছে। শকটে ভাণ্ডসমূহ সাজিয়ে তোলা হল। নন্দ ও অন্য গোপেরা গোকুলের দিকে যাত্রা করলেন।

গোপেরা গোকুলে বাস করছেন। এই সময়কার এক রাত্রির এক ঘটনা।

রাক্ষসী পূতনা যাকেই স্তন্যদান করত তারই মৃত্যু আসত ঘনিয়ে। তার স্তন্যে বিষ। যে পান করত তারই অঙ্গ হত উপহত।

কৃষ্ণ তখন ঘুমিয়ে। ঘুমন্ত কৃষ্ণকে কোলে করে পূতনা স্তন্যদান করল।

কৃষ্ণ কুপিত হলেন। কোপ সঞ্চারিত হল বাহুতে। বাহু হল প্রচণ্ড কৃষ্ণ অবপীড়ন করলেন পূতনার স্তন। কৃষ্ণ স্তন্য পান করলেন, সঙ্গে পূতনার প্রাণও।

স্নায়ু বিচ্ছিন্ন হয়েছিল পূতনার। যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে আছড়ে পড়েছিল মাটিতে। সবাই জেগে উঠেছিল সেই শব্দে।

বিস্মিত ব্রজবাসী, হতবাক ব্রজবাসী। সবাই দেখল, পূতনা পতিত ও মৃত, কোলে কৃষ্ণ। যশোদা ত্রস্ত হাতে কোলে তুলে নিলেন কৃষ্ণকে। গোরুর লাঙ্গুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বালদোষ দূর করলেন। নন্দগোপের হাতে গোময় চূর্ণ। রক্ষামন্ত্র পড়তে পড়তে তিনি সেই চূর্ণ কৃষ্ণের মাথায় দিলেন।

নন্দ বললেন ঃ যাঁর নাভিকমল থেকে এই জগৎ উৎপন্ন সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন। যিনি দাঁতে ধরে রক্ষা করেছিলেন এই জগৎকে সেই বরাহরূপী ভগবান যেন তোমাকে রক্ষা করেন। যিনি নখে চিরেছিলেন শত্রুর বুক সেই নৃসিংহরূপী কেশব তোমাকে রক্ষা করুন। ত্রিবিক্রম রূপ ধরেছিলেন বামনদেব, তিনি রক্ষা করুন তোমাকে। গোবিন্দ তোমার কণ্ঠ, বিষ্ণু তোমার জঠর ও গুহ্য, জনার্দন তোমার জঙ্ঘা ও পদ রক্ষা করুন। অব্যয় অব্যাহত যাঁর ঐশ্বর্য সেই নারারণ রক্ষা করুন তোমার মুখ, বাহু প্রবাহু, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ। প্রেত তোমার শত্রু, কুষ্মাণ্ড তোমার শত্রু, রাক্ষসেরাও তোমার শত্রু। শার্ঙ্গ, গদা খড়্গ ও শঙ্খধ্বনিদ্বারা এরা হত হোক। দিক্‌সমূহে বৈকুণ্ঠ, বিদিকসমূহে মধুসূদন, আকাশে হৃষীকেশ, মহীধর ভূমিতে তোমাকে রক্ষা করতে থাকুন।

নন্দগোপ স্বস্ত্যয়ন করলেন। গোপেদের মনে নেমে এল শান্তি। শকটের নীচে দোলা। কৃষ্ণকে শুইয়ে দেওয়া হল সেই দোলায়।

পূতনার বিরাট বিকট শরীর লুটিয়ে আছে মাটিতে। তাকিয়ে তাকিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল ব্রজবাসী পূতনার মৃত শরীরটাকে দেখল।।

৪৩. বাল্যলীলা

শকটের তলে দোলা। শিশু শুয়ে দোলায়। শিশু কাতর ক্ষুধায়। কান্না শুরু হল। যেমন করে সব শিশু তেমনি কৃষ্ণও কেঁদে কেঁদে টেনে আনতে চাইলেন মাকে। কৃষ্ণ কাঁদলেন, পা ছুঁড়লেন। দোলা সমেত শকট উলটে

পড়ল। ভেঙে চুর হল হাঁড়ি কলসী।

শকট উলটে গেছে, দোলাও। গোপেরা হাহাকার করে উঠল। ধড়ে প্রাণ এল তাদের। কৃষ্ণের কিছু হয়নি। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে শিশু।

ধারে কাছে ছোট-ছোট আরও সব ছেলেমেয়ে ছিল। সকলেই তাদের শুধোল কার কাজ? কে উলটেছে শকট?

সবাই বলল: ও-ই ফেলেছে। আমরা দেখেছি কাঁদছিল, পা ছুঁড়ছিল। তাতেই উলটে পড়েছে শকট।

গোপেরা অবাক মানল। আরো বেশি অবাক মেনে কোল বাড়িয়ে নন্দ তুলে নিলেন কৃষ্ণকে।

যশোদা এলেন। আতপ চাল, দই, ফুল-ফল দিয়ে পুজো করলেন শকটের। পুজো করতে লাগলেন ভগ্নভাণ্ডের কপালিকা।

গর্গমুনি এলেন। বসুদেব পাঠিয়েছেন তাঁকে। গোপেদের অজ্ঞাতে দুই ভাইয়ের সংস্কারসমূহ সম্পন্ন করলেন মুনি গর্গ। নামকরণ হল, বড়র রাম, ছোটর কৃষ্ণ। রাম ও কৃষ্ণ হামাগুড়ি দেওয়া শিখলেন। দারুণ দুরন্ত দুজনেই। সারা গায়ে গোবর ছাই। তাই নিয়েই রাম ও কৃষ্ণের খেলা। যশোদা হার মানলেন, রোহিণীও।

কখনো এখানে, কখনো ওখানে। কখনো গোয়ালে গোবর মাখেন, কখনো সেখানে গিয়ে হাজির হন যেখানে বাছুরগুলো বাঁধা। বাছুরের লেজ টেনে লেজে ঝুলে খেলা চলল দুই দুরন্তের।

যশোদা ঠেকাতে পারতেন না, কোনমতেই না। রাম ও কৃষ্ণ খেলতেন, দৌরাত্ম্য করতেন। যশোদা রাগ দেখালেন। যে চোখে পদ্মরাগ সে চোখে ঝরালেন আগুন। যে হাতে আদর, শুধু আদর সে হাতে উঠল লাঠি। কৃষ্ণকে বকলেন, ধমক দিলেন, অবশেষে বেঁধে রাখলেন উদূখলে। বাইরে রোষের ভান, মনে স্নেহ। রোষেস্নেহে মেশামিশি। যশোদা বললেন: যাও এবার, দেখি কেমন পার!

নিশ্চিন্ত হলেন যশোদা। মন দিলেন ঘর-করনার কাজে। কৃষ্ণ সুযোগ পেলেন। উদূখল, টেনে নিয়ে কৃষ্ণ চললেন। যমল ও অর্জুন, পাশাপাশি কাছাকাছি দুই গাছ। ওর মধ্য দিয়েই পথ করে নিলেন কৃষ্ণ। উদূখল আটকে গেল দুই গাছের গুঁড়ির ফাঁকে। কৃষ্ণ এগুচ্ছেন। টান পড়ল। বিস্ময়ের তরঙ্গ উঠল। প্রচণ্ড শব্দ করে দুটি গাছই ভেঙে পড়ল।

কিসের শব্দ, কি পড়ল—ব্যস্ত হয়ে সবাই ছুটে এল। দেখল কচি কচি দাঁতে হাসির নাচ। কৃষ্ণ হাসছেন। পেটে বাঁধা দড়ি। সবাই অবাক হল। কৃষ্ণের নামও হল দামোদর।

গোপেরা ভীত হল। পরামর্শে বসলেন নন্দ। সবাই বলল: এখানে

আর নয়, চল যাই অন্য বনে। পূতনা মরল, শকট উলটালো, হাওয়া নেই একরত্তি অথচ ভেঙ্গে পড়ল বিরাট দুই গাছ। কেবলই উৎপাত, উৎপাতের পর উৎপাত। ব্রজ বিপন্ন। এ সবই তার আভাস। অতএব আর দেরি নয়। ভালোয় ভালোয় বরং চল বৃন্দাবনে।

ঠিক হল বৃন্দাবনে চল। অতএব চল, বিলম্ব নয় এক মুহূর্তও। 'বৃন্দাবনে চল, বৃন্দাবনে।' দেরি হলনা। গোরুবাছুর, ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি, গাড়ি-গাড়ি জিনিস নিয়ে সবাই চলল। ব্রজভূমি শূন্য হল, কাকে কাকে ছেয়ে গেল সমগ্র ব্রজ।

দারুণ গ্রীষ্মে খাঁখাঁ করছে চারিধার। ঘাস নেই, পাতা নেই। চিন্তা হল বাঁচবে কি করে গোসমূহ। চিন্তা করলেন কৃষ্ণ। খরার সময়ে বর্ষা এল। ঘাসে পাতায় শস্যে শস্যে মাঠ উছলে পড়ল। ব্রজবাসী বৃন্দাবনবাসী হলেন। শকটী বাট পর্যন্ত আধখানা চাঁদের আকারে সাজিয়ে বাস করতে থাকলেন ওঁরা। গোরুবাছুরের দেখাশুনো করেন রাম ও কৃষ্ণ। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে চলল তাঁদের খেলা।

মাথায় ময়ূরের পুচ্ছ, কানে বনের ফুল। রাম ও কৃষ্ণ সাজ করেন, খেলেন, বাঁশিতে সুর তোলেন। পাতা দিয়ে বাজনা বানান, বাজান। আনন্দে আনন্দে হালকা হাসির হাওয়ায় ভেসে ভেসে উড়তে থাকলেন দুই ভাই—রাম ও কৃষ্ণ। গোরু চরে, নজর রাখেন, আর হাসি হুল্লোড়ে বয়ে যায় সময়। বয়স সাত, অথচ পালক হয়ে উঠলেন গোসমূহের।

বর্ষা এল। মেঘে মেঘে ভরল আকাশ। বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে একাকার হল সমস্ত দিক। মাঠে এল ফসলের বান। পৃথিবীর অঙ্গে পদ্মরাগমণি, পৃথিবী যেন মরকতময়ী। অনেক সম্পদ পেয়ে অহংকারে যেমন অন্ধ হয় মানুষ, ছোটে দিশেহারা হয়ে, ঠিক অমনতরই ফেঁপে উঠল নদী, কেঁপে কেঁপে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উন্মাদের মত নাচতে নাচতে বুক ফুলিয়ে নদী ছুটল। মূর্খের বাচাল জিহ্বার পাশে ভালভাল কথা যেমন বেমানান ঠিক তেমনি হল চাঁদের দশা। শোভা গেল, সুন্দর কান্তিতে কালি পড়ল, কালো মেঘে ঢাকা পড়ল সোনার চাঁদ। যেমন রাজা তেমন সব সভাসদ। যদি বিবেকহীন রাজা, রাজসভায় পয়দা হয় ঠিক তেমন তেমন লোকই। আকাশের সভায় ঠাঁই পেল তাই ইন্দ্রধনু। মেঘের বুকে দুলল সারে সারে ধবধবে বলাকা। মনে হল ভান নেই, ছল নেই, চাতুরী নেই এমন নিপাট ভালমানুষ জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় অস্থির। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। চমকে চমকে উঠল বিদ্যুৎ। মুহূর্তের চমক। ভালোর সঙ্গে মন্দির মিতালিও এমনি মুহূর্তের। মূর্খের কথায় নানা বাঁকাচোরা অস্পষ্ট অর্থ। শস্যে শস্যে ঢাকা পড়ে পথগুলোর দশাও হল অমনি।

বর্ষা এসেছে। বনে বনে ময়ূরের আনন্দ, ভ্রমরের খুশি। ময়ূরে ভ্রমরে পরিশোভিত মহাবন। রাম ও কৃষ্ণ, অনেক অনেক গোপাল—খুশির হাট বসল। রাম ও কৃষ্ণ নাচলেন, গাইলেন—বকুল গাছের তলায় গন্ধে সুরে দুলতে থাকল খুশি। কদমের মালা, ময়ূরের পুচ্ছ, রঙবেরঙের হরেক পাথরের সাজে রাম ও কৃষ্ণ মাতলেন খেয়াল খেলায়। ঘুম চাই, ঘাসের গালিচাতেই হয়ত এলিয়ে দেন তনুদেহ। মেঘের গর্জনে কখনো হয়ত হাহাকার রব করে উঠেন দুজনেই। কেউ গাইল, রাম ও কৃষ্ণ প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত, কখনো বাঁশিতে তোলেন ময়ূরের কেকাসংগীত।

অনন্য রাম ও অসামান্য কৃষ্ণ। তাঁদের প্রসন্ন মনের ছোঁয়ায় সবকিছুতেই নামে প্রসন্নতা। সারাদিন মেতে থাকেন খেলায়। মাতিয়ে রাখেন অন্য গোপেদের। সন্ধ্যা নামে, রাম ও কৃষ্ণ ফেরেন গৃহে। গৃহেও আসে খোলা মাঠের খুশি ।।

৪৪. কালিয় দমন

একা কৃষ্ণ। রাম আসেননি। কৃষ্ণ এসেছেন বৃন্দাবনে। একাই। বনফুলের মালার সাজ তাঁর অঙ্গে। সঙ্গে গোপেরা। বিচরণ করছেন কৃষ্ণ। এদিক ওদিক এধার সেধার। বেড়াতে বেড়াতে একসময় কৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন যমুনার ধারে। উল্লসিত যমুনা। তরঙ্গে তরঙ্গে অজস্র হাসি। তীরে ফেনার রাশি।

সামনে যমুনা, কালিয় নাগের কালিয় হ্রদ। বিষের আগুনে সন্তপ্ত যমুনা। কৃষ্ণ দেখলেন, চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলেন। তীরে গাছপালার দগ্ধ অবশেষ। যমুনা নৃত্য করেছে। ঢেউয়ের মাথা থেকে জল কেড়ে নিয়েছে বাতাস। ছুঁড়েছে ছিটিয়েছে এধার ওধার। পাখিদের গায়ে লেগেছে। তীরে ঝলসানো বিকৃত মৃত অনেক পাখি। সেই ভয়ংকর হ্রদ সম্মুখে। চেয়ে চেয়ে কৃষ্ণ দেখলেন। হাঁ বিস্তার করে মৃত্যু পড়ে রয়েছে, লেহন করছে এই তীরভূমি। তবু তৃষার্ত জিহ্বায় লেহনের অনিঃশেষ ইচ্ছা। ক্রমশই বাড়ছে, বিস্তৃত হচ্ছে, বিকৃত ইচ্ছাই বিবৃত হচ্ছে!

কৃষ্ণ বুঝলেন, গরুড়ের ভয়ে পয়োধি ছেড়েছিল কালিয়। সে-ই বাস করছে এখানে। বিষিয়েছে যমুনার জল। পিপাসায় বুক ফাটছে। সামনে যমুনা। তবু কেউ যমুনার জল ছুঁতে পারেনা। যমুনার জলে মৃত্যুর জ্বালা।

কৃষ্ণ ঠিক করলেন বধ করতে হবে এই কালিয়কে। যমুনার জলে শান্তির আরাম আসবে, ব্রজের মানুষ ব্যবহার করবে, সুখ বাড়বে তাদের। কৃষ্ণের ভাল লাগল একথা ভাবতে।

কৃষ্ণ মানুষ হয়ে জন্মেছেন। এমনিতে তো নয়। অনেক বড় ইচ্ছা তাঁর। কল্যাণী ইচ্ছা। দুরাত্মার দমনেই কল্যাণ। কৃষ্ণের উদ্দেশ্য দমন। মনে উন্মেষ হল এই চেতনার। কাছেই কদমের গাছ। উঁচু আকাশ-ছোঁয়া গাছ। কদমের উঁচু ডাল থেকে এই কালিয় হ্রদের কালো জলে লাফিয়ে পড়বার কথা কৃষ্ণের মনে হল। কাপড়চোপড় কষে বাঁধলেন। তারপর এক মহাপতন। মহাবেগে সর্পরাজের হ্রদে লাফিয়ে পড়লেন কৃষ্ণ। জল আলোড়িত হল। কালিয় হ্রদের জল বিক্ষিপ্ত হল। বাতাস বইছিল। বাতাসে জল উড়ল। গাছের গায়ে সে জল লাগল। জল নয়, তরলিত আগুন। গাছগুলো জ্বলল দাউদাউ করে। আকাশ লাল হল, আকাশ জ্বলল, আকাশের নীল শরীর ঝলসে গেল।

কৃষ্ণ হাত ছুঁড়তে লাগলেন জলের মধ্যে। কল্লোলিত হল জল। কালিয় ধেয়ে এল। চোখে আগুনের ভয়ংকর লাল। অন্য অনেক নাগ এল। নাগ-পত্নীরা এসেছে। গলায় মনোহর হার, কম্পিত অঙ্গে যুদ্ধের চাঞ্চল্য, কুণ্ডলে কুণ্ডলে হ্রদের জল বিচিত্র দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হল।

শতসহস্র কুণ্ডলীতে কৃষ্ণ বন্দী হলেন। শতসহস্র দংশনে কৃষ্ণ কাতর হলেন। গোপেরা এল। কৃষ্ণকে দেখল। কৃষ্ণ কাতর, কৃষ্ণ নিপীড়িত, বিষের জ্বালায় মূর্চ্ছিত। গোপেরা চিৎকার করতে লাগল। আর্তনাদে আর্তনাদে উতলা হল গগন।

যশোদা শুনলেন। বাজ পড়ল তাঁর মাথায়। পা সরছে না তাঁর, সরে যদি হড়কে-যায়, বারবার হোঁচট লাগে। বিহ্বল হলেন যশোদা। হাহাকার করতে করতে যশোদা যমুনার কূলে এসে দাঁড়ালেন। নন্দ এলেন। যমুনার কূলে উঠে এল গোটা গোপপল্লী।

ফণায় ফণায় আবৃত কৃষ্ণ, বিষে বিষে জর্জরিত কৃষ্ণ, আচ্ছন্ন মূর্চ্ছিত কৃষ্ণ। সবাই দেখলেন। নন্দ, যশোদা যেন পাথর হয়ে গেছেন। গোপগোপীদের মনে ভয় বিস্ময়। আকাশে বাতাসে শুধু রোদন, শুধু হাহাস্বর।

সমস্ত গোপপল্লী কালিয় হ্রদে প্রবেশ করে বুক জুড়োতে চাইল। ব্রজে তারা ফিরবে না। সূর্য নেই, দিন দীনহীন অর্থহীন। চন্দ্র নেই, রাত কানা। বৃষবিহনে গাভী নিষ্ফল। কৃষ্ণই ব্রজের চন্দ্রসূর্য। সরোবরের অর্থ থাকে না যদি হয় জলশূন্য। ব্রজে বা অরণ্যে বাসও কৃষ্ণ বিনা নিতান্তই নিরর্থক।

কৃষ্ণের শেষ ঘনিয়ে এসেছে। গোপগোপীকে বুঝতে হল, কৃষ্ণ তাদের কতখানি ছিলেন। কৃষ্ণই তাদের জীবনের সর্বস্ব।

লক্ষ ফণায় আবৃত কৃষ্ণ। পদ্মের মত মুখখানি মাত্র ভাসছে। বিষেবিষে নীল, তবু স্মিত শোভায় সে মুখ জেগে রয়েছে সহস্র ফণার বিভীষিকার মধ্যে।

বলরামও এসেছেন। চতুর্দিকে শঙ্কার মহাসমুদ্র। নন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ়,

যশোদা অচেতন। বলরাম সঙ্কেতে বলতে থাকলেন কৃষ্ণকে ঃ তুমি দেবদেবেশ। তুমি অনন্ত। কিন্তু আত্মবিস্মৃত কি ? কেন এই মানুষী ভাব ? তুমিই জগতের কর্তা, অপহর্তা, পালনকর্তা। ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বী, বসু, আদিত্য, মরুৎ, অগ্নি, যোগী—সবার মনে তোমারই ধ্যান। পৃথিবীর ভার হরণের জন্য তোমার জন্ম। আমি তোমার অগ্রজ। তুমি লীলা করবে, দেবতারা অনুগামী হবেন তার, তাই তাঁদের জন্ম এই গোপপল্লীতে। গোপবেশে সুরগণ সমবেত হয়েছেন। এই মুহূর্তে তাঁরা বিষণ্ণ। গোপীর বেশে স্বর্গসুন্দরীরাও অবতীর্ণ। কিন্তু তাঁরাও বিষণ্ণ। তুমি দেখেও না দেখার ভান করছ, উপেক্ষা করছ। মানুষের ভাব দেখিয়েছ, ছেলেমানুষীও কম দেখানো হল না। কিন্তু আর নয়। দমন কর। বধ কর।

বলরাম স্মরণ করিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ জেগে উঠলেন। মুখে তাঁর হাসি।

কঠিন নাগপাশ। বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন কৃষ্ণ। দুই সবল বাহুর চাপে অবনত হল নাগরাজের মধ্যমফণা। কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন কালিয়ের মাথায়। কৃষ্ণ নৃত্য শুরু করলেন। প্রচণ্ড নৃত্য। তালে তালে ফেটে ফেটে পড়ল মহাবিক্রম। পরাক্রান্ত কৃষ্ণ। পরাক্রমে আক্রান্ত, বিধ্বস্ত কালিয়। ফণা আবৃত হল ব্রণকণ্টকে। কাতর কালিয়। এদিকে মাথা তুলতে চায়, প্রহার পড়ে, মাথা নত হয়। ওদিকে মাথা তুলতে চায়। প্রচণ্ড প্রহার। মাথা নত হয়। প্রহারে প্রহারে ক্লান্ত হল, জর্জরিত হয়ে মূর্চ্ছিত হল কালিয়। রক্তবমন হতে থাকল অবশেষে। ঘাড় ভাঙ্গল, মাথা পিষ্ট হল। রক্ত, প্রচুর রক্ত বমন হল। রক্তে রক্তে যমুনা লাল হল। যমুনা সজ্জা করেছে, পরনে লাল চেলি।

নাগপত্নীরা প্রমাদ গুনলো। হায় হায় করে উঠল। সামান্য নন কৃষ্ণ, অসামান্য। তারা বুঝল। শরণ নিল অসামান্যের। বলল ঃ বুঝেছি তুমিই তিনি। তাঁরই অংশ তুমি। যোগীরা পারেন না, দেবতারাও নন। আমরা তো সামান্য স্ত্রীলোক। আমরা কি করে পারব! কি করে বুঝব তোমাকে? কি বলেই বা বুঝাব ? পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর সামান্য এক অংশের কণা পরিমাণ সেই বিরাট বিশালকে কি করে আনব ধারণায় ? আমরা শুধু প্রণাম করি। যিনি সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম, স্থূল হতে স্থূল, সেই পরমকে আমরা প্রণাম করি। দ্বেষের বশে দমন করছ না নাগরাজকে, পৃথিবীর প্রয়োজন সিদ্ধ করছ। এ সব ঠিক। তবু স্ত্রী, মূঢ়, দীনের প্রতি সাধুদের অনন্ত কৃপা। তাই ক্ষমা কর এই দীনকে। তুমি জগতের আধার, আর এ নিতান্তই সর্প, নিতান্তই হীনবল। তোমার অনন্ত বিক্রমে মুহূর্তে এর প্রাণ নির্গত হবে। উৎকৃষ্টে দ্বেষ কর। অবসন্ন এই দীনের প্রতি প্রসন্ন হও। যায় যায় দশা নাগরাজের। ভিক্ষা দাও আমাদের, পতির প্রাণ মাত্র প্রার্থনা।

নাগরাজও অবসন্ন স্বরে আচ্ছন্নের মত বারবার বললেন ঃ হে দেবদেব

প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। তুমি পর হতে পরম। দেবতারা উৎপন্ন তোমার থেকে। ব্রহ্মাও জানেন না তোমার পরম অর্থ। তুমি সৎ, আবার তুমিই অসং। ইন্দ্রও জানেন না তোমার তত্ত্ব। পুজো করেন তাই অবতারসমূহের। আমি দীনহীন। তোমাকে পুজো করব, স্তবস্তুতি করব, সে ক্ষমতা আমার নেই! কৃপা কর, প্রসন্ন হও। সর্প অতি ক্রূর। আমার জন্ম এই কুলে। কিন্তু সে তোমারই ইচ্ছায়। আমার ক্রূর আচরণ, সেও তোমারই ইচ্ছা। অন্যতর আচরণে তোমাকেই অমান্য করা হত। কিন্তু তা করিনি। তথাপি দণ্ড দিয়েছ। তুমি দিয়েছ, তাই এ বর। আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়েছে, বিষ নষ্ট হয়েছে। আমি রিক্ত, অবসন্ন। বেঁচে আছি মাত্র। সর্বরিক্ত এই জীবনটাই ভিক্ষা চাই তোমার কাছে।

ভগবান কৃষ্ণ বললেন ঃ এখানে নয়, অন্যত্র গমন করে। যমুনায় নয়, সমুদ্রে। একা নয়, সপরিবারে। সেখানে নিরাপদে থাকবে। তোমার মাথায় অঙ্কিত হয়েছে আমার পায়ের চিহ্ন। গরুড় ক্লিষ্ট করবে না তোমাকে। কালিয় মুক্ত হল। কৃষ্ণকে প্রণাম করল। কালিয় যমুনা ছাড়ল। ভৃত্য অপত্য গেল, বন্ধু ও পত্নীবর্গও চলল। যমুনার জলে জলে জলতরঙ্গ বাজল।

যেন মৃত্যু হয়েছিল কৃষ্ণের, ফিরে এসেছেন। গোপগোপীর চোখে যমুনারই তরঙ্গ। সে তরঙ্গে অভিস্নাত হলেন কৃষ্ণ। স্তবে স্তবে আনন্দে গানে চলল অবিরাম অবিশ্রান্ত কৃষ্ণ-আরতি ॥

৪৫. তালবনে দৈত্য

তালবন। অতি রমণীয় বন। গাছে গাছে পাকা তালের মধুর স্বপ্ন।

রাম ও কৃষ্ণ বেরিয়েছেন মাঠে। সঙ্গে গোপগণ। মাঠে মাঠে চলে গোচারণ। গোরু চরে। পাশে পাশে চলে খেলা। কৃষ্ণ বলরাম একদিন এসে পড়লেন তালবনে। গাছে গাছে ভারে ভারে পাকা তাল। গন্ধে মাতাল বাতাস। লুব্ধ হল গোপগণ।

মহা এক দৈত্য থাকে এ বনে। দৈত্য ধেনুক। গাধার আকার। কাউকে ঢুকতে দেয় না এ বনে। গাছে গাছে ভারে ভারে তাই পাকা পাকা এত তাল।

লোভে মত্ত হল গোপগণ। রাম ও কৃষ্ণকে জানাল তাদের ইচ্ছে। তাল পাড়া হতে লাগল। রাম ও কৃষ্ণ তাল পাড়লেন। দুমদাম শব্দ হল। অনেক তাল, অনেক শব্দ। শব্দে শব্দে মুখরিত তালবন।

ক্রোধে উন্মত্ত হল ধেনুক। ছুটে এল। জোড়পায়ে আঘাত হানল বলরামের বুকে। বলরাম ধরে ফেললেন তার পা। শূন্যে বোঁ বোঁ করে ধেনুক ঘুরল।

দুহাতে ধরে প্রচণ্ড বেগে বলরাম ধেনুককে ঘুরালেন। ঘুরতে ঘুরতেই ধেনুকের প্রাণ নির্গত হল। অবশেষে দৈত্যের শরীরটাকে বলরাম ছুঁড়ে দিলেন তাল গাছের উপরে। ঘুরতে ঘুরতে ধেনুকের দেহ উঠল গাছের উপর। বিরাট শরীর, প্রচন্ড বেগে ছোঁড়া। তালের কাঁদিতে লেগে ধেনুকের শব পড়ল মাটিতে। তালও পড়ল অনেক। তালের হাট বসল। মজা বাড়ল গোপগণের।

ধেনুকের জ্ঞাতিগোষ্ঠী ছুটে এল। মজা বাড়ল আরও। কৃষ্ণ বলরাম এক-একটিকে ধরেন আর ছোঁড়েন। তাল পড়ে। ঢিলের মত ধরা আর ছোঁড়া। এই চলল কিছুক্ষণ ধরে। তালে তালে ছেয়ে গেল গাছের তলা। দৈত্যের শবে শবে ভরে গেল তালবন। তালের সৌরভ কান্তি, দৈত্যদের মৃতদেহ। তালবনের অঙ্গ ভরল জড়োয়া গয়নায়। রমণীয়তা বাড়ল তালবনের।

গোপালদের সঙ্গে সঙ্গে গোসমূহের আনন্দও বাড়ল। নতুন কিছু পেটে পড়ল তাদের।

ধেনুক নিহত। ভয় রইল না আর। গাভী চরল মনের আনন্দে। গোপ গোপী বিহার করল খেয়াল খুশিতে। মনোহর তালবন মনোরম হল ॥

৪৬. প্রলম্ববধ

ধেনুকাসুর বিনষ্ট। অতএব গোপচিত্ত আপাতত নিশ্চিত, আনন্দিত।

বটবৃক্ষ। নাম ভাণ্ডীর। কৃষ্ণ বলরাম এলেন। গোপরা এল। খেলা চলল। এক এক সময় এক এক খেলা, খেয়াল খেলা।

কৃষ্ণ বলরাম ফুল তোলেন। গাভীদের নাম ধরে ডাকেন। ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে চুর চুর হয়ে ভেঙ্গে পড়ে সে ডাক। বাতাসে ঢেউ। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নাচতে নাচতে সে ডাক দূরে, অনেক দূরে চলে যায়। কাঁধে ঝুলছে গোরুর দড়ি। গলায় বনফুলের মালা। বালবৃষভ, শৃঙ্গের উদ্‌গম হবে হবে, অপরূপ শোভা। কৃষ্ণবলরামে অনুরূপ সৌন্দর্য। পরনে তাঁদের সোনারঙের কালিরঙের বসন। বৃন্দাবনের আকাশে দুখানি মেঘ—সাদা আর কালো, বজ্রের বলে দুর্ধর্ষ।

ভগবান অবতীর্ণ। ভগবান কৃষ্ণ ও বলরাম। কিন্তু দশজনের খেলা দশজনের মতই তাঁরা খেললেন। ভগবানের মানুষী লীলা। মানুষের খেলা মানুষের মতই খেলতে থাকলেন কৃষ্ণ ও বলরাম। কখনো দোলনায় দোলেন, বাহুযুদ্ধ করেন, পাথর ছোঁড়েন। শতেক খেলা খেলেন কৃষ্ণ ও বলরাম।

এই খেলায় ভরা একটা দিনেই এসেছিল প্রলম্ব অসুর। অসুর বেশে নয়, এসেছিল গোপের সাজে। গোপেদের সঙ্গে মিশে গেল প্রলম্ব। খেলায় মেতে খেলতে খেলতেই ভুলিয়ে নিয়ে যাবে কৃষ্ণ ও বলরামকে।

প্রলম্ব মিশে গেল সবার মধ্যে। ভয় মানল না। নির্ভয়ে খেলতে থাকল। ফাঁক খুঁজতে থাকল। ফাঁক পেলেই প্রাণান্ত ঘটাবে কৃষ্ণ বলরামের। প্রলম্ব বুঝল কৃষ্ণ দুর্ধর্ষ। যার তার কর্ম নয় কৃষ্ণকে বাগে পাওয়া এবং এঁটে ওঠা। অতএব বলরামে মনোযোগী হল প্রলম্ব।

খেলা চলল। দুজনে দুজনে খেলা। লাফিয়ে লাফিয়ে চলল দুজন। লক্ষ্য হয়ত ভাণ্ডীর বৃক্ষ। একজন আগে পৌঁছল। জিতল সেই। যে হারল সে কাঁধে করে বইবে জেতাকে। ভাণ্ডীর থেকে এদিকে, এদিক থেকে ভাণ্ডীর পর্যন্ত বয়ে তবে তার ছুটি। ছোটদের ছোট খেলা, ছেলেখেলা। ছেলে খেলা করেন বালক কৃষ্ণ বলরাম। সঙ্গে আছে গোপগণ, ছদ্মবেশী অসুর প্রলম্ব।

কৃষ্ণ শ্রীদামকে পরাজিত করলেন। বলরাম পরাজিত করলেন প্রলম্বকে। কৃষ্ণের দল হারিয়ে দিল অন্য দলকে। এবার বিজেতাদের কাঁধে বইবার পালা। কাঁধে নিয়ে সবাই ছুটল, ভাণ্ডীর পর্যন্ত গিয়ে সবাই ফিরল। কিন্তু বলরামকে কাঁধে নিয়ে গোপবেশী প্রলম্ব ফিরল না। দ্রুত চলল, সচন্দ্র জলধয়ের মত চলল প্রলম্ব। কিন্তু ফিরল না।

প্রলম্বের তখনো গোপবেশ। বলরামের ভার অসহ্য হল তার। ছদ্মবেশ চলল না। গোপবেশ গেল, বর্ষার মেঘের মত বিরাট ভয়ঙ্কর আকার হল প্রলম্বের। মনে হল একটা বিরাট পোড়া পাহাড়। মালায় গয়নায় মুকুটে সেজেছে পাহাড়। শকটের চাকার মত গোলগোল ভয়ঙ্কর চোখ। সে চলছে, পৃথিবী কাঁপছে। বিরাট ভয়ঙ্কর চলমান এক পর্বত। বলরাম ভীত হলেন।

হ্রিয়মান বলরাম। কৃষ্ণকে ডেকে বলরাম বললেন, তিনি হ্রিয়মান। কি করবেন তিনি। দ্রুত দূরে গিয়ে পড়ছেন। ছুটছে দানব। কৃষ্ণ এখনো বলুন কি করতে হবে বলরামকে।

কৃষ্ণ হাসলেন। স্মিত হাসি। আলো ঝরানো হাসি। কৃষ্ণ বললেন বলরামকেঃ মানুষের মত কেন করছেন? নিজের আত্মাকে স্মরণ করুন। জগতের বীজেরও কারণ আপনি, কারণেরও কারণ। প্রলয়কালে একমাত্র আপনিই থাকেন। আমার ও আপনার জন্ম এমনিতে নয়। ভূমির ভার হরণের জন্যই আমাদের মর্তে অবতরণ। আকাশ আপনার মস্তক, আপনি জলময়। ক্ষিতি আপনার পদদ্বয়, বহ্নিই মুখ, চন্দ্র মন, বায়ু নিঃশ্বাস। চারদিক আপনার চার বাহু। সহস্র বক্তৃ আপনি, সহস্র প্রকার আপনার হস্ত, অঙ্ঘ্রি, শরীর। সহস্র ব্রহ্মার কারণ, সহস্র রূপে স্তুত আপনার দিব্য রূপ জানে না কেউ। অর্চনা করে অবতার রূপের। আপনি ধারণ করে আছেন, তাই ধরণী ধারণ করে আছেন চরাচরকে। আপনিই প্রলয় করেন, আপনিই সৃষ্টি করেন। আমি যে, আপনিও সে। বিশ্বকল্যাণে ভিন্ন দেহ। অতএব নিজেকে স্মরণ করুন। মানুষের ভাবেই বধ করুন এই দানব। বন্ধুবর্গের কল্যাণ হবে, জগৎ ভাসবে

মঙ্গল আলোয়।

বলরাম হাস্য করতে থাকলেন, প্রলম্বের কাঁধে বলরাম। বলরাম কুপিত হলেন। প্রলম্বের মাথায় মুঠি পাকিয়ে আঘাত করলেন। বজ্র লুকিয়ে ছিল মুঠিতে। প্রলম্বের বিরাট চাকার মত দুই চোখ ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। বমনে বমনে প্রচুর রক্ত উঠল। প্রলম্ব মাটিতে পড়ল। নিপাতিত নিহত হল প্রলম্ব।

বলরামের বলে মুগ্ধ বিস্মিত হল গোপগণ। তারা স্তব করল, গোকুলে ফিরিয়ে আনলো কৃষ্ণসঙ্গে বলরামকে ৷৷

৪৭. গিরিযজ্ঞ

বর্ষা গেল। শরৎ এল। সরোবরে সরোবরে সারে সারে পদ্ম হাসল। গৃহী যেমন নানাভাবে সংসারের তাপ তাপিত, খালে বিলে মাছেদের দশা হল তেমনতরই। বনে বনে মৌন ময়ূর। নাচ নয় আনন্দ নয়। অসার যেন সংসার। ময়ূরে যোগীর ভাব। জ্ঞানী যিনি, মমতা ত্যাগ করেন তিনি, ঘর ছাড়েন, সংসার ছাড়েন, বনবাসী হন। ঠিক এইরকমটিই যেন—আকাশ ছাড়ল—জলেভরা মেঘমালা। খরতর সূর্য। সরোবর শুকোতে থাকল। অনেকের উপর মমতা ছড়িয়ে দেহীগণের হৃদয় যেমন শুকোতে থাকে ঠিক তেমনি শুকোতে থাকল সরোবর। বিমল মনেই পড়ে জ্ঞানের আলো। শরতের জলও নির্মল স্বচ্ছ, এই জলই উদ্ভাসিত হয় পদ্মের হাসিতে। তারায় ভরা চাঁদে ধোয়া আকাশে বাঁধা পড়েছে যোগীর চিত্তসৌন্দর্য। জলাশয়ের জল ক্রমশই যেভাবে তীর ত্যাগ করে করে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে তাতে মনে হয় পণ্ডিত মানুষ ক্রমশ মনকে মমতাশূন্য করছেন। মহাযোগে মহাযোগী, ধীরে ধীরে যেমন নিশ্চল হয়, চিত্তসমুদ্র হল তেমনি—নিশ্চল, নির্বিকার। সবেতেই বিষ্ণু মনে যদি এই ভাব, মন তবে প্রসন্ন। শরৎ এসেছে। সমুদ্র জলাশয়ে এই প্রসন্নতা। শরৎ এসেছে, আকাশ নির্মল, যেন যোগের আগুনে দগ্ধ যোগীচিত্তের নির্মল দীপ্তি। সূর্যের সন্তাপ। শরৎ আকাশে চন্দ্র। সন্তাপহারী চন্দ্র। সুধাবর্ষী চন্দ্র। এই আকাশেরই তলায় দাঁড়িয়ে মনে আসে, সুমহান বিবেক কেমন করে পরাভূত করে অহংকারের দুঃখ। রেচক ও কুম্ভক অভ্যাসে প্রাণায়াম, তেমনি সরোবরের পরিপূর্তি যে জলে লোকের আয়ুবৃদ্ধি হয়েছিল যেন তাতে।

শরতের এমন একটি দিনে কৃষ্ণ এলেন ব্রজে। ব্রজবাসী মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। কৃষ্ণ দেখলেন। শুধোলেনঃ এ কোন ইন্দ্রযজ্ঞ যার জন্য আনন্দ এত? নন্দ বললেনঃ বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র। তিনিই মেঘদের পাঠান, বৃষ্টি হয়, শস্যে শস্যে পৃথিবী ভরে উঠে। আমরা বাঁচি, গাভীরা পুষ্ট হয়।

গাভীর পুষ্টিতেই দুগ্ধ। যেখানে বৃষ্টি সেখানেই সবুজের সমারোহ। যেখানে বৃষ্টি নেই, সেখানেই ধূধূ প্রান্তর। মহাক্ষুধা। বর্ষায় তাই রাজাপ্রজা ইন্দ্রপূজা করে। আমরাও করছি।

কৃষ্ণ ইন্দ্রকে রাগিয়ে দেবার জন্য বললেন ঃ আমরা বনচর, কৃষিও করি না, বাণিজ্যও করি না। গাভীগণই আমাদের দেবতা। আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি—চার প্রকারের বিদ্যা। বৃত্তিভেদে বার্তা তিন রকম—কৃষি বাণিজ্য ও পশুপালন। কৃষি কৃষকের, বাণিজ্য দোকানীর, আর আমাদের গাভীই আশ্রয়। যে বিদ্যায় আমাদের জীবনধারণ তাই আমাদের দেবতা, তার পূজাই আমরা করব, উচিতও বটে। পাওয়া হল একজনের কাছ থেকে, ভজনা করা হল অন্যের, এতে সমূহ অমঙ্গল। ইহকালে অমঙ্গল, পরকালে অমঙ্গল। কৃষি হয় ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রের সীমা ভূমি, ভূমির সীমা বন, বনের সীমা পর্বত। পর্বতই আমাদের গতি। যাদের চলা সীমাবদ্ধ তাদের থেকে স্বচ্ছন্দচারীর সুখ বহু বেশি। শোনা যায় এই সব পর্বত কামরূপী। রূপ ধরে নিজ নিজ সানুদেশে বিহার করেন। বনবাসীরা গিরিদেবতার কাছে অপরাধ করে, এবং তখনই সিংহ বা অন্য পশুর রূপ ধরে অপরাধীর হনন করেন এঁরা। তাই ইন্দ্রযজ্ঞ নয়, গিরিযজ্ঞ করুন। ইন্দ্রের পূজায় আমাদের লাভ কি? গাভী ও শৈলই আমাদের দেবতা। অতএব গিরিযজ্ঞ করুন, গোযজ্ঞ করুন। পবিত্র পশু বলি দিয়ে গিরিগোবর্ধনের পূজা করুন! দ্বিধা নয়, বিচার নয়। সমস্ত ব্রজ থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ করুন। ব্রাহ্মণ এবং যাচকদের ভোজন করান। গোবর্ধনের পূজা হোক, হোম হোক, ব্রাহ্মণভোজন হোক। শারদীয় ফুলে সাজিয়ে গোগণকে দেওয়া হোক যথেচ্ছ চরতে।

অবশেষে কৃষ্ণ বললেন ঃ আমার মত এই। আপনারা এ অনুযায়ী কাজ করলে গোবর্ধনের তৃপ্তি, গাভীগণের তৃপ্তি, এবং আমিও সম্প্রীত হব।

কৃষ্ণের কথায় প্রমুদিত হল সর্বজন। সাধু সাধু ধ্বনিতে বাতাস মুখরিত হল। নন্দ বললেন ঃ আমরা তাই করব। গিরিযজ্ঞই প্রবর্তিত হোক।

গিরিযজ্ঞ শুরু হল। দধি, পায়েস, মাংস ইত্যাদি নিবেদিত হল শৈলদেবতার উদ্দেশে। শত শত ব্রাহ্মণ পরিতৃপ্ত হলেন, শত শত অভ্যাগত পরিতুষ্ট হলেন। অর্চিত গাভীসমূহ শৈল প্রদক্ষিণ করল। মেঘের গর্জন যাদের কণ্ঠে সেই বৃষভগণও প্রদক্ষিণ করল।

গিরির চূড়ায় কৃষ্ণ। কৃষ্ণ প্রকাশিত হলেন অপরূপ মূর্তিতে। বললেন ঃ আমিই শৈল।

গোপেরা নৈবেদ্য নিবেদন করল। গোপেরা এক অপরূপ মূর্তির পূজা করল। কৃষ্ণও করলেন তাঁর দ্বিতীয় তনুকে। দেবতা বর দিলেন। অন্তর্হিত হল কৃষ্ণের মায়ারূপ॥

৪৮. গিরিগোবর্ধনধারী

ইন্দ্রযজ্ঞ হল না, হল গিরিযজ্ঞ, গোযজ্ঞ। রোষে আবিষ্ট হলেন ইন্দ্র।

মেঘের রাজা ইন্দ্র। ইন্দ্র আদেশ করলেন সংবর্তক মেঘমালাকেঃ আমার যজ্ঞ পণ্ড করেছে গোপেরা। কৃষ্ণ আছেন, তাই এত দর্প ওদের। অতএব মুষলধারে বর্ষণ কর। বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দাও গোপপল্লী। গাভীরা বিনষ্ট হোক। লেশমাত্র সংশয় নয়, দ্বিধা নয়—আমার আদেশ। যাও, বর্ষণ কর। আমি থাকব ঐরাবতে তোমাদের পাশে পাশে। সাহায্য করব বর্ষণে।

মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভরল বায়ুমণ্ডল। শুরু হল বর্ষণ। মেঘের বুক চিরে কেঁপে কেঁপে গেল লিকলিকে বিদ্যুতের চাবুক। যন্ত্রণায় ক্রোধে উন্মত্ত মেঘ। গর্জনে কম্পিত হল দিকবিদিক। বর্ষণ, বর্ষণ আর বর্ষণ। বর্ষণে বর্ষণে অন্ধকার হল, জলে জলে হল জলময়।

আকাশ নয়, সমুদ্র। উপুড় করে দেওয়া হয়েছে সমুদ্র। বৃষ্টির ধারায় ধারায় অবসন্ন গোগণ। জলে বাতাসে শরীরে ধরেছে তাদের কাঁপন। দুর্গতির সীমা রইল না। পালে পালে গোরু প্রাণত্যাগ করতে থাকল। কোলের উষ্ণ আশ্রয়েও বাঁচল না বাছুর। কত মারা পড়ল জলে বাতাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কাঁপতে থাকল কত শত। তাদের কাতরতায় 'ত্রাহি কৃষ্ণ, ত্রাহি কৃষ্ণ'—এই ধ্বনি।

জল, জল, শুধু জল, চারিদিকে জল। জল নয়, গোকুলের অশ্রু।

'বিচলিত হলেন কৃষ্ণ। বুঝলেন ইন্দ্ররোষ। যজ্ঞ বিনষ্ট। অতএব বইছে তরলিত ইন্দ্ররোষ। তিনি না রাখলে কে রাখবে গোকুলকে।

পর্বত ছত্র হল। কৃষ্ণের একহাতে গোবর্ধন পর্বত। গোপেরা দেখল পর্বত উৎপাটন করে এক হাতে অনায়াসে ছাতার মত ধরে আছেন কৃষ্ণ। গোপরা শুনল, কৃষ্ণ বলছেনঃ গিরিমূলের গর্তে প্রবেশ কর। পর্বত পড়বে না। অতএব ভয় রেখো না মনে। ভয় থেকে অভয় মাঝে প্রবেশ কর। নিস্তব্ধভাবে অবস্থান কর।

গাড়ি গাড়ি ভাণ্ড গোরুবাছুর সব কিছু নিয়ে গোপগোপী প্রবেশ করল সেই গহ্বরে। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রইলেন—নিশ্চল, নির্বিকার। বিস্ময়ে, বিস্ফারিত হর্ষে, উদ্ভাসিত প্রীতিতে বিস্তারিত শত শত নয়নের আলোয় অভিষিক্ত হতে হতে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইন্দ্র পাঠিয়েছেন। ইন্দ্রের আদেশ। মালায় মালায় মহা মহা মেঘ আচ্ছন্ন করে রাখল আকাশ। বর্ষণ করল মুষলধারে। গোকুলে দিনরাত এক হল। সাত রাত অবিশ্রাম চলল ইন্দ্রের রোষবর্ষণ।

কিন্তু ব্যর্থ হলেন ইন্দ্র। কৃষ্ণ শৈল ধারণ করে প্রতিহত করেছেন ইন্দ্রকে। মিথ্যে প্রমাণিত হল ইন্দ্রের পণ। অতএব আকাশের মঞ্চ থেকে মেঘের দল সরে এল নেপথ্যে।

গোপকুল নিষ্ক্রান্ত হল গিরিগহ্বর থেকে। আনন্দে ফিরে এল নিজ নিজ বাসে।

নিশ্চল কৃষ্ণ। নির্বিকার কৃষ্ণ। কৃষ্ণের মুখে ব্রজবাসীর শত শত বিস্ফারিত দৃষ্টি। নিশ্চিন্ত কৃষ্ণ। পুলকিত কৃষ্ণ। প্রয়োজন ফুরিয়েছে। যথাস্থানে তাই স্থাপিত হল গিরিগোবর্ধন॥

৪৭: কৃষ্ণ ও ইন্দ্র

পর্বতের ছত্রে প্রতিহত হল ইন্দ্রের রোষ। গোকুল বাঁচল। কৃষ্ণ বাঁচালেন।

কৃষ্ণকে দেখবেন, সাধ হল ইন্দ্রের। ঐরাবতে আরোহণ করে ইন্দ্র এলেন গোবর্ধন পর্বতে কৃষ্ণদর্শনে। ইন্দ্র দেখলেন কৃষ্ণকে। ইন্দ্র দেখলেন জগদীশ্বরকে। ইন্দ্র দেখলেন সেই মহান্ত পুরুষকে—গোপের বেশে গোরু চরিয়ে ফিরছেন। পাখা ছড়িয়ে ছায়া করে অদৃশ্যভাবে গরুড় রয়েছে তাঁর পাশে পাশে।

ঐরাবত থেকে নেমে এগিয়ে এলেন ইন্দ্র। প্রীতিতে ইন্দ্রের নয়ন বিস্ফারিত, ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসি। কৃষ্ণকে বললেনঃ আমি এসেছি, অন্য কিছু চিন্তা করে বসবেন না। চরাচরের আধার আপনি, পরমেশ্বর। বুঝেছি ভূভার হরণের জন্যই আপনার মর্ত্যাবতরণ। যজ্ঞভঙ্গ হল। রোষ করেছিলাম। মেঘেদের পাঠিয়েছিলাম। গোকুলের এত ক্লেশ সেই জন্যই। আপনি রক্ষা করেছেন। গোবর্ধন উৎপাটন করে আমাকে প্রতিহত করেছেন। আপনার এ অদ্ভুত কাজে আমি পরিতোষিত। হাতে ধারণ করেছেন পর্বত, গোকুল রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু দেবগণের প্রয়োজন সাধিত এতে। গোগণের কথায় আমার আসা। উপেন্দ্রত্বে বরণ করব আপনাকে। গোগণের ইন্দ্র, অতএব গোবিন্দ নাম হোক আপনার।

ঐরাবতের পিঠ থেকে ঘণ্টা নিলেন ইন্দ্র। পবিত্র জলে পূর্ণ করা হল ঘণ্টা। কৃষ্ণের অভিষেক হল। ইন্দ্র অভিষেক করলেন গোবিন্দকে। পুলকিত গোকুল। বসুন্ধরা সিক্ত হল গাভীদের দুগ্ধক্ষরণে।

ইন্দ্র বললেনঃ পৃথিবীর ভার হরণের জন্য আমার অংশ পৃথার গর্ভে জন্ম নিয়েছে। নাম তার অর্জুন। তাকে রক্ষা করবেন। অর্জুন সহায় হবে আপনার কাজে। অতএব তাকে রক্ষা করবেন।

কৃষ্ণ বললেনঃ অর্জুন জন্মেছেন, এ আমি জানি। যতদিন থাকব পৃথিবীতে ততদিন অর্জুনকে আমি পালন করব। যতদিন থাকব পৃথিবীতে ততদিন অর্জুনকে জয় করতে কেউই পারবে না। কংস, অরিষ্ট, কুবলয়াপীড়, কেশী, নরক—মহা মহা সব অসুর। এরা নিহত হলে বিরাট যুদ্ধ হবে। সেই যুদ্ধেই ভূভারহরণ করব। আমি আছি, অতএব অর্জুন কুশলে থাকবেন, আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন। আমি আছি, কোন শত্রুই অর্জুনের ক্ষতি করতে পারবে না। ভারত যুদ্ধ শেষ হবে। পঞ্চপাণ্ডবকে অক্ষত শরীরে সঁপে দেব কুন্তীর হাতে।

ইন্দ্র আলিঙ্গন করলেন কৃষ্ণকে। ঐরাবতে চেপে ইন্দ্র গেলেন স্বর্গে, গোপ-গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণ এলেন ব্রজে ॥

৫০. রাসলীলা

ইন্দ্র চলে গেলেন। গোপালরা এল কৃষ্ণের কাছে। অনায়াসে গিরি ধরেছিলেন কৃষ্ণ। রক্ষা পেয়েছিল গোকুল। গোপালরা বললঃ তুলনা হয় না আপনার শক্তির। এমন দিব্য কাজ, অথচ জন্ম এই নিন্দিত গোকুলে। কালিয়কে দমন করেছেন, প্রলম্বাসুরকে নিহত করেছেন। একের পর এক এই সব কাজে কেমন শঙ্কিত আমরা। আপনাকে ঠিক মানুষ বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। হরির দিব্যি করে বলতে পারি একথা। ব্রজের সকলেই আপনার উপর প্রীত। যে কাজ করেছেন, দেবতারা সবাই মিলেও তা পারতেন না। সামান্য বালক, নীচকুলে জন্ম, অথচ এইসব দিব্য কর্ম—যত ভাবছি ততই কেমন সব মনে হচ্ছে। দেবদানব গন্ধর্ব কি মানুষ যাই হোন, সে সব ভাবার দরকারই বা কি আমাদের। আপনি আমাদের বান্ধব, আপনাকে নমস্কার।

কৃষ্ণ মৌন রইলেন কিছুক্ষণ। প্রণয়কোপ সহকারে বললেনঃ আমার সঙ্গে তোমাদের এই বন্ধু সম্পর্ক। তোমরা লজ্জিত নও এতে। বরং প্রশংসাই করছ আমার। কাজেই ওসব বিচারে কি প্রয়োজন? যদি প্রীতি থাকে আমার উপর, তাহলে আত্মবন্ধু বলেই না হয় ভাবলে। আমি দেবতাও নই, গন্ধর্ব যক্ষ বা দানব কিছুই নই। তোমাদের মতই আমি জন্মেছি। অন্যরকম ভেবো না।

গোপেরা চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল বনে।

মেঘের নাম নেই আকাশে। চন্দ্র হাসছে আকাশে। কৃষ্ণ দেখলেন, পুলকিত হলেন। চারিদিকে পদ্ম ফুটেছে, মৌমাছি মত্ত গুঞ্জনে। বনে বনে নব নব আভরণ। আমোদিত বাতাস। কৃষ্ণ দেখলেন, চতুর্দিক রাগরমণীয়। কৃষ্ণ পুলকিত হলেন। অনুভব করলেন গোপীসঙ্গে রতির অভিলাষ।

কৃষ্ণ ও বলভদ্র। পদের রমণীয় বিন্যাস, মনোহারী গান। কৃষ্ণ ও বলভদ্র গাইলেন। নানা তন্ত্রীস্বরের সম্মিলন হল সে গানে। গানে ছড়াল সম্মোহন মন্ত্র। গান রমণীমোহন। গোপীরা আসা শুরু করল। যেখানে গান গোপীরা এল সেখানে, সেই কৃষ্ণের পাশে।

কোন গোপী ঐ গানের সঙ্গে লয় মিলিয়ে আস্তে আস্তে গাইতে থাকল। কেউ বা সুরে ডুবে গিয়ে কৃষ্ণে মজল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডেকে উঠল কেউ, লজ্জা পেল কোন গোপী, লজ্জা ভুলল, কৃষ্ণের পাশে এসে দাঁড়াল।

হৃদয় হরণ হয়েছে। বাইরে গুরুজন। যাবার পথ নেই। ঘরের মধ্যেই রইতে হল কাউকে। তবু কৃষ্ণ চিন্তা বাধা পেল না। চোখ মুদে কৃষ্ণের ভাবনাতেই তন্ময় হয়ে গেল।

কৃষ্ণ চিন্তায় মোক্ষ মিলল এক গোপকন্যার। কৃষ্ণ পরব্রহ্ম, জগতের কারণ। কৃষ্ণ চিন্তায় অশেষ আহ্লাদ হল গোপকন্যার। আহ্লাদ ভোগে পুণ্যক্ষয়। কৃষ্ণকে পেল না কাছে, তাই মহাদুঃখ। দুঃখ ভোগে পাপক্ষয়। পাপ নষ্ট হল, পুণ্যও হল। মোক্ষ মিলল।

চাঁদের আলোয় ধোয়া আকাশ। কৃষ্ণ রাস খেলবেন। গোপীরা কৃষ্ণকে ঘিরে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণ অন্যস্থানে গমন করলেন। গোপীদের হৃদয় উদ্বেল হল।

কৃষ্ণে মজেছে মন। কৃষ্ণ নেই কাছে। এক গোপী বলল ঃ আমিই কৃষ্ণ, দেখ, সবাই দেখ কি সুন্দর আমার চলন!

আর একজন বলল ঃ আমি কৃষ্ণ, শোন গান—কি চমৎকার গান!

কোন গোপী কৃষ্ণের লীলা নকল করল। তন্ময় সে। বাহু আস্ফোটন করে বলল ঃ আমি কৃষ্ণ। রে দুষ্ট কালিয়, তুই স্থির হ।

একজন বলল ঃ ভয় রেখো না কোন। আর বৃষ্টির ভয় নয়। আমি গোবর্ধন ধারণ করেছি।

ঃ বন্ধুগণ যেমন খুশি ঘোর ফের। ধেনুকাসুরকে নিক্ষেপ করেছি আমি।

কৃষ্ণকে অনুকরণ করল গোপীরা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ খেলল। কৃষ্ণ কথায় মাতল। রম্য বৃন্দাবন, রম্যা রমণী। বৃন্দাবনে পুলকের প্লাবন বইল। কিন্তু বুঝি বা রসভঙ্গ হল।

সুন্দরী, অতি সুন্দরী। রোমাঞ্চিত হল। চোখ মেলে চাইল মাটির দিকে। হয়ত চোখ নয়, দুটো পদ্ম ফুটেছে। সুন্দরী সখীদের ডেকে বলল ঃ দেখ দেখ, কৃষ্ণের পায়ের চিহ্ন, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আঁকা পায়ের ছাপ। কৃষ্ণ গেছেন এ পথে, লীলায় মেতে মজে পথ চলেছেন। আরো দেখ, কৃষ্ণের পাশে পাশে ছোট ছোট পা, কত নিবিড়! কৃষ্ণ গেছেন, সঙ্গে গেছেন কোন পুণ্যবতী। রসে মত্ত, আচ্ছন্ন। চলেছেনও সেইভাবে অলস পায়ে।

সবাই চলল, ধীরে ধীরে চলল। মাটির দিকে চোখ রেখে রেখে চলল।

পায়ের অগ্রভাগের চিহ্ন। কৃষ্ণ ফুল পেড়েছেন। হাত পাননি, টানটান হয়ে পায়ের আগায় ভর রেখে উঁচু হয়ে হাত বাড়িয়ে ফুল তুলেছেন কৃষ্ণ। আগের জন্মে কোন ভাগ্যবতী ফুলে ফুলে অর্চনা করেছিল বিষ্ণুর। কৃষ্ণ সাজিয়েছেন তাকে ফুলে মালায়। এই দেখ আভাস। এখানেই কৃষ্ণ সেই রমণীকে রেখে চলে গেছেন। কৃষ্ণ গেছেন, কৃষ্ণের পা, পিছে পিছে অন্য নারীর পা। নিতম্বের ভারে ধীরে ধীরে দুলে দুলে চলেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারেনি, পিছে পিছেও ঠিকমত নয়। তাই ত্বরা করেছে। দেখছ না পায়ের অগ্রভাগের ছাপ বেশি বসেছে মাটিতে। এখান থেকে কৃষ্ণ হাত ধরেছেন, হাত ধরে নিয়ে গেছেন কৃষ্ণ। দেখ কত এলোমেলো পড়েছে পা।

এই পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এনেছে, এখান থেকে ফিরেছে। ধীরে ধীরে ফিরে গেছে। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে পড়ে চলেছে। কৃষ্ণ ধরেছেন, আর ছেড়েছেন।

এখানে কোন গোপীকে অপেক্ষা করিয়েছেন। বসিয়ে রেখে চলে গেছেন। হয়ত বলেছেন, 'বস, আসছি। একটা অসুর থাকে এখানে। হনন করেই ফিরে আসছি। দেখছ না, পাগুলো কত তাড়াতাড়ি পড়েছে, কত বসে গেছে মাটিতে।

পদচিহ্ন ফুরিয়েছে এখানে। এখান থেকেই প্রবেশ করেছেন গহন বনে। আর এগিয়ো না। এখানটা আঁধার। পথ পায়নি চাঁদ।

দেখা মিলল না কৃষ্ণের। গোপীরা চলে অবসন্ন, হতাশায় অবসন্ন। বিষণ্ণ গোপীরা এসে দাঁড়াল যমুনার তীরে। যমুনার জল নাচছে না, চাঁদের হাসি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে যমুনার কালো জলে।

অবশেষে কৃষ্ণ এলেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে থাকল সবাই। যমুনায় জোয়ার এল যেন। মনে মনে হর্ষ উদ্বেল হল। উদ্বেলিত মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে ফেটে পড়তে চাইল।

কপালে কুঞ্চন, ভ্রূতে ভঙ্গী। কৃষ্ণের মুখে এসে পড়ল একজোড়া কালো ভ্রমর।

দেখেও না দেখার ভান করল একজন। চোখ মুদে কৃষ্ণভাবনায় যোগিনী হল সে।

কৃষ্ণ অনুনয় করলেন। ভোলাতে চেষ্টা করলেন। মধুর মধুর কথা বললেন কাউকে। কারোর দিকে চাইলেন ভ্রূর ভঙ্গী করে হাসি হাসি চোখে। কারো হাতে হাত মিলালেন।

প্রসন্ন হল গোপীরা। গোষ্ঠী বানিয়ে রাস খেলার মাততে চাইলেন কৃষ্ণ। কিন্তু সবাই কৃষ্ণের পাশে। পাশ ছাড়ে না কেউ। গোল হয়ে দাঁড়ায় না কেউ। হাতে হাতে ধরে এক এক করে সবাইকে দাঁড় করিয়ে দিলেন কৃষ্ণ। রাস শুরু হল। খেলায় খেলায় গোপীদের বলয়ের বোলে চারিপাশের বাতাস মুখর হল। গোপীরা গান করল। গানে গানে শরৎ ছবি হয়ে ফুটল, সুরে সুরে রেণু

ছড়াল।

কৃষ্ণ গাইলেন। শরতের চাঁদ নাচল, পদ্ম রোমাঞ্চিত হল, পদ্ম সরোবর পুলকে কাঁপল। সুরে সুরে ঢেউ উঠল, পড়ল, মাথায় মাথায় নৃত্য করল শরৎ —উঠল, পড়ল, ভাঙল, গড়িয়ে পড়ল।

গোপীরা গাইল। বারবার গাইল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, শুধু কৃষ্ণ। শত আবেগে সুরে কৃষ্ণ ভাসল, ভাসতে থাকল।

অবসন্ন হয়েছে হাত। কৃষ্ণের কাঁধে বিশ্রাম রচনা করল কেউ। গাইতে গাইতে দুবাহু বাড়িয়ে কৃষ্ণের গলা জড়িয়ে চুম্বন করল কেউ।

গোপীর গালে কৃষ্ণের হাতের ছোঁয়া। কৃষ্ণের হাতে স্বেদ, গোপীর গালে পুলক।

কৃষ্ণ গলা ছেড়ে গাইলেন। রাসের গান। গাইলেন কৃষ্ণ। গোপীরা কৃষ্ণের গলা ছাপিয়ে গাইল, সাধু সাধু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ চলেন। গোপীরা চলে পিছু পিছু। কৃষ্ণ ফেরেন। সামনে এসে দাঁড়ায় একে একে সব গোপী। গোপীদের কৃষ্ণভজনা চলল।

কৃষ্ণ খেলতে থাকলেন। মুহূর্তের বিরহ কোটি বৎসর মনে হতে থাকল গোপীদের। এমন খেলাই খেললেন কৃষ্ণ।

পিতার শাসন, ভ্রাতার বারণ, স্বামীর নিবারণ—কোন কিছুই মানল না গোপীরা। রতিপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া। নিত্য নিশীথে রমণ করতে থাকল কৃষ্ণ সঙ্গে।

কিশোর বয়স। বয়সকে সম্মানিত করলেন মধুসূদন। একে একে রমণে রমণে রজনী পোহাল।

কৃষ্ণই ঈশ্বর। সর্বভুতে তিনি। গোপীতে তিনি, তাদের স্বামীতে তিনি, সর্বত্র তিনি। বায়ুর মত কৃষ্ণে কৃষ্ণে ব্যাপ্ত সর্বত্র ॥

৫১০ অরিষ্টবধ

ঘোর হয়ে এসেছে সন্ধ্যা। কৃষ্ণ আছেন রাসে মেতে। লীলারসে বিভোর কৃষ্ণ।

আর্ত চিৎকার উঠল গোপপল্লী থেকে। পুরুষের গলায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ! নারী-কণ্ঠ চিরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ! অনেক গোপ ও অনেক গোপী। মিলিত একটা চিৎকার। ভয়বিহ্বল চিৎকার। চিৎকারে কৃষ্ণশরণ।

বিভোরতা গেল। সচকিত হলেন কৃষ্ণ। গাভীরা ত্রস্ত। অসুর এসেছে গোষ্ঠে। অরিষ্টাসুর। বিরাট বৃষভের আকার। জলভরা কালো মেঘের মত কালো বৃষ, অসুর। চোখাচোখা শিঙ। কপালে যেন দুটো সূর্য। ক্ষুরের

আঘাতে মাটি কাঁপছে, ধুলো উড়ছে। ভীষণ এক অসুর। জিহ্বা দিয়ে পেষণ করছে নিজের ওষ্ঠ। কোপে খাড়া লেজ। শক্ত আঁটোসাটো গাঁট্টাগোট্টা শরীর। অতি ভীষণ অসুর। পিঠে ককুদ নয়, মাংসের আস্ত একটা পাহাড়। গাভীরা ভীত, ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন। বিষ্ঠা ও মূত্রে লিপ্ত পৃষ্ঠ। লম্বা গলা, বিশাল মুখ, ললাটে ঘাঁটা। ভীষণ, অতি ভীষণ, ভয়ংকর অসুর। বনে বনে ঘোরে। গাভীদের গর্ভপাত ঘটায়। তপস্বীদের হত্যা করে।

অরিষ্টাসুর এসেছে গোষ্ঠে। ত্রস্ত সবাই। রসভঙ্গ হল কৃষ্ণের। আসতে হল। দেখতে হল। টেনে তুলতে হল গোকুলকে ভয়ের সমুদ্র থেকে।

হাতে তালি দিয়ে হুঙ্কার দিলেন গোবিন্দ। অরিষ্টাসুর এসে দাঁড়াল সম্মুখে। শিঙ উঁচিয়ে ছুটে এল অরিষ্ট। কৃষ্ণের পেট শিঙে ফেঁড়ে বেরিয়ে যেত দানব। কিন্তু স্তব্ধ হল তার গতি।

গিরি ধরেন হাতে। অনন্তবীর্য কৃষ্ণ। ধেয়ে আসছে দানব। কৃষ্ণ নড়লেন না। হাসলেন। অবজ্ঞায় ওষ্ঠ প্রসারিত হল কৃষ্ণের। অসুর স্তব্ধ হল। কৃষ্ণ তাকে ধরলেন। মকর যেমন ধরে কোন দুর্বল জীবকে, তেমনি কৃষ্ণ ধরলেন অরিষ্টাসুরকে।

শিঙ ধরে থামিয়েছেন দুরন্ত দানবকে। এবার কুক্ষিতে আঘাত করলেন জানু দিয়ে। শিঙ ধরেছেন। থামিয়েছেন। গলায় মোচড় দিতে থাকলেন। কাপড় নিঙড়ানোর মত অরিষ্টের গলা নিষ্পেষিত করতে থাকলেন দুর্ধর্ষ গোবিন্দ। শৃঙ্গ উৎপাটিত হল। তাই দিয়ে তাড়না করলেন কৃষ্ণ। সইল না দানবের, শোণিত বমন করে করে ক্লান্ত হল, অবসন্ন হল। অবশেষে এল মৃত্যু।

ইন্দ্র জম্ভাসুর নিহত করেছিলেন, দেবতারা স্তব করেছিলেন। যেমন দেবতারা করেছিলেন, গোপেরাও করল ঠিক তেমনটিই। স্তব করল কৃষ্ণকে গোবিন্দকে, জনার্দনকে ॥

৫২. কংসের পরিকল্পনা

নারদ এসেছেন কংসসভায়। সব বললেন নারদ। পরপর একেএকে কৃষ্ণের কর্ম বর্ণনা করলেন নারদ। অরিষ্ট, প্রলম্ব, ধেনুক—এরা নিহত হয়েছে কৃষ্ণের হাতে। কালিয় দমন করেছেন, গোবর্ধন ধারণ করেছেন কৃষ্ণ। বিনা ঝড়ে বৃক্ষপতন, পুতনার বিনাশ—এসবই কৃষ্ণের কীর্তি। নারদ কংসের কানে তুললেন এসব কথা। যশোদা ও দেবকীর সন্তান বদলের কথাও বাদ দিলেন না।

কংস শুনলেন, ক্রোধে জ্বললেন। এই মুহূর্তে বসুদেবকে অতি দুর্জন বলে মনে হল কংসের। যাদবসভায় গলা ছেড়ে গাল দিলেন বসুদেবকে। নিন্দাও করলেন চরম।

কংসের মনে চিন্তা ফিরছে—কি করা, কি করা। রাম ও কৃষ্ণ এখনো বালক, কম শক্তিসম্পন্ন। যৌবনে যেতে দেওয়া নয়, বধ করতে হবে তার আগেই। বিবেচনার কাজ হবে তাহলেই। যুবক হলেই হবে দুর্ধর্ষ। অতএব কালক্ষয় নয় একমুহূর্তও।

কংসের মনে পড়ল চাণূরের কথা, মুষ্টিকের কথা। পরাক্রান্ত দুই অনুচর। এদেরই সঙ্গে লড়িয়ে দিতে হবে দুই ভাইকে, কৃষ্ণকে আর বলরামকে।

ধনুর্যজ্ঞ করবেন, এই ছল খাড়া করে নিমন্ত্রণ করা হবে কৃষ্ণ বলরামকে। তারপর মল্লযুদ্ধ। চাণূর ও মুষ্টিকের মুষ্টাঘাতে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে কৃষ্ণ ও বলরামের।

গোকুলে যাবে অক্রূর। কংস অক্রূরকে পাঠাবেন। অক্রূর আনবেন দুই ভাইকে। কেশী দৈত্যের উপর আদেশ থাকবে। গোকুলেই কেশী নিহত করবে ওদের।

কংসের মনে নানা ছল নানা কৌশল। ভাবেন, কিংবা ওরা আসুক এখানে। আদেশ দেওয়া থাকবে হস্তী কুবলয়াপীড়কে। সেই শেষ করবে ওদের।

কৌশলের পর কৌশল, নানা কৌশলকথা মনে এল কংসের। অবশেষে অক্রূরকে বললেন: একটি কাজ করতে হবে আপনাকে। আমি প্রীত হব তাহলে।···রথে করে যান নন্দগোকুলে। সেখানে বাড়ছে বিষ্ণুর অংশ, বসুদেবের দুই পুত্র। ওদের নিয়ে আসুন এখানে। আগামী চতুর্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ হবে। মল্লযুদ্ধ হবে। চাণূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের যুদ্ধ। সবাই দেখবে। কিংবা কুবলয়াপীড় বিনাশ করবে ঐ দুই পাপাত্মাকে। আপনি যান। আগে এ দুটি, পরে বসুদেব, তারপরে পিতা উগ্রসেন—একে একে বধ করব সব। আমাকে বধ করতে চায়, ওদেরও ঐ গোপোদেরও শিক্ষা দেব, সমস্ত গোধন ও তাবৎ বিত্ত হরণ করব। সবাই আমার দোষ খোঁজে, দেখে। আপনিই শুধু দেখেন না। পরে একে একে সবাইকেই বধ করব আমি। রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। আমি আপনি মিলে শাসন করব। সুখে থাকব। গোকুলে যান। গোপেদের বলবেন, মাহিষ্যঘৃত ও দধি নিয়ে যেন শীঘ্র আসে এখানে।

কংসের আজ্ঞা পেলেন অক্রূর। তিনি খুশি হলেন। কাল যাব, কাল দেখব কৃষ্ণকে—মনে মনে এই ভাবনা। অক্রূর সাগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলেন কখন আসবে কাল, কখন দেখবেন কৃষ্ণকে!

কংসকে বললেন: তাই হবে॥

৫৩. কেশব

কৃষ্ণের বিনাশ চায় কংস, কৃষ্ণকে বিনষ্ট করবে বীর কেশী। মহা শক্তি, মহা দর্পে আত্মহারা তাই কেশী। কেশী এসেছে বৃন্দাবনে।

খুরে খুরে মাটি খুঁড়ল, কেশরের ঝাপটায় মেঘ কাঁপল। কেশী এসেছে বৃন্দাবনে।

প্রচণ্ড গতি, আক্রান্ত হল চন্দ্রের পথ সূর্যের পথ। গোপেরা অস্থির হল। উপদ্রব আর উপদ্রব।

অশ্ববেশে এসেছে দৈত্য কেশী। অশ্বের হ্রেষা ত্রস্ত করল গোকুলকে। গোপেরা ভয় পেল, গোপীরা কাঁপল। গোবিন্দের শরণ নিল।

কৃষ্ণ বলা শুরু করলেন। মেঘের গর্জন কৃষ্ণের কণ্ঠে। মেঘের গর্জন যেন অর্থময় হল ঃ কেশীকে ভয় করছ কেন? গোপকুলে জন্ম অথচ ভয়ে বিহ্বল! বীর্য সাহস লোপ পেল নাকি? সামান্য অশ্ব, তার হ্রেষায় কি এসে যায়? কি এর ক্ষমতা? দৈত্যরাও তো একে ঘাড়ে ধরে খাটিয়ে নেয়, বহন করায়। ভয় পাচ্ছ হ্রেষায়! ছি ছি।

কৃষ্ণ এবার কেশীর দিকে ঘুরে বললেন ঃ ব্যাটা দৈত্য, ঘোড়া সাজা হয়েছে, দুষ্টের সেরা। আয়, মহাদেব যেমন পূষার দাঁত উপড়ে নিয়েছিলেন আমিও তোর সব দাঁত ঠিক সেইভাবে খুলে নেব।

বাহু আস্ফোটন করলেন মধুসূদন। কেশীর সম্মুখে মূর্ত মৃত্যু। কেশী এগিয়ে এল। বিরাট হাঁ করে ছুটে এল কৃষ্ণের দিকে। বাহু প্রসারিত হল, কৃষ্ণের। কেশীর মুখে কৃষ্ণের বাহু, সবল শাবল। একখণ্ড সাদা মেঘ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, অবশেষে নিশ্চিহ্ন হল একেবারে। দাঁতের পর দাঁত উপড়ে ফেলতে লাগলেন কৃষ্ণ। রোগ হয়েছে—প্রথমে অবহেলা, তারপর শরীরের আশ্রয়ে বৃদ্ধি অবশেষে ঘনায় মৃত্যু। কৃষ্ণের বাহুও যেন বৃদ্ধি পেল কেশীর শরীরের আশ্রয়ে, সবল হল আরো। বিপাটিত হল ওষ্ঠ দ্বয়। রুধির বমন করল কেশী। চোখ গলেছে, বেরিয়ে ছাড়িয়ে পড়ল। পা ছুঁড়ল করেকবার, মূত্র ত্যাগ করল, তারপর ঘামে জবজবে হয়ে কেশী নেতিয়ে পড়ল একেবারে। দুভাগে ফেঁড়ে ফেলা ধরাশায়ী কেশী। মনে হল বাজে পোড়া দ্বিখণ্ডিত এক মহাবৃক্ষ মাটিতে পড়ে রয়েছে। করুণ বীভৎস। এক এক খণ্ডে রইল দুই পা, পিঠ, লেজের অর্ধেক, এক এক নাক কান চোখ।

গোপালরা নিশ্চিন্ত। অসীম স্বস্তিতে চোখ মুদে এল তাদের। কৃষ্ণ সহজ শিথিল করে দিয়েছেন শরীর। গোপালরা ঘিরে ধরল কৃষ্ণকে। হাসিহাসি কৃষ্ণের মুখ। গোপগোপী বিস্মিত, কৃষ্ণ-সংরাগে আবিষ্ট।

নারদ ছিলেন আকাশে অন্তরিত হয়ে। কেশী নিহত। নারদ পুলকিত। নারদ বলতে শুরু করলেন, আকাশ থেকে যেন হর্ষ বৃষ্টি হতে থাকল। অভিস্নাত হতে থাকলেন কৃষ্ণ।

ঃ হে জগন্নাথ, ধন্য আপনি, ধন্য আপনার বিক্রম। দেবতাদের কণ্ট দিত ক্লিণ্ট করত, সেই কেশীকে নিহত করেছেন। মনুষ্যে অশ্বে এমন যুদ্ধ আর হয়নি কোথাও। ছুটে এসেছিলাম দেখতে স্বর্গ থেকে। দেখলাম, পুলকে ভরল তনুমন। কত কি করলেন এ অবতারে! সবই আমাকে বিস্মিত করেছে, মুগ্ধ করেছে। কেশর নেড়ে আকাশে মুখ তুলে হ্রেষারব করত যখন কেশী তখন স্বয়ং ইন্দ্রও কেঁপে উঠতেন। আপনি তাকে বধ করেছেন। আজ থেকে কেশব নামে লোকখ্যাত হবেন আপনি। এখন চলি। আবার মিলব কংসের সঙ্গে আপনার যুদ্ধসময়ে। কংস নিহত হবে, তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিপাত যাবে। আপনি ভার হরণ করবেন পৃথিবীর। আমি দেখব। আপনার ইচ্ছায় রাজায় রাজায় কত যুদ্ধ হবে। আমি দেখব। এখন চলি। কত বড় কাজ হল দেবতাদের। দেবতারা সংকৃত হলেন আপনার কাজে। এখন চলি। আমি দেখব। লীলা দেখব। রস আস্বাদ করব ।।

৫৪. পুলকিত অক্রুর

অক্রুর চললেন। স্যন্দন ছুটল। পথ, মথুরা থেকে গোকুল।

পথে স্যন্দনে অক্রুর। পুলকের আবেশ অক্রুরের মনে। ভাবলেন, তিনি ধন্য। আপাতত তাঁর মত ধন্য আর কেউ নয়। চক্রীর মুখ দর্শন হবে, জন্ম সফল হবে। রাত্রি অবসান হয়েছে, অক্রুরের জীবনেও আজ প্রভাত, আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত প্রভাত। ভগবানের শ্রীমুখ দর্শন হবে, নয়ন সার্থক হবে। বিষ্ণুর সঙ্গে কথা হবে অক্রুরের, বাক্য সফল হবে। কল্পনায় যে মুখ ভাসে, ভাসিয়ে বিনষ্ট হয় পাপ, সেই পদ্মলোচন বিষ্ণুকে তিনি দেখবেন।

যে মুখ উৎস চার বেদ ও অখিল বেদাঙ্গের এবং সূর্যতেজের, সেই জ্যোতির্ময় মুখ দেখবেন অক্রুর। অক্রুর দেখবেন তাঁকে যিনি সব কিছুর আধার, যজ্ঞে যজ্ঞে নিত্য চলে যাঁর যজন, সেই পুরুষোত্তমকে।

একশো যজ্ঞে যজন করলেন বিষ্ণুর, দেবরাজ হলেন ইন্দ্র। আদি নেই, অন্ত নেই। ব্রহ্মা জানেন না, ইন্দ্র জানেন না, রুদ্র জানেন না—কেউ জানেন না যাঁর স্বরূপ সেই হরিকে আজ অক্রুর দেখবেন, স্পর্শ পাবেন। যিনি সব জানেন, যিনি সকলেরই আত্মা, যিনি জলে স্থলে সব কিছুতে সেই ভগবান আজ কথা বলবেন অক্রুরের সঙ্গে।

অজর অমর যিনি, অবতারে অবতারে অবতীর্ণ হন যিনি, জগন্নাথ অথচ স্বীয় ইচ্ছাপূরণের জন্য মনুষ্যজন্ম স্বীকার করেন, অব্যয় অথচ রূপ ধরেন খুশিমত, ধরাকে ধরে আছেন যিনি সেই বিষ্ণু আজ তাঁকে সম্বোধন করবেন। বলবেন, অক্রূর অক্রূর !

বিষ্ণু যদি হৃদয়ে, অবিদ্যার আঁধার যায় দূরে। তিনি যজ্ঞপুরুষ, বাসুদেব, তিনি বিষ্ণু। বারবার তাঁকে নমস্কার করেন অক্রূর। অক্রূর প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা করলেন সেই পরমের কল্যাণ প্রসন্নতা।

সূর্য তখনো আকাশে। অক্রূর পৌঁছুলেন গোকুলে।

গাভীদের দোহনস্থান। বৎসগণের মধ্যে কৃষ্ণ। অক্রূর দেখলেন, নীলকমলের হাসি ও কান্তি। সুন্দর চোখ, শ্রীবৎসচিহ্ন-আঁকা বিরাট বিশাল বুক, দীর্ঘ বাহু, উন্নত নাক, উন্নত ও রক্ত বর্ণ নখ, পীতবসনে বনফুলে সজ্জিত কৃষ্ণকে। কৃষ্ণের পিছনে বলভদ্র। অক্রূর দেখলেন। নীলবসনে শ্বেতকমলের অলংকারে ভূষিত বলভদ্র। হাতে আর্দ্রনীল লতা, উন্নত শরীর, উন্নত ও প্রশস্ত অংসদেশ, তার উপরে পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি পদ্ম। বলভদ্র দাঁড়িয়ে আছেন, মেঘে মেঘে ঘেরা এক পর্বত—দ্বিতীয় কৈলাস। কৃষ্ণ ও বলভদ্র দাঁড়িয়ে আছেন। অক্রূর দেখলেন। পুলকিত হলেন, রোমাঞ্চিত হলেন।

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ভগবান। এক দুই হয়ে আছেন। অক্রূর দেখলেন। নয়ন সফল হল, মন তৃপ্ত হল, ভরল। অক্রূর ভাবলেন, পরম কি প্রসন্ন হবেন, দেবেন অঙ্গসঙ্গ, সফল কি হবে তাঁর অঙ্গ ? পিঠে কি রাখবেন ঐ করকমল ? যে আঙ্গুলের ছোঁয়ায় মেলে কৈবল্য মিলবে কি তা ? ভাগ্য কি করেছেন অক্রূর ? বিদ্যুতের, অগ্নির, সূর্যের সম্মিলিত দীপ্তি ও প্রচণ্ডতায় ভীষণ যে অস্ত্র সেই চক্রক্ষেপে ইনিই নাশ করেন দৈত্য, হরণ করেন দৈত্যাঙ্গনাদের নয়নাঞ্জন। বিন্দুজলে বলিরাজা তুষ্ট করেছিলেন এঁকে। লাভ করেছিলেন অমেয় সুখ, মন্বন্তরব্যাপী দেবত্ব। শত্রুবিরহিত ত্রিদশাধিপত্য। মনে মনে নির্দোষ, কিন্তু কংসের পরিগ্রহ-প্রযুক্ত। অক্রূরের ভাগ্যে কি জুটবে ভগবানের হেলা ; যদি হয়, ধিক তবে জন্মে। তাই বা হবে কেন ? সকলের হৃদয়ভাবই তাঁর জানা। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, নির্মল সত্ত্বরাশিময়। অক্রূর যাবেন। কৃষ্ণ সন্নিধানে অক্রূর যাবেন। ভক্তিবিনত মনে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাবেন। কৃষ্ণ অবহেলা করবেন না। কখনোই না, কৃষ্ণ তা পারেন না।

কৃষ্ণ তা করেনও নি। অক্রূর গেলেন। প্রণাম করলেন। পরিচয় দিলেন। কৃষ্ণ স্পর্শ করলেন অক্রূরকে। ধ্বজবজ্র ও পদ্ম আঁকা হাতের স্পর্শ পেলেন অক্রূর, ধন্য হলেন। কৃষ্ণ আলিঙ্গন করলেন অক্রূরকে। অক্রূর কৃতার্থ হলেন ।।

৫৫. মথুরাযাত্রা

অক্রূর মথুরার খবর বললেন। রাম ও কৃষ্ণ বললেন গোকুলের কথা।

অক্রূর আপ্যায়িত হলেন। খাওয়াদাওয়া হল। নানা মধুর আলাপ বিনিময় হল। অক্রূর সব বললেন। দৌরাত্ম্য বেড়েছে কংসের। লাঞ্ছনার শেষ নেই বসুদেব ও দেবকীর। নিত্য নব ভর্ৎসনা। উগ্রসেনের প্রতিও কংসের ব্যবহার অতি উগ্র। অক্রূরের গোকুলে আসা কংসেরই নির্দেশে। এক এক করে কৃষ্ণ-বলরামকে অক্রূর সমস্ত বললেন।

কৃষ্ণ বললেনঃ সবই জানি। ভেবোনা, যাতে কাজ হবে তাইই আমি করব। ধরে নাও কংস নিহত। নিহত করেই রেখেছি। কাল তোমার সঙ্গে যাব। রামও যাবেন। গোপেরাও যাবে, বহু ধন নিয়েই যাবে। নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাও। তিন রাত্রির মধ্যেই সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত কংসকে বধ করব।

গোপেদের কাছেও সব কথা অক্রূর বললেন। তারপর রাত্রি যাপন করলেন নন্দগোপের বাড়ি। সঙ্গে রইলেন কৃষ্ণ এবং বলরামও। সুনিদ্রা হল অক্রূরের।

ভোর হল। কৃষ্ণ ও বলরাম তৈরি হলেন। সঙ্গে অক্রূর। কৃষ্ণ-বলরাম যাত্রা করলেন।

গোপীদের বুক শূন্য হল। দুচোখে জল টলটল করল। দীর্ঘশ্বাস পড়তে থাকল। শিথিল হয়ে পড়ল হাতের বলয়। গোপীরা বললঃ মথুরায় যাচ্ছেন, আর কেন ফিরবেন গোকুলে। মথুরা নগরে কত শত রমণী। তাদের আধো আধো মধুমধু আলাপেই তৃপ্ত হবেন মাধব। বাক্যে নিপুণা ওরা। শত শত নাগরীর বিলসিত আলাপে মাধব ভুলবেন। গ্রাম্যা গোপীদের ভুলবেন। বিধির চক্রান্ত, হরিকে হরণ করল। নির্মম বিধি। গোপীরা পথে বসল। নগরের মেয়ে, কত কি আছে ওদের। কথায় অভিনব কত ভাব, কত রস, চলনে নৃত্যের ছন্দ, চাহনিতে নিত্য ঝলে কত রঙ্গ বিদ্যুৎ। গ্রামের ছেলে কৃষ্ণ। নগরে যাবে। কত শত পাবে। কেন আর ফিরবে। অক্রূরই নষ্টের গোড়া। সব অক্রূরেরই প্রতারণা। ও কি জানেনা কৃষ্ণ আমাদের নয়নের মণি! ও কি বোঝে না নয়নের মণি দূরে যাওয়ার কি জ্বালা! অক্রূর জানে না, অক্রূর নৃশংস। রামের সঙ্গে কৃষ্ণ যাচ্ছেন। তোমরা ফেরাও।

তুমি বলছ বটে সখি, সামনে গুরুজন, এরকম করা ঠিক নয়। বিরহের আগুন নিয়ত দহন করছে। জুড়োতে পারবেন গুরুজন? পারবেন না।··· অবশেষে নন্দ যাচ্ছেন, অন্য গোপও চলল। কেউ কোন বারণ করছে না। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ মথুরাতেই চললেন। মথুরার মেয়েরা কি ভাগ্য করেই না জন্মেছে!

ধন্য হবে তারা। আজকের সকাল কত সুন্দর বলে মনে হবে তাদের কাছে। শতশত ভ্রমর পদ্মমধু পান করবে আজ। কৃষ্ণ যাবেন। পথে পথে শত শত রমণী তাঁকে দেখবে, নয়ন জুড়োবে; তাঁর অনুগমন করবে, পুলকিত হবে। মথুরার নয়নে নয়নে আজ মহোৎসব। না জানি রাতভর কি সুন্দর স্বপ্ন দেখে তারা জেগে উঠেছে এক সুন্দরতম সকালে। কৃষ্ণ যাবেন, তারা দেখবে, সুন্দর নয়নে নির্নিমেষ চাহনি মেলে তারা দেখবে। দয়া নেই বিধাতার। মমতা নেই। মহানিধি দেখিয়েই কেড়ে নিলেন আমাদের দৃষ্টি। হরি বাম হয়েছেন, তাই কি বলয় হল শিথিল? হেন দশা, অক্রূর দেখল, দেখেও বিচলিত হল না। ক্রূর, নিতান্তই ক্রূর এই অক্রূর। কত জোরে ছুটিয়ে দিয়েছে রথ। চাকায় অশ্বখুরে ধুলো উড়ছে। ধুলোর কুয়াশায় ঢাকা পড়েছেন কৃষ্ণ। দেখা যাচ্ছে না। রথ দেখা যাচ্ছে না। ধুলোও দেখা যাচ্ছে না। হাওয়ায় উড়ে চলেছে রথ। ব্রজ ছাড়ল। রথ ছুটল।

যমুনাতীরে মধ্যাহ্ন। কৃষ্ণের রথ এসে পেঁছুল। রথ থামালেন অক্রূর। বললেন ঃ আপনারা রথেই থাকুন। আহ্নিক সেরে আসি যমুনাজলে।

যমুনাজলে অক্রূর। স্নান সমাপন হল, আচমন করলেন, পরমব্রহ্মে তন্ময় হলেন। অক্রূরের চোখের সামনে ফুটে উঠল মহান এক ছবি। যমুনার জলে বলভদ্র। সহস্রফণার মণ্ডল। অপূর্ব শোভা। কুন্দশুভ্র অঙ্গ, পদ্মদলের মত দুচোখ মেলে বলভদ্র রয়েছেন যমুনার জলে। বাসুকি, রম্ভা, মহামহা সব সর্প রয়েছে ঘিরে। গন্ধর্বরা স্তব করছে। কৃষ্ণবাসে পদ্মরচিত অলংকারে সজ্জিত কুণ্ডলধারী বলভদ্র। তাঁরই সান্নিধ্যে কৃষ্ণ। অক্রূর দেখলেন। সে অঙ্গে মেঘের শ্যামসৌন্দর্য। টানা টানা চোখ, অস্ত্রের সজ্জা চারবাহুতে, পরনে পীতবাস, বুকে শ্রীবৎসচিহ্ন। কেয়ূরে ও মুকুটে, কমলকুণ্ডলে সজ্জিত কৃষ্ণমূর্তি। একখানি মেঘ, মেঘের বুকে বিদ্যুতের মালা, ইন্দ্রধনু। যমুনারই জলে সনন্দ প্রমুখ মুনিবা নাসিকাগ্রে দৃষ্টি সংবদ্ধ করে কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময়।

অক্রূর বিস্মিত হলেন। রথ ছেড়ে ওঁরা এখানে কি করে এলেন? অক্রূর কিছু বলতে চাইলেন। মুখ ফুটল না। বাক্য সরল না। কৃষ্ণের ইচ্ছায় স্তম্ভিত হয়েছে অক্রূরের বাক্‌শক্তি।

জল থেকে উঠে এলেন অক্রূর। রথ আছে, কৃষ্ণ ও বলভদ্র আছেন, যেমন ছিলেন তেমনি রয়েছেন। জলে নিমগ্ন হলেন অক্রূর। এবারও চোখের সামনে ভাসল আগের সেই দৃশ্য। অক্রূর স্তব করলেন ঃ এক হয়েও পাঁচ রূপে তুমি বিরাজ কর। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভেবে তোমাকে স্তব করছি, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি অবিকারী পরমব্রহ্ম। কল্পনা ছাড়া জ্ঞান হয় না। তাই কৃষ্ণ বিষ্ণু অচ্যুত নানা নামে তোমাকে ধ্যান করি, চেষ্টা করি অবধারণ করতে। বাসুদেবকে নমস্কার। সংকর্ষণরূপী তোমাকে নমস্কার।…

স্তব হল, ফুলে ধূপে পূজা হল। বিষয়চিন্তা রইল না মনে, ব্রহ্মে মগ্ন হলেন অক্রূর। সমাধি ভাঙ্গল। মনে কৃতার্থের পরিতৃপ্তি। অক্রূর এলেন রথের কাছে। রথে রাম ও কৃষ্ণ। যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। অক্রূর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ মেলে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণ বললেন ঃ দেখে মনে হচ্ছে যমুনাজলে আশ্চর্য কিছু দেখেছ।

অক্রূর বললেন ঃ যা দেখেছি সামনেও দেখছি তাই। আশ্চর্য জগৎ, আর তারই রূপ আপনাতে ও বলভদ্রে। কিন্তু আপাতত বিস্ময়ই থাকুক। এবার চলা যাক। আর নয়। কংসকে আমার ভয়। পরের অন্নে পালিত জীবন, ঘৃণা ধরে গেছে জন্মে।

রথ ছুটিয়ে দিলেন অক্রূর। বায়ুর বেগে বায়ু কেটে রথ ছুটল। মনে হল মুহূর্তে মথুরা এসে দাঁড়াবে সামনে।।

৫৬. সজ্জাগ্রহণ

রথ এল নগরীর দ্বারে। অক্রূর বললেন ঃ আপনারা বলশালী। এটুকু পদব্রজেই আসুন। রথ নিয়ে আমি নগরে প্রবেশ করি।

কৃষ্ণ ও বলরাম রথ থেকে অবতরণ করলেন। অক্রূর বললেন ঃ বসুদেবের ওখানে উঠবেন না। এমনিতেই অবধি নেই, আপনারা উঠলে একশেষ হবে লাঞ্ছনার।

রথ অদৃশ্য হল। রাজপথে এসে উঠলেন রাম ও কৃষ্ণ। মথুরার নরনারী উৎসুক হয়ে দেখল। ওঁদের চলনে বীরভাব, লীলায়িত ছন্দ। মনে হল রাজপথে দুই বালগজ। মথুরার রাজপথে রাম ও কৃষ্ণ। সম্মুখে এক রজক। রাম ও কৃষ্ণ বস্ত্র প্রার্থনা করলেন। রজক কংসের দাস। সে বিস্মিত হল, ক্রুদ্ধ হল। অবশেষে চিৎকার করে গালি দিল। কৃষ্ণ কুপিত হলেন। চড় মেরে মুণ্ড দিলেন খসিয়ে।

রজক নিহত। বস্ত্র নিলেন রাম ও কৃষ্ণ। রাম পরলেন পীতবাস, কৃষ্ণ সাজলেন নীলকাপড়ে। এবার চললেন মালাকারের বাড়ির দিকে। মালাকার অবাক হয়ে ভাবতে বসল, কে এঁরা, কারই বা পুত্র, কোত্থেকেই বা এসেছেন। একজন পীত আর একজন নীলবসনে সেজেছেন। দিব্য দেখতে। দুই দেবতা হয়ত নেমে এসেছেন পৃথিবীতে।

ওঁরা ফুল চাইলেন। মালাকার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল ওঁদের। বলল ঃ আপনারা এসেছেন আমার বাড়িতে সামান্য প্রার্থনা নিয়ে। আমি আজ ধন্য। পূজোর সুযোগ দিয়েছেন, জন্ম সার্থক তাই। মালাকার ফুল দিল। বেছে

বেছে ফুল দিল। 'এ ফুল সুন্দর, এটি নিন ; ওটি আরো সুন্দর, ওটিও নিন।' মালাকার ফুলে ফুলে সাজাল রাম ও কৃষ্ণকে। বারবার প্রণাম করল।

প্রসন্ন হলেন কৃষ্ণ। বললেন ঃ কোনদিনই তুমি শ্রীছাড়া হবে না।' বল ও ধনের কোনদিনই হানি হবে না তোমার। আকাশে যতদিন চন্দ্র ও সূর্য থাকবে ততদিন তোমার বংশও থাকবে। ইহলোকে বহু সুখ হবে, পরকালেও গতি হবে দিব্যলোকে। নিত্য ধর্মে থাকবে মতি, বংশধররা সবাই হবে উপসর্গমুক্ত দীর্ঘজীবী।

কৃষ্ণ ও বলরাম আবার এসে দাঁড়ালেন রাজপথে।

হাতে অনুলেপনের পাত্র। একনারী আসছে এগিয়ে। বয়সে সে যুবতী, কিন্তু কুব্জা।

মধুর স্বরে কৃষ্ণ তাকে ডাকলেন। শুধোলেন ঃ কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ এ অনুলেপন ?

কথার সুরে অনুরাগ ফুটল। আকৃষ্ট হল কুব্জা। তাকিয়ে দেখল হরির অশেষ রূপ। লাবণ্যের জোয়ার স্তম্ভিত যেন এক অঙ্গে।

কুব্জাও বলল অনুরাগভরে ঃ চেনেন নাকি আমাকে ? অনেকবক্রা নামে আমার খ্যাতি। কংসের অনুলেপনের ভার আমারই উপর। আমার অনুলেপনেই তাঁর একান্ত রুচি।

কৃষ্ণ বললেন ঃ রাজারই যোগ্য এ অনুলেপন। সুগন্ধ, মনোহর। আমাদের গায়েও মাখবার মত। অতএব কিছু দাও।

কুব্জা খুশি হল। দুজনের মত অনুলেপন দিল। কৃষ্ণ ও বলভদ্রের সুষমা বাড়ল। মনে হল আকাশে ইন্দ্রধনু-আঁকা দুখানি মেঘ। একখানিকালো, আর খানি সাদা।

যা বক্র তাকে সরল সুষমা দিতে পারেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ উল্লাপনবিধানবিৎ। দুপায়ে চেপে ধরলেন কুব্জার দুপা। চিবুক ধারণ করলেন মধ্যমাও তর্জনী দিয়ে। উপর দিকে চাপ দিলেন। কুব্জার দেহ হল সরল। রূপ ছিল, দেহ সরল হল। রূপ ও রাগে রমণীয় কুব্জা অনিন্দ্য হল।

প্রেমে ভরল কুব্জার অন্তর। লাস্যে আকর্ষণ করল কৃষ্ণের বস্ত্র। বলল ঃ আমার ওখানে চলুন।

হাসতে হাসতে কৃষ্ণ বললেন ঃ যাব, তবে কিছু পরে।

কুব্জা বিদায় হল। বলরামের মুখের দিকে চেয়ে জোরে হো হো শব্দে কৃষ্ণ হেসে উঠলেন।।

৫৭. কংসবধ

নীলবসনে পীতবসনে ফুলেমালায় চন্দনে অনুলেপনে সাজ করেছেন কৃষ্ণ, সাজ করেছেন বলরাম। অপরূপ অভিরাম।

ধনু শালায় এলেন। জ্যারোপণ করতে পারেনি কেউ। দিব্য ধনু। রক্ষীদের সুধোলেন, কোথায় সে ধনু। দেখিয়ে দিল তারা।

ধনুতে জ্যা রোপণ করলেন কৃষ্ণ। মহাধনু ভেঙ্গে গেল। মহাশব্দে মথুরা-নগরীর বাতাস ধ্বনিময় হল।

রক্ষীরা আক্রমণ করল, কিন্তু নির্মূল হল।

অক্রূর ফিরেছেন, কংস শুনেছেন। মথুরার বাতাসে সেই প্রচণ্ড গম্ভীর ধ্বনি উঠেছে, কংস বিচলিত হয়েছেন।

মুষ্টিক ও চাণূরকে কংস বললেনঃ গোকুল থেকে এসেছে। আমার মৃত্যু। অতএব, যদি পার কোন কিছুর অভাব হবে না তোমাদের, সব—সব পাবে। ন্যায় অন্যায় ভেদ মেনো না, যেভাবে পারলে বধ করবে। বধ কর, রাজ্যসুখ পাবে। ভোগে বিলাসে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ডুবিয়ে রাখব।

হস্তিপক এল। কংস আদেশ করলেনঃ সমাজদ্বারে কুবলয়াপীড়কে রাখ। তাকে দিয়েই হত্যা করাবে সেই দুই বালককে।

উপকল্পিত মঞ্চসমূহ অবলোকন করলেন কংস। তখনো অন্ধকার। কংস অপেক্ষা করলেন। প্রভাতের প্রতীক্ষায় তাঁর বিনিদ্র নয়ন কাতর হল।

সকাল হল। সাধারণ মঞ্চ ভরল। নাগরিকে নাগরিকে মঞ্চ পুরল। রাজমঞ্চে নৃপতিগণ, অমাত্যবর্গ। কংস এলেন। নিবেশিত করলেন পরীক্ষক। অতঃপর উন্নত মঞ্চ শোভিত হল কংসে।

মঞ্চ ছিল আরো। মঞ্চে মঞ্চে রাজ-অন্তঃপুরচারিণীবর্গ। মঞ্চে মঞ্চে বারবণিতার দল, মঞ্চে মঞ্চে নাগরিকামহল। নন্দগোপ ও অন্য গোপগণ এক মঞ্চে, অন্য মঞ্চে বসুদেব, অক্রূর ও অন্যান্যেরা। নাগরিকা মঞ্চে দেবকী। মৃত্যুসময়েও পুত্রের মুখ দেখবেন, মনে এই কামনা।

বাজনা বাজল, বাজতে থাকল। মানুষের সমুদ্র, শব্দের তরঙ্গ। তরঙ্গিত মহাসমুদ্র।

মল্লভূমিতে চাণূর, মুষ্টিক। হাবে ভাবে ওদের দর্প। বাহ্বাস্ফোটন করে দর্পিত দুই মল্ল। মঞ্চে মঞ্চে মনে মনে স্তম্ভিত আশংকা। চঞ্চল আশংকা। হাহাকার উঠে দিকে দিকে। সমুদ্রে ক্ষেপা তরঙ্গ—মাথা খুঁড়ছে, ফুলেফুলেও উঠছে।

হাতে রক্ত মাখা হাতির দাঁত। কুবলয়াপীড় হত। সর্বাঙ্গ মদ ও রক্তে

অনুলিপ্ত। চলনে গর্ব, লীলার ভাবও সামান্য। এদিকে চাইছেন, ওদিকে চাইছেন—হরিণের দলে যেন সিংহ। রঙ্গভূমিতে কৃষ্ণ এলেন, সঙ্গে বলভদ্র।

আকাশ ছোঁয়া তরঙ্গ উঠল। তট ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিতে চাইল চরাচর। মঞ্চে মঞ্চে কণ্ঠে কণ্ঠে হাহা ধ্বনি, বিস্ময়ঃ ইনি কৃষ্ণ, ইনিই বলভদ্র! ভাষা পেল বিস্ময়। স্রোত বইলঃ পূতনাকে বিনাশ করেছেন--সেই ভয়ংকরী নিশাচরীকে! শকট উলটেছেন, যমল ও অর্জুন ভগ্ন করেছেন। ইনিই সেই কৃষ্ণ! বাল্যে নৃত্যে নৃত্যে দমন করেছিলেন কালিয়কে। সাত রাত হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন গিরিগোবর্ধন। সেই কৃষ্ণ ইনি! অরিষ্ট মরেছে এঁরই হাতে, ধেনুক নিহত এঁরই দাপে, কেশী বিনষ্ট এঁরই প্রতাপে! দেখ, ইনিই সেই কৃষ্ণ। আর আগে আগে চলেছেন বলভদ্র, কৃষ্ণের অগ্রজ। অপরূপ কান্তি, যোষিদগণের নয়নমন পরিপূরিত হয় পুলকে। প্রাজ্ঞ যাঁরা তাঁরা বলেন, যাদব বংশ ডুবে গেছে, উদ্ধার করবেন বলভদ্র। বিষ্ণুর অংশে জন্ম। ভার হরণ করবেন পৃথিবীর।

দিকে দিকে রাম ও কৃষ্ণের নাম। কণ্ঠে কণ্ঠে রামগান, কৃষ্ণগান; রামকথা, কৃষ্ণকথা। নাম, গান, কথা।

দেবকী উদ্বেলিত। হৃদয়ে ঘুমন্ত স্নেহের সমুদ্র দামাল হয়েছে। স্তনপথে উদ্বেলিত সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত ফেণপুঞ্জ।

জরা গেল, যৌবন এল। বসুদেব যুবক হয়েছেন। পুত্রমুখ দেখেছেন। মহোৎসবের মাঝখানে বসুদেব। যৌবনমত্ততায় বসুদেব অদ্য উন্মত্ত।

শতসহস্র নারী দুচোখ মেলে চেয়ে রয়েছেন। তাঁদের চোখে কৃষ্ণ ও বলরাম। তাঁদের চোখে ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি বিস্মৃত হয়েছে তাঁদের চোখ।

কেউ বলল: চোখ লাল, হাতির সঙ্গে লড়ে ঘামে ভেজা মুখ। দেখ কৃষ্ণের মুখখানি, দেখ একবার।

কেউ বলল: নীহারজলে ভেজা প্রফুল্ল পঙ্কজও হার মানে। মুখখানি দেখ, নয়নমন সার্থক কর।

কেউ বলল: বিপক্ষ ক্ষপণ শ্রীবৎস আঁকা ঐ বিশাল বুক, ঐ দুই বাহু। কি সুন্দর!

কেউ বলল: বলভদ্রকে দেখছনা কেন? ঐ তো সামনে এসেছেন, নীল কাপড়ে সেজেছেন। মুখখানি কি সাদা, যেন কুন্দ ফুল, যেন ইন্দু, কিংবা মৃণাল।

কেউ বলল: মুষ্টিক ও চাণুর কেমন করে ঘুরছে দেখ। বড় দর্প যেন। বলভদ্রের দিকে চাইছে, হাসছে।

: ঐ দেখ চাণুর গেছে কৃষ্ণের কাছে। যুদ্ধ করবে। আচ্ছা উচিত অনুচিত বিচারের জন্য কি কেউ নেই? কোথায় কৃষ্ণ, যৌবনে পা দেনদেব, সুকুমারতনু,

আর কোথায় ঐ মত্তা অসুর, বজ্রের মত কঠিন যার বিশাল শরীর। এ যুদ্ধ আদপেই সমানে সমানে নয়। এক দিকে দুই বালক, অন্য দিকে দারুণ ও দুর্ধর্ষ দুই মল্ল। বিচারকরা কি করে মেনে নিল এ যুদ্ধ! বুদ্ধি লোপ পেল নাকি ওদের?

চারিদিকে নানা কথা। কৃষ্ণ-মাটিতে পা ঠুকে আস্ফালন করতে লাগলেন। বলভদ্রও আস্ফোটন করলেন, আস্ফালন করলেন। মনোহর, কিন্তু প্রচণ্ড। পৃথিবী বিদীর্ণও হতে পারত তাঁর পদভরে।

যুদ্ধ শুরু হল। কৃষ্ণ ও চাণূর। মুষ্টিক ও বলভদ্র।

যুদ্ধ চলল। আশ্লেষে উৎসারণে কৃষ্ণ যুদ্ধ করতে থাকলেন। ক্ষেপণে মুষ্টাঘাতে চাণূর দুর্বল হতে থাকল। কিল নয়, বজ্রের আঘাত; জানু নয়, পাথরের প্রহার। চাণূর দুর্বল হল। ক্ষণে বাহু বিঘট্টন ক্ষণে পাদদ্বারা ঊর্ধ্বক্ষেপণ ও প্রসারণ। যুদ্ধ চলল। শক্তিক্ষয় হতে থাকল মহামল্ল চাণূরের। কোপে খেদে কৃষ্ণের মাথার চুল কাঁপল। যত যুদ্ধ হতে থাকল কৃষ্ণের বল যেন তত বাড়তে থাকল। কংস ক্রুদ্ধ হলেন। তূর্যনিনাদ বন্ধ হল কংসের আদেশে। কংস বন্ধ করলেন। কিন্তু আকাশে বেজে উঠল দেবতাদের বিচিত্র তূর্য। আকাশে অদৃশ্য দেবমণ্ডলী। ওঁরা বলতে থাকলেন: হে গোবিন্দ হনন কর এই দানবকে। জয় হোক তোমার।

অনেকক্ষণ ধরে কৃষ্ণ চাণূরের সঙ্গে যেন খেলা করলেন। অবশেষে চাণূরকে শূন্যে তুলে ঘোরাতে লাগলেন। শতবার ঘোরালেন। চাণূরের প্রাণ নির্গত হল। নিস্পন্দ শরীরটাকে আছড়ে ফেললেন কৃষ্ণ। চাণূরের শরীর দীর্ণ হল। রক্তের স্রোত বইল। শতধারে বইল। রক্তে মাটিতে কাদা হল।

বলভদ্র যুদ্ধ করছেন মুষ্টিকের সঙ্গে। কৃষ্ণ যেমন করলেন চাণূরের সঙ্গে বলভদ্রও তেমনি করলেন মুষ্টিকের সঙ্গে। বলভদ্রের মুষ্টি পড়ল মুষ্টিকের মাথায়। বলভদ্রের জানুর আঘাত বজ্র হয়ে বাজল মুষ্টিকের বুকে। মুষ্টিক পড়ে গেল মাটিতে। মাটিতে মহামল্ল মুষ্টিক। বলভদ্র পেষণ করলেন। প্রচণ্ড পেষণ, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল মুষ্টিক। এগিয়ে এল আর এক মল্ল, দুর্ধর্ষ তোষালক। সেও নিহত হল। কৃষ্ণের বাঁ হাতের এক ঘুষিতেই প্রাণান্ত হল মহামল্লের। চাণূর চূর্ণ, মষ্টিক বিনষ্ট, তোষালক নাশপ্রাপ্ত। পলায়ন করল অন্য সব মল্ল।

বিজয়। আনন্দ। অতএব উৎসব। কৃষ্ণ নাচলেন। বলভদ্র নাচলেন। সমবয়সী গোপেদের টেনে নামালেন। মল্লভূমি নাচে রঙ্গে মুখর হল।

কংস অস্থির হলেন। কোপে কাঁপলেন। চোখ লাল হল। চিৎকারে ফেটে পড়ল আদেশ: বের করে দাও। এখুনি, এই মুহূর্তে। সবলে ও দুটোকে বের করে দাও এখান থেকে। লোহার শিকলে বাঁধো নন্দকে। বৃদ্ধের যোগ্য নয়

এমন সাজা দিয়ে বন্দী কর বসুদেবকে। ওরা নেচেছে, বধ কর ওদের। এদের গাভী, ধনসম্পত্তি সমস্ত কিছু লুণ্ঠন কর।

কৃষ্ণ হাস্য করলেন। লাফিয়ে উঠলেন মঞ্চে। চুল ধরে টেনে ঝটকায় পেড়ে ফেললেন কংসকে। কংসের উপরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণে পৃথিবীর ভার। নিষ্পেষিত হল কংস। কংসের শব কৃষ্ণ টেনে নিয়ে এলেন রঙ্গভূমিতে। চুল ধরে টেনে আনলেন বিশাল সেই দেহ। প্রচণ্ড আকর্ষণ, বিপুল দেহভার। মনে হল ক্ষেপা জোয়ার। রঙ্গভূমিতে নির্মিত হল প্রকাণ্ড এক পরিখা। কংসের ভাই সুমালী। সে এল ধেয়ে। বলভদ্র বিনাশ করলেন তাকে।

মঞ্চে মঞ্চে হাহাকার রব উঠল। বসুদেব ও দেবকীর মহাভাগ্য। পদমূলে তাঁদের কৃষ্ণ ও বলভদ্র। বসুদেবের ও দেবকীর মনে ধীরে ধীরে ছবি হয়ে ভাসল আগের জন্মের নানা বৃত্তান্ত। কৃষ্ণ-বলরামকে ওঁরা হাত ধরে উঠালেন। প্রণাম করলেন। বসুদেব বলতে থাকলেন। প্রীত, মুগ্ধ, আবিষ্ট বসুদেব বলে চললেনঃ প্রসন্ন হয়ে উদ্ধার করেছ। প্রসন্ন হয়ে আমার ঘরে জন্ম নিয়েছ। আমার কুল পবিত্র হয়েছে। তোমাতেই সবের শেষ, অথচ সবেতেই তুমি। যজ্ঞে যজ্ঞে তোমার যজন, তুমি যজ্ঞস্বরূপ, আবার তুমিই যজ্ঞের স্রষ্টা। মন বলছে তুমি আমাদের তনয়। কিন্তু তা নিতান্তই ভ্রান্ত। সর্বভূতের কর্তা অনাদি-নিধন তুমিই বা কোথায়, আর কোথায় আমাদের জিহ্বা যার দ্বারা উচ্চারণ করব তোমাকে পুত্র বলে। যাঁতে জগতের প্রতিষ্ঠা, তিনি কেন জন্ম নেবেন জঠরে? তুমি পুত্র নও আমাদের, মিথ্যে বিমোহিত করছ। অন্ধকারে ছিলাম, তাই পুত্র ভেবেছি তোমাকে, তাই কংসের ভয়, তাই গোকুলে রেখেছিলাম তোমাকে। দেবতাদেরও অসাধ্য যা, তুমি তা-ই করেছ। দুচোখ বিস্ফারিত করে আজ তা দেখেছি। মোহ নাশ হয়েছে। তুমিই বিষ্ণু। জগতে অবতীর্ণ হয়েছে জগতেরই হিতার্থে।।

৫৮. সুধর্মা

দেবকী মোহমুক্ত। বসুদেব বিজ্ঞানলাভ করেছেন। যদুমণ্ডলীকে মুগ্ধ করতে হবে। বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করলেন ভগবান শ্রীহরি।

বসুদেব ও দেবকীকে কৃষ্ণ বললেনঃ কংসের ভয়ে বহুকাল কেটেছে আমাদের। ভাগ্য প্রসন্ন। আজ আমি ধন্য, বলভদ্র ধন্য। দেখা মিলেছে আপনাদের দুজনেরই। পিতামাতাকে পূজা করতে পারিনি। জীবনের একটা বড় অধ্যায়ই বিফলে গেল আমাদের। যারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন, পিতামাতাকে পূজা নিবেদন করতে পারে তাদেরই জন্ম সার্থক, জীবন সফল।

কিন্তু আমরা পারিনি। পারিনি কংসের ভয়ে। পরাক্রমী কংস, দুর্ধর্ষ কংস। ভীতি অতিক্রম করতে পারিনি। ব্যতিক্রম ঘটিয়েছি। মার্জনা চাই তাই।

কৃষ্ণ ও বলরাম প্রণাম করলেন দেবকী ও বসুদেবকে। পুত্র পূজা করল পিতামাতাকে। গুরুজনেরা সম্মানিত হলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম পূজা করলেন যদুবৃদ্ধদের।

কংসের মৃতদেহের চতুর্দিকে শোকের গাঢ় অন্ধকার থম থম করছিল। পত্নী ও মাতাদের বিলাপে বিলাপে অন্ধকার গাঢ়, ঘন, আরো ঘন হচ্ছিল। কৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন। অনুতাপে আতুর, চোখে টলটল করছে জল। কৃষ্ণ সান্ত্বনা দিলেন, আশ্বাস দিলেন।

বন্দী উগ্রসেন মুক্ত হলেন। অভিষিক্ত হলেন নিজের সিংহাসনে।

উগ্রসেন পুত্র ও অন্যান্য মৃতের প্রেতক্রিয়া সমাধা করলেন।

সিংহাসনে উগ্রসেন। কৃষ্ণ বললেনঃ আদেশ করুন কি করতে হবে আমাকে। শঙ্কা নয়, দ্বিধা নয়—আপনি আদেশ করুন। যদুবংশে যযাতির শাপ। যদুবংশ রাজ্যের যোগ্য নয়। কিন্তু আমি আছি। আপনি আদেশ করুন। দেবগণ পালন করবেন, রাজারা তো করবেনই।

কৃষ্ণ স্মরণ করলেন বায়ুকে। বায়ু এলেন। কৃষ্ণ বললেনঃ ইন্দ্রের কাছে যাও। গিয়ে বল, গর্বে কি প্রয়োজন তাঁর। মণিরত্নখচিত সভাগৃহ সুধর্মা। ওটি দাও নৃপতি উগ্রসেনকে। রাজার যোগ্য এ সভাগৃহ। যদুদের বসাই সাজে। বল, আমার আদেশ।

বায়ু নিবেদন করলেন ইন্দ্রকে। কৃষ্ণের আদেশ। ইন্দ্র সম্মত হলেন। বায়ু বহন করে আনলেন সেই দিব্যসভা। শোভা পেলেন উগ্রসেন। দিব্যসভায় দিব্যশোভা।।

৫৯. পাঞ্চজন্য

জানতে কিছু বাকি নেই কৃষ্ণ ও বলরামের। সব জানেন। সমস্ত জ্ঞান ওঁদের মধ্যে। তবু আচার্যের কাছে এলেন। শিক্ষাগ্রহণ সঙ্গত, মানুষের কর্তব্য। এটি প্রতিপন্ন করতে হবে। অতএব কৃষ্ণ ও বলরাম এলেন অবন্তীপুরে। কাশ্য সান্দীপনি থাকেন এখানেই। গুরু সান্দীপনি। শিষ্য রাম ও কৃষ্ণ। গুরুর কাছে এসেছেন গুরুরও গুরু। অস্ত্রবিদ্যা শিখবেন। কৃষ্ণ ও বলরাম আদর্শ শিষ্য। আচারে ব্যবহারে সেবায় পরিচর্যায় ওঁরা শেখালেন আর এক বিদ্যা। গুরুর প্রতি শিষ্য কেমন অনুগত থাকবে, কেমন শিখবে—মানুষকে ওঁরা শেখালেন এই আর এক বিদ্যা।

সান্দীপনি অস্ত্রবিদ্যা শেখালেন রাম ও কৃষ্ণকে। চৌষট্টি দিনেই ওঁরা আয়ত্ত করলেন সমগ্র ধনুর্বেদ। অবাক মানলেন সান্দীপনি। মনে মনে মানলেন, মানুষে পারে না যা এরা পেরেছে তা। মানুষ নয়, মানুষের বেশে চন্দ্র ও সূর্য। এসেছেন তাঁরই গৃহে।

সান্দীপনি বলেন, ওঁদের শেখা সাঙ্গ হয় সঙ্গে সঙ্গে। শিক্ষা সমাপ্ত হল কৃষ্ণ ও বলরামের। ওঁরা বললেন ঃ প্রার্থনা করুন, নিবেদন করি গুরুদক্ষিণা।

মহামতি সান্দীপনি। বুঝেছেন, অনেক কিছুই সম্ভব এঁদের পক্ষে। বললেন ঃ প্রভাসতীর্থে মৃত্যু হয়েছে আমার পুত্রের। জীবিত অবস্থায় তাকে এনে দাও।

সশস্ত্র কৃষ্ণ ও বলরাম। এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রতটে। সমুদ্র রূপ ধরে উঠে এলেন। হাতে ধরা অর্ঘ্যপাত্র। বললেন ঃ সান্দীপনির পুত্রকে আমি হরণ করিনি। করেছে পঞ্চজন। শঙ্খরূপী সেই মহাদৈত্য আমার জলমধ্যেই বাস করছে। তাকে শাসন করুন।

কৃষ্ণ প্রবেশ করলেন সমুদ্রতলে। সাক্ষাৎ মিলল পঞ্চজনের। নিহত করলেন সেই অসুরকে।

পঞ্চজনের অস্থিতে নির্মিত হল এক মহাশঙ্খ। কৃষ্ণের হাতে এই মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য। পাঞ্চজন্য বাজে, দৈত্যরা দুর্বল হয়। পাঞ্চজন্য বাজে, দেবতাদের তেজ দুঃসহ হয়। পাঞ্চজন্য বাজে, অধর্ম মুখ লুকায়, বিনষ্ট হয়।

পাঞ্চজন্য বাজিয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম চললেন যমপুরীতে। বৈবস্বত যমকে জয় করলেন। ফিরে পেলেন সান্দীপনির পুত্রকে।

গুরুদক্ষিণা নিবেদিত হল সান্দীপনির শ্রীচরণে।।

৬০. জরাসন্ধ

অস্তি ও প্রাপ্তি—কংসের দুই পত্নী, জরাসন্ধের কন্যা। কংস নিহত। জরাসন্ধ উত্তেজিত।

কৃষ্ণকে হনন করবেন মগধের অধিপতি জরাসন্ধ। শক্তিশালী জরাসন্ধ। বিশাল বাহিনী সাজল। তেইশ অক্ষৌহিনী সৈন্য যুদ্ধযাত্রা করল।

জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করলেন।

সামান্য সৈন্য নিলেন সঙ্গে। কৃষ্ণ ও বলরাম নিষ্ক্রান্ত হলেন মথুরা থেকে। যুদ্ধ শুরু হল। একদিকে বিশাল বাহিনী; অন্যদিকে সামান্য সংখ্যক সৈন্য, রাম কৃষ্ণ।

অস্ত্র পুরাতন হয়েছিল। সংকল্প করলেন রাম ও কৃষ্ণ। আকাশ থেকে

এলে শার্ঙ্গ, অক্ষয়সায়ক দুই তূণ, কৌমোদকী গদা। কৃষ্ণ সজ্জিত হলেন নতু অস্ত্রে। বলভদ্রের হাতে এসে নিশ্চল হল সৌনন্দ মুষল। বলভদ্র প্রস্তুত হলেন

জরাসন্ধ পরাজিত হলেন, পলায়ন করলেন। কৃষ্ণ ও রাম প্রবেশ করলে মথুরায়।

জরাসন্ধ পলায়িত, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে পরাজিত বলে মনে করলেন না। ভাবনা সত্য হল। জরাসন্ধ আবার আক্রমণ করলেন। নবসাজে সেজে নতু করে আক্রমণ করলেন। এবারও জরাসন্ধের পরাজয় ও পলায়ন।

আঠারোবার জরাসন্ধ আক্রমণ করেন। প্রতিবারই তাঁর বাহিনী কৃষ্ণ-বলরা ও স্বল্প সংখ্যক যাদবসৈন্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছে, অবশেষে পলায় করেছে।

বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ। তিনি আছেন সাথে, যাদবরা অনুভব করেছে বহু বল। সর্বশক্তিমান তিনি। তবু মানুষের লীলা।. তাই শত্রুর সঙ্গে মানুষে মত যুদ্ধ। তাঁরই লীলা। ইচ্ছামাত্রেই জগতের সৃষ্টি হতে পারে, সংহার হ পারে, তবু শত্রুনিধনে তাঁকে উদ্যমী হতে হয়। মানুষ হয়ে দেহ ধরেছেন তাই আচারে মানুষের ভাব। তাই প্রয়োজনে কখনো যুদ্ধ, কখনো সন্ধি কখনো পলায়ন।

অসীম শক্তি। কিন্তু সংহত তার প্রকাশ ও প্রয়োগ। যেমন করে মানু তেমনটিই করে চলেন কৃষ্ণ ও বলরাম। লীলা করতে ভালবাসেন। তাই লঙ্ঘ করেন না মানুষের ধর্ম॥

৬১. কালযবন, কৃষ্ণ ও মুচুকুন্দ

গোষ্ঠে সমবেত যাদবগণ। গার্গ্য আছেন, তাঁর শ্যালকও আছে। শ্যালক উপহাস করল গার্গ্যকে। বলল: নপুংসক তুমি।

হাসিতে ফেটে পড়ল যাদবরা।

গার্গ্যের বাজল। কুপিত হলেন তিনি। চলে এলেন দক্ষিণ সমুদ্রে তীরে। তপস্যা শুরু হল। পুত্র চাই, তাই তপস্যা। যাদবরা ভয়ে মরবে এমন ভয়ংকর পুত্র চাই।

গার্গ্য মহাদেবের তপস্যায় একাগ্র হলেন। লোহার গুঁড়ো খান, আর তপস্যা করেন। বারো বছর উত্তীর্ণ হল। মহাদেব এলেন। বর দিলেন গার্গ্যকে।

যবনদের রাজা এলেন গার্গ্যের কাছে। অপুত্রক তিনি। সম্মান করে গার্গ্যকে নিয়ে এলেন নিজের প্রাসাদে। গার্গ্য কৃপা করলেন। পুত্র হল

তাঁর। ভয়ানক পুত্র। ভ্রমরের মতো কালো রঙ, বজ্রের মতো কঠিন বুক। কালযবন।

যবনরাজ বনবাসী হলেন। সিংহাসনে অভিষিক্ত করে গেলেন কালযবনকে।

বীর্যবান কালযবন। বীর্যের দর্পে উন্মত্ত কালযবন। যুদ্ধ চাই। বীর্য প্রতিপন্ন করতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত নৃপতি বশ মানবে। নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন দুর্ধর্ষ রাজাদের নাম। নারদ বললেন। যাদব নৃপতিদের কথা কীর্তন করলেন।

কালযবন প্রস্তুত হল। যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ। সহস্র সহস্র কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্য সাজল। বহু রথ, বহুতর অশ্বহস্তী। বিরাট বিশাল এক সমাবেশ।

কালযবন যাত্রা করল। থামল না। শুধু চলল। দিন নেই রাত্তির নেই, বিরাট বাহিনী অগ্রসর হল। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। অশ্ব ক্লান্ত হয়, হস্তী শ্রান্ত হয়। কিন্তু বিশ্রাম নয়, বাহনবদল।

কালযবন এসে গেল মথুরার দ্বারে। কৃষ্ণ চিন্তিত। এক দিকে জরাসন্ধ, কালযবন—বিরাট ম্লেচ্ছবাহিনী। যুদ্ধে হীনবল হবে যাদবগণ। জরাসন্ধের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে না। জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্বল হবে যাদব-বাহিনী। কালযবনের হাতে মার খেতে হবে পড়ে পড়ে। কৃষ্ণ দেখলেন, সম্মুখে যেন ঝুলছে পরাজয়ের ফাঁস।

উপায় চিন্তা করতে থাকলেন কৃষ্ণ। ভাবলেন, এমন এক দুর্গ নির্মাণ করতে হবে যে দুর্গের আশ্রয়ে নারীরাও পারবে যুদ্ধ করতে। যারা মহা মহা বীর তারা হবে আরো দুর্ধর্ষ। কোন সময়ে হয়ত তিনি মত্ত, প্রমত্তও থাকতে পারেন কোন সময়ে। সুপ্ত থাকতে পারেন, প্রবাসী হতে পারেন। কিন্তু সে সুযোগ দেওয়া চলবে না শত্রুর। দুর্গ করতে হবে এমন যাতে কোন অবস্থাতেই সুবিধে করতে পারবে না শত্রু।

দ্বারকা নির্মিত হল। মহোদধির শতযোজন জুড়ে নির্মিত হল দ্বারকা। বড় বড় উদ্যানে ও তড়াগে ভরল পুরী। উন্নত ও দৃঢ় প্রাচীরে ও পরিখায় দ্বারকা হল আর এক অমরাবতী।

মথুরা উঠে এল দ্বারকায়। মথুরার মানুষ নিরাপদ আশ্রয় পেল। কৃষ্ণ রইলেন মথুরায়।

সৈন্যে সৈন্যে অবরোধ রচিত হল। কৃষ্ণ সম্মুখীন হলেন কালযবনের। কালযবন অনুগমন করল কৃষ্ণের।

গুহায় শয়ন করে আছেন বীরশ্রেষ্ঠ রাজা মুচুকুন্দ। নিদ্রিত তিনি। পরম প্রশান্ত সে নিদ্রা। দেবাসুরের যুদ্ধে মুচুকুন্দ অসুরদের বধ করেন। দীর্ঘ এবং কঠিন সংগ্রাম। রাজা মুচুকুন্দ অবসন্ন নিদ্রাতুর। দেবতাদের কাছে বর চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণ নিদ্রার। দেবগণ বলেছিলেন, যে নিদ্রা ভঙ্গ করবে

তোমার সে ভস্ম হবে। তোমার শরীর থেকে অগ্নি নির্গত হবে, ভস্ম করবে সেই দুর্জনকে। গুহায় নিশ্চিন্ত নিদ্রায় শুয়ে আছেন রাজা মুচুকুন্দ।

কৃষ্ণ পলায়ন করছেন। পিছনে অনুসরণ করে আসছেন কালযবন। কৃষ্ণ ঐ গুহায় প্রবেশ করে আত্মগোপন করলেন। কালযবন এল। প্রবেশ করল গুহায়। সম্মুখে নিদ্রিত এক পুরুষ। কালযবন ভাবল কৃষ্ণ। পদাঘাত করল কালযবন। মুচুকুন্দর নিদ্রাভঙ্গ হল, ভস্ম হল কালযবন।

মুচুকুন্দ দেখলেন কৃষ্ণকে। শুধোলেন ঃ কে তুমি ?

পরিচয় দিলেন কৃষ্ণ ঃ চন্দ্রবংশে যদুকুলে আমার জন্ম। পিতা বসুদেব।

মুচুকুন্দের স্মরণ হল গর্গমুনির কথা। তিনি চিনলেন। প্রণাম করলেন। বললেন ঃ আপনি বিষ্ণুর অংশ, আপনিই পরমেশ্বর। আমি চিনেছি। গর্গমুনি বলেছিলেন অষ্টাবিংশ যুগে দ্বাপরের শেষে যদুবংশে অবতীর্ণ হবেন শ্রীহরি। আপনার প্রচণ্ড তেজ আমি সহ্য করতে পারছিনে। দেবাসুর সংগ্রামে আমার তেজ সহ্য করতে পারেনি মহামহা দৈত্য। আজ আমি পারছিনে আপনার। আপনার কণ্ঠে সজল মেঘের ধীর গম্ভীর গর্জন, পদভরে পীড়িত ধরণী। আপনিই ব্রহ্ম। সংসারচক্রে ঘুরে মরছি, শান্তি মিলল না কোথাও। দুঃখকে ভেবেছি সুখ, মরীচিকাকে মনে হয়েছে জলাশয়। রাষ্ট্র, পৃথিবী, ধনসম্পত্তি, পুত্রকন্যা, ভার্যা, ভৃত্যবর্গ সবেতেই সুখ সন্ধান করেছি, কিন্তু মিলেছে শুধু দাহ। দেবগণ দেবলোকে, তবু আমার সাহায্যের প্রয়োজন হল তাঁদের। শান্তি কোথাও হয়ত নেই। আপনার উপাসনাই চিরশান্তি পাওয়ার একমাত্র পথ। সবই আপনার মায়া। মায়া বিছিয়েছেন, তাই মানুষের জীবনে আসে জন্ম, মৃত্যু, জরা। আপনাকে জানে না, বোঝে না, তাই ভোগে কর্মফল, নরকযন্ত্রণা। আমিও মোহিত। তাই মন বিষয়বুদ্ধিতে জরজর, মমত্ব ও গর্বের মহাগর্তে মিথ্যে ঘুরে মরছি। ভিতরে চলছে নিত্য দহন। জ্বালায় যন্ত্রণায় পরিতাপে আমি অবসন্ন। নির্বাণ চাই, তাই আশ্রয় নিচ্ছি আপনার পরমপদের।

ভগবান বললেন ঃ অভিবাঞ্ছিত দিব্যলোক লাভ হোক তোমার, ঐশ্বর্য হোক অব্যাহত। এসব ভোগ কর। নতুন করে জাতিস্মর হয়ে তোমার জন্ম হবে মহৎ কোন কুলে। তারপর পাবে মোক্ষ।

মুচুকুন্দ প্রণতি জানিয়ে গুহা থেকে বেরুলেন। দেখলেন, মানুষগুলো সব ছোট ছোট। বুঝলেন, কলির শুরু। অতএব আর নয়। রাজা মুচুকুন্দ চলে এলেন গন্ধমাদনে। তপস্যা করবেন সেখানে।

কালযবনের বিশাল সৈন্যবাহিনী পরাজিত হল কৃষ্ণের কূটকৌশলে। হস্তী অশ্ব শতশত। সব আনা হল দ্বারাবতীতে। কৃষ্ণ অর্পণ করলেন উগ্রসেনের হাতে। উগ্রসেন হৃষ্ট হলেন। দ্বারাবতী সমৃদ্ধ হল ॥

৬২. বলভদ্রের লীলাবিলাস

যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হল। প্রশান্তি এল। বলভদ্র ব্যাকুল হলেন। জ্ঞাতিবর্গ সবাই গোকুলে। তিনি গোকুলে যাবেন। তাদের দেখবেন। আর ভাবনা নয়, চিন্তা নয়, উদ্বেগও নয়। নিশ্চিন্ত লীলাবিলাসে মগ্ন হতে চাইলেন বলভদ্র।

বলভদ্র এলেন গোকুলে। গোপীরা উৎফুল্ল হল। অনেকে আলিঙ্গন করল তাঁকে, তিনিও করলেন অনেককে। তারপর অনেক হাসি, অনেক খুশি। হাসি আর খুশি ছড়িয়ে রঙ্গে মত্ত হলেন বলভদ্র।

গোপেরা কত সুন্দর কথা বলল। অভিমানে গোপীরা বলল বহু বাঁকা বাঁকা কথা।

কেউ বলল ঃ সেই জনে জনে চলে যাঁর প্রেম, নাগরীদের ভালবাসার সেই যে মানুষটি' তিনি সুখে আছেন তো ?

কেউ বলল ঃ কদিনের সেই বন্ধু পুরবাসিনীদের কাছে আমাদের কথা বলে কি হাসাহাসি করেন না ? কত ভাগ্য কত মান তাদের !

ঃ আমাদের গানে গানে মুখরিত হত ব্রজের বাতাস। মনে কি পড়ে কৃষ্ণের ? মাকে দেখতে কি একবারটিও আসবেন না কৃষ্ণ ?

ঃ কৃষ্ণকথায় আর কি লাভ ! অন্যকথা বল। আমাদের ছেড়ে তাঁর চলে, তাঁকে ছেড়ে আমাদেরও দিন কাটবে। বাবা মা ভাই স্বামী—কৃষ্ণের জন্য কি আমরা সব ছাড়িনি ? কৃষ্ণ একটা মহা অকৃতজ্ঞ।

কেউ বলল ঃ হে অকৃষ্ণ, সত্যি করে বলবেন কি, এখানে আসার কথা কৃষ্ণ কি কিছু বলেন ? আমাদের থেকে মন উঠেছে, নগরের মেয়েতে মন মজেছে। দেখা কি মিলবে তাঁর ? অমন কপাল কি হবে ?

গোপীরা বলভদ্রকে ডাকল ঃ দামোদর, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

হাসিতে মুক্তো ঝরল, নূপুর বাজল।

বলভদ্র কৃষ্ণের কথা বলতে শুরু করলেন। কখনো সান্ত্বনায় কখনো আশ্বাসে গোপীদের মনে তিনি আশার আলো জ্বালিয়ে দিলেন। কখনো বললেন এমন সব কথা যাতে গোপীদের মনে হল, কৃষ্ণ এখনো কত ভালবাসেন তাদের। কখনো ফেঁদে বসলেন কৃষ্ণ সম্বন্ধে মজার সব গল্প।

এইভাবে বলভদ্রের কাটতে লাগল। পরিহাসে পরিহাসে লীলায় বিলাসে যেন সজীব হয়ে উঠল ব্রজের পথ, ঘাট, মাঠ, বাট।

বরুণ বললেন বারুণীকে ঃ বলভদ্রের এত প্রিয় তুমি। তোমাকে পেলে মত্ত হন যিনি সেই অনন্তদেবের কাছে যাও। তাঁর সেবায় লাগ।

বারুণী এলেন বৃন্দাবনে। কদমের কোটরে সন্নিহিত হলেন। বলভদ্র ঘুরছেন ফিরছেন। মদিরার সুন্দর গন্ধে মদির হচ্ছেন। ভাবছেন পাওয়া যেত যদি সেই মত্ত দিনগুলি ফিরে! বলভদ্র গন্ধে বিভোর, চঞ্চল।

সহসা হর্ষে ভরল বলভদ্রের হৃদয়। কদমের গাছে মদিরার ধারা। বলভদ্র পান করলেন, আকণ্ঠ ডুবে গেলেন সেই মদির রসে। গোপেরা গোপীরা সবাই পান করল। বিভোর হল। প্রমত্ত হল। নাচে গানে মুখরিত হল বৃন্দাবন।

বলভদ্র ঘেমে উঠেছেন। শরীর চকচক করছে, জ্বলছে। বলভদ্র বিহ্বল। যমুনাকে ডেকে বললেনঃ এখানে এস, স্নান করব।

মত্ত বলভদ্র। স্খলিত কথা। যমুনা কান করল না। এল না। যেমন বইছিল তেমনি বইতে থাকল।

ক্রুদ্ধ হলেন বলভদ্র। লাঙ্গল নিলেন হাতে। যমুনাকে টানতে শুরু করলেন লাঙ্গলে। বলতে লাগলেনঃ আসবে না তুমি, আসবে না? এবার যাও, দেখি যেতে পার কেমন?

বলভদ্রের মহা আকর্ষণ। যমুনা তট প্লাবিত করল। কাছে এল বলভদ্রের। শরীর ধারণ করে উঠে এল যমুনা। ত্রাসে বিহ্বল যমুনা। বললঃ প্রসন্ন হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করুন।

বলভদ্র বললেনঃ আর যদি অবজ্ঞা কর কখনো তাহলে এই লাঙ্গলের আঘাতে হাজার টুকরো করে ফেলব তোমাকে।

যমুনা ভীত। বলভদ্রের পাশের জমি প্লাবিত হল যমুনার জলে। বলভদ্র স্নান করে প্রসন্ন হলেন। যমুনা মুক্ত হল।

শরীর ধরে এলেন লক্ষ্মী। পদ্মের অলংকারে কুণ্ডলে সাজিয়ে দিলেন বলভদ্রকে। বরুণ পাঠিয়েছেন অম্লান পংকজের মালা, সমুদ্রনীল দুই বস্ত্র। বলভদ্র সাজলেন। অপরূপ শোভা ছড়িয়ে গোপ ও গোপীদের মন রঞ্জন করলেন।

দুমাস কাটল এই ভাবে লীলায় লীলায়। তারপর আবার দ্বারকায়॥

৬৩. রুক্মিণী ও প্রদ্যুম্ন

বিদর্ভদেশ। কুণ্ডিন রাজ্য। রাজা ভীষ্মক। এক পুত্র এবং কন্যা। রুক্মী আর রুক্মিণী।

চারুহাসিনী রুক্মিণী। কৃষ্ণকে ভালবাসলেন। রাজকন্যা রুক্মিণী। কৃষ্ণে নিবেদিত হল তাঁর প্রেম।

কৃষ্ণ ভীষ্মকের কাছে প্রার্থী হলেন। কিন্তু বিমুখ হলেন। রুক্মী পছন্দ

করেন না কৃষ্ণকে। কৃষ্ণদ্বেষী তিনি।

জরাসন্ধ পরামর্শ দিলেনঃ কন্যা দাও শিশুপালকে। ভীষ্মক মত করলেন। রুক্মীরও মনে ধরল। সব ঠিকঠাক। রুক্মিণীর বিবাহ হবে শিশুপালের সঙ্গে।

ভীষ্মকের রাজধানীতে জরাসন্ধ এসেছেন, শিশুপাল এসেছেন, আরো এসেছেন বহু বহু রাজা। কৃষ্ণ এলেন, বলভদ্র এলেন, যাদবগণ এলেন। বিবাহ দেখবেন, উৎসবে আনন্দ উপভোগ করবেন। কুণ্ডিননগর মুখর হল।

বলরাম রইলেন, যাদবগণও! যুদ্ধ করতে হবে। বিবাহের একদিন আগে কৃষ্ণ হরণ করলেন রুক্মিণীকে।

জরাসন্ধ, পৌণ্ড্রক, দন্তবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল, শাল্ব সবাই ক্রুদ্ধ হলেন। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। কিন্তু প্রতিহত হতে হল বলভদ্রের কাছে। ওঁরা পরাজিত হলেন।

রুক্মী প্রতিজ্ঞা করলেনঃ কৃষ্ণকে বধ করব, তবে ফিরব কুণ্ডিনে।

কৃষ্ণের পিছনে ধাওয়া করলেন রুক্মী। রুক্মীর বিশাল বাহিনী বিনষ্ট হল। অবশেষে রুক্মী পতিত হলেন। কৃষ্ণ হনন করবেন রুক্মীকে। কিন্তু রুক্মিণী বললেনঃ আমার একটিই মাত্র ভাই। মারবেন না। ভিক্ষা দিন ভায়ের প্রাণ।

রুক্মী রক্ষা পেলেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে। তাই কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করলেন না। ভোজকট নামে এক নগর তৈরি হল। রুক্মী রইলেন ওখানেই।

রাক্ষস মতে বিবাহ হল কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর। এরপরই প্রদ্যুম্নের জন্ম।

প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়েছে। ছয়দিন পেরিয়েছে। শম্বরাসুর বুঝলঃ এই শিশুই আমাকে হত্যা করবে। অতএব বাঁচতে দেওয়া নয় এ ছেলেকে।

সূতিকাগৃহ থেকে শম্বর হরণ করল প্রদ্যুম্নকে। লবণসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হল প্রদ্যুম্ন। লবণসমুদ্র ভয়ানক। আবর্তে ঘূর্ণিতে কুম্ভীরে মকরে ভয়ংকর।

প্রদ্যুম্ন নিক্ষিপ্ত হল এই সমুদ্রের জলে। একটি মৎস্য গ্রাস করল শিশু প্রদ্যুম্নকে। মৎস্যের পেটের আগুন নিভল, কিন্তু প্রদ্যুম্ন মরল না। বেঁচে রইল মাছের পেটেই।

জেলেরা মাছ ধরছে। ধরা পড়ল এই মৎস্যটিও। শম্বরকে পাঠানো হল।

মায়াবতী শম্বরের পত্নী নন, কিন্তু ছল তাঁর পত্নীর। শম্বরের গৃহেই তাঁর বাস। পাচকদের উপর তাঁরই আধিপত্য।

বাড়িতে মাছ এল। কোটা হল সে মাছ। মায়াবতী অবাক হয়ে দেখলেনঃ মাছের পেটে এক মানবশিশু। রাজার কুমার যেন। দগ্ধ কামতরুর প্রথম অঙ্কুরের মতো সে শিশু।

মাছের পেটে মানবশিশু। কেমন করে এল? কৌতূহল হল মায়াবতীর।

নারদ এলেন। বললেন ঃ জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন যিনি সেই কৃষ্ণের পুত্র এ। শম্বর একে হরণ করে। তারপর ফেলে দেয় সাগরে। সেই থেকেই মাছের পেটে। আপাতত তোমার হাতে। যত্নে একে পালন কর।

বালকের রূপে মায়াবতী মুগ্ধ হয়েছেন। অনুরাগে মনও হয়েছে রঞ্জিত। মায়াবতী বালকটিকে পালন করলেন।

বালক যুবক হল। মায়াবতী অনুরক্ত হলেন প্রদ্যুম্নে। মায়াবতী জানতেন মায়া, বহুতর মায়া। প্রদ্যুম্নে তাঁর মন। তাই তাকে শেখালেন। মায়াবতী প্রদ্যুম্নকে মায়াবিদ করে তুললেন।

কামসাজে সেজেছেন মায়াবতী। প্রদ্যুম্ন বললেন ঃ এ সাজ কেন, মাতৃভাব ছেড়ে অন্যভাব কেন?

মায়াবতী বললেন ঃ তুমি আমার পুত্র নও, কৃষ্ণের। হরণ করে শম্বর ফেলেছিল সাগরজলে। তারপর মাছের পেট। সেখান থেকে তোমাকে পেয়েছি। তোমার মায়ের হয়ত আজও দিন যায় রোদনে রোদনে।

ক্রুদ্ধ প্রদ্যুম্ন শম্বরকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। শম্বরের বহুতর সৈন্য বিনষ্ট হল। সপ্তমী মায়াও বিনষ্ট হল। অষ্টমী মায়া বিস্তার করলেন প্রদ্যুম্ন। শম্বরাসুর নিহত হল।

প্রদ্যুম্ন আকাশে চড়লেন। সঙ্গে মায়াবতী। আকাশপথে এসে পড়লেন কৃষ্ণের অন্তঃপুরে।

কৃষ্ণের পত্নীরা মনে করলেন কৃষ্ণ এসেছেন। রুক্মিণীর মন কেমন করে উঠল। অশ্রুপূর্ণ তাঁর নয়ন। বললেন ঃ আহা কার ছেলেগো! আমার প্রদ্যুম্ন থাকলে এতবড়টিই হত। এই বয়সই হত তার। তুমি কার কোল আলো করেছ বাছা। দেখে মনে হয় তুমি কৃষ্ণের ছেলে।

কৃষ্ণ এলেন। সঙ্গে নারদ। বললেন ঃ শম্বরকে বধ করেছে তোমার ছেলে প্রদ্যুম্ন। সম্মুখে সে-ই। সঙ্গে তোমারই পুত্রবধূ। শম্বরের পত্নী এ নয়। কাম দগ্ধ হল। স্ত্রী রতি প্রতীক্ষায় রইল, কবে জন্ম হবে কামের। সেই রতিই মায়ারূপে শম্বরাসুরকে মোহিত করে রেখেছিল। নিত্য নিন্দিত ভোগে উন্মত্ত রাখল শম্বরকে। নিত্য নবনব মায়া দেখাতে থাকল। কামই প্রদ্যুম্ন হয়ে অবতীর্ণ, আর এ-ই রতি।

রুক্মিণী আনন্দিত হলেন। কৃষ্ণ পুলকিত হলেন। আর হর্ষে পুরল পুরবাসীর মন।।

৬৪· বলভদ্রের দ্যূতক্রীড়া

রাজা রুক্মী। কন্যার স্বয়ংবর সভা। প্রদ্যুম্ন এসেছেন। রুক্মীকন্যা বরণ করল প্রদ্যুম্নকে। পুত্র হল প্রদ্যুম্নের। মহা পরাক্রমী পুত্র। নাম অনিরুদ্ধ। রুক্মীর পৌত্রী, কৃষ্ণ চাইলেন অনিরুদ্ধের বধূ করতে। প্রার্থনাও জানালেন সেই মতো। কৃষ্ণের প্রতি খুশি নন রুক্মী। তবু পৌত্রীকে দিতে হল কৃষ্ণের পৌত্রের হাতে।

ভোজকট নগরে বিবাহ উৎসব। রুক্মীর পৌত্রী পাত্রী, কৃষ্ণের পৌত্র পাত্র। কৃষ্ণ এসেছেন, বলরাম এসেছেন, যাদবগণ এসেছেন, এসেছেন আরো অনেকে। ভোজকটে সম্পন্ন হল বিবাহ।

কলিঙ্গরাজ রুক্মীকে বললেনঃ দ্যূতক্রীড়া হোক। হলধর তেমন নিপুণ নন। কিন্তু আসক্তি প্রচণ্ড। দিব্যি কয়েকবাজি হারিয়ে দিলে মন্দ জমবে না।

রুক্মী সম্মত হলেন। বলভদ্রের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গেই এবং সেই সভাস্থলেই।

প্রথমবার রুক্মী জিতলেন। মহা পটু তিনি দ্যূতে। চার হাজার সুবর্ণ পণ ছিল। রুক্মী পেলেন। দ্বিতীয়বারেও জয় হল রুক্মীর। পণ ছিল চার হাজার সুবর্ণের।

তৃতীয় বাজিতে বলভদ্র পণ ধরলেন চারশো হাজারের। ধুরন্ধর খেলোয়াড় রুক্মী। বলভদ্র পরাজিত হলেন।

বারবার তিনবার হার। কলিঙ্গরাজ দাঁত বের করে সভা ফাটিয়ে হাসলেন। কেবল জিতছেন, তাছাড়া খেলেনও ভাল। রুক্মী দর্পিত হলেন। বললেনঃ কেমন হারিয়ে দিলাম। খেলা তো এই পদের, কিন্তু বড়াই করতে কামাই নেই।

কলিঙ্গরাজ হাসছেন। রুক্মী দুর্বাক্য বলছেন। বলভদ্রের মেজাজ চড়ে গেল। পণ রাখলেন চল্লিশ কোটি সুবর্ণের।

রুক্মীর মনে আশা, জিতে নেবেন। অক্ষপাত করলেন। কিন্তু জিত হল বলভদ্রের। আনন্দে চিৎকার করে বলভদ্র বললেনঃ আমি জিতেছি।

রুক্মী বললেনঃ কে বলল আপনি জিতেছেন? মিথ্যে কথা। পণের কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমি কি রাজী হয়েছিলাম? এতে যদি আপনার জয় হয় তাহলে আমারই বা নয় কেন?

আকাশ থেকে গম্ভীর বাণী নিনাদিত হলঃ ন্যায়ত বলদেবেরই জয়। রুক্মী অহেতুক মিথ্যে বলছেন। মুখে তিনি কিছু বলেন নি, কিন্তু অক্ষপাত

তো করেছিলেন। রাজী না থাকলে করতে যাবেন কেন ?

বলভদ্রের ক্রোধে ঘৃতাহুতি পড়ল। অক্ষফলকের আঘাতে রুক্মীর জীবনান্ত হল। কলিঙ্গরাজ দাঁত বের করে হেসেছিলেন। বলভদ্র সেগুলি ভেঙ্গে দিলেন। তাঁর রাগ বেড়েই চলল। জাতরূপময় স্তম্ভ আকর্ষণ করলেন। বিপক্ষের অনেক রাজা নিহত হলেন। অনেকে পালিয়ে রেহাই পেলেন। সবাই হাহাকার করে উঠল।

রুক্মী নিহত। কৃষ্ণ কিছু বললেন না। বলভদ্রের ভয়ে মৌন রইলেন। বর ও বধূকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এলেন ॥

৬৫. নরকাসুর

ঐরাবত পৃষ্ঠে ইন্দ্র। এসেছেন দ্বারকায়। নরকের দৌরাত্ম্য সীমা ছাড়িয়েছে। ইন্দ্র এসেছেন কৃষ্ণের কাছে। বিহিত চান।

ইন্দ্র বললেন: আপনি আমাদের নাথ। মানুষরূপে রয়েছেন ধরায়। অত্যাচারী অসুর দলন করেছেন। দেবতারা শান্তিলাভ করেছেন। ত্রিলোককে মুক্ত করেছেন অসজ্জন থেকে। যজ্ঞ চলছে নির্বিঘ্নে। যজ্ঞভাগ পাচ্ছেন দেবতারা। তাঁরা পরিতুষ্ট। কিন্তু সম্প্রতি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি নরকের দৌরাত্ম্য সীমা অতিক্রম করেছে। দেব, সিদ্ধ, অসুর ও নৃপগণের বহু কন্যা হরণ করেছে নরক। বন্দী করে রেখেছে প্রাসাদে। বরুণের স্বর্ণস্রাবী ছত্র আর নেই, মণিপর্বত লোপাট। নিয়ত অমৃত ক্ষরণ হয়, অদিতির সেই দিব্য কুণ্ডলজোড়াও হরণ করেছে নরক। এখন নজর পড়েছে ঐরাবতে। আমি সব বললাম। যা করার আপনিই ঠিক করুন।

কৃষ্ণ সামান্য হাসলেন। ইন্দ্রের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন।

কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করলেন। মুহূর্তেই এল গরুড়। কৃষ্ণ যাত্রা করলেন। সঙ্গে রইলেন সত্যভামা।

দ্বারকার লোক ভীড় করেছে। ইন্দ্রকে দেখছে। ঐরাবতে ইন্দ্র। স্বর্গে প্রস্থান করলেন তিনি।

প্রাগ্‌ জ্যোতিষপুরের চারিদিকে শতযোজন জুড়ে বিস্তৃত পাশ। পাশে ঘেরা প্রাগ্‌ জ্যোতিষপুর। মুরু অসুরের তৈরি পাশ। সর্বত্র ক্ষুরের ধার।

সুদর্শনচক্রে পাশ কাটল। মুরু বিনষ্ট হল। কৃষ্ণের প্রচণ্ড আক্রমণ। প্রতিরোধ করতে পারল না মুরু।

মুরুর সাত হাজার পুত্র দগ্ধ হল। শলভের মতো দগ্ধ হল। হয়গ্রীব ও পঞ্চজনও পঞ্চত্ব পেল।

কৃষ্ণ এসে পৌঁছলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে। প্রচুর সৈন্য নরকের। ভয়ংকর সব সৈন্য। যুদ্ধও হল ভয়ংকর। কৃষ্ণের হাতে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মরল নরকের সৈন্য। অবশেষে চক্রক্ষেপণ। দ্বিখণ্ডিত হল নরক।

ভৌমনরক নিহত। ভূমি এলেন। হাতে দেবজননীর সেই দুই কুণ্ডল। ভূমি বললেন ঃ বরাহের চেহারা ধরে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। অঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন। তাতেই জন্ম নরকের। আপনিই দিয়েছিলেন, আবার আপনিই তাকে নিলেন। এই সেই কুণ্ডল, নিন। কৃপা করুন, পালন করুন নরকের পুত্রদের। অনুগ্রহ করেছিলেন, তাই আপনার অবতরণ ধরণীতে। আমারই ভার হরণ করতে দেহধারণ। আপনিই কর্তা, বিকর্তা এবং সংহারকারী। আপনিই ক্রিয়া অথচ কর্তা এবং কার্য। কি বলে স্তব করব আমি! যিনি পরমাত্মা ভূতাত্মা এবং মহাত্মা তাঁর স্তবই নেই। তাই কি বলে স্তব করব? প্রসন্ন হোন। মার্জনা করুন নরকের অপরাধ। দোষের জন্য নিজের পুত্রকে আপনিই বধ করেছেন।

ভগবান বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে।

নরকের প্রাসাদ থেকে মণিরত্নসমূহ উদ্ধার করলেন কৃষ্ণ। অন্তঃপুরে দেখলেন ষোল হাজার একশো কন্যা। নরকের রাজধানীতে আরো অনেক কিছু দেখলেন কৃষ্ণ। চারটি করে দাঁত, বিশাল বিশাল ছয় হাজার হস্তী। একুশ নিযুত কম্বোজের অশ্ব। সব গেল দ্বারকায়। নরকের কিংকররাই দিয়ে এল পৌঁছে।

গরুড়ের পিঠে বরুণের ছত্র, মণিপর্বত, কৃষ্ণ, সত্যভামা। কৃষ্ণ চললেন স্বর্গে। দেবমাতা অদিতিকে ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর দিব্য দুই কুণ্ডল ॥

৬৬. পারিজাত তরু

স্বর্গদ্বারে শঙ্খ ধ্বনি। হরি এসেছেন। হরিশঙ্খ বেজে উঠেছে।

দেবতারা এলেন। অর্ঘ্যে সেজে এসেছেন দেবমণ্ডল। বিষ্ণুবন্দনা হল। বিষ্ণু প্রবেশ করলেন দেবমাতা অদিতির গৃহে। দেবমাতার গৃহ। মেঘের আকার। অপরূপ। মনোহর। অনন্য।

সম্মুখে অদিতি। কৃষ্ণ প্রণাম করলেন। ইন্দ্র বিনত হলেন। সেই দুই দিব্য কুণ্ডল। কৃষ্ণ দিলেন অদিতির হাতে। নরক নিহত। কৃষ্ণমুখে নরককথা।

অদিতির সম্মুখে হরি। অদিতি স্তব করলেন। বললেন ঃ তোমাকে নমস্কার। তোমাকে নমস্কার। সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের কর্তা তুমি, আবার কর্তৃপতিও। ব্রহ্মাও তুমি, বিষ্ণুও তুমি, শিবও তুমি। তুমি এক, তিন হও।

তিন কাজ সম্পন্ন কর। তোমারই মায়ায় সংসারে অনুলিপ্ত হয়ে আছে মূঢ় জন। মনে আমি আমি ভাব। আমার আমার বোধ এ তোমার মায়ারই বিলাস। যাঁরা মুক্তি চান, আরাধনা করেন তোমাকে তাঁরাই পার পান মায়া থেকে। দেবতা, মানুষ, পশু সবাই তোমার মায়ায় ভুলেছে, মোহে ডুবেছে। তোমাকে আরাধনা, তবু সামান্য কামনা জীবের। এমনই প্রভাব এই মায়ার। আমি যে, আমারও মনে পুত্রদের কল্যাণে শত্রুনাশের কামনা। তোমাকে আরাধনা করেছি, কিন্তু মোক্ষ চাইনি। তোমার মায়া ছাড়া এ আর কি? তোমার কাছে পুণ্যহীনের বিষয় অভিলাষ, কল্পতরুর কাছে প্রার্থনা কৌপীনের। নিজের নিজেরই অপরাধ এ। তোমার স্থূলরূপই দেখছি, পরম রূপ ধরতে পারছি নে ধারণায়। তুমি প্রসন্ন হও। তোমাকে নমস্কার।

ভগবান হেসে বললেন: তুমি জননী। তুমি প্রসন্ন হও, বর দাও।

অদিতি বললেন: তোমার যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক। মর্ত্যলোকে অজেয় হবে তুমি।

ইন্দ্রাণী ভগবানকে প্রণাম করলেন। সত্যভামাও করলেন। অদিতিকে প্রণাম করে বললেন: প্রসন্ন হও। প্রসন্ন হও।

অদিতি বললেন সত্যভামাকে: জরা আসবে না তোমার, রূপ থাকবে অম্লান। সমস্ত ঐশ্বর্যই থাকবে অব্যাহত।

নন্দন কানন। বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেন কৃষ্ণ ও সত্যভামা।

সম্মুখে পারিজাত তরু। ওঁরা দাঁড়ালেন। আহ্লাদিত হলেন। অমৃত-মন্থনে উঠেছিল এ তরু। স্বর্গোদ্যান ভরিয়ে রেখেছে এখন। গন্ধে মনোরম, মঞ্জরীপুঞ্জে মনোহর। পাতা যেন তাম্রফলক। বাকল যেন সোনার পাত।

সত্যভামা বিমুগ্ধ। বললেন: কি জন্যে এটিকে দ্বারকায় নিয়ে যাননি। আপনি বলেন আমি আপনার পরম প্রিয়। যদি সত্যি হয় তবে নিয়ে চলুন। প্রাসাদের কাননে থাকবে। কত বলেন আমার মতো অন্য কেউ নয়, জাম্ববতী নয়, রুক্মিণী নয়। যদি সত্যি বলে থাকেন, নিতান্তই যদি না হয় মন রাখা কথা তাহলে নিয়ে চলুন। মঞ্জরী পরব খোঁপায়। সবার থেকে আলাদা হয়ে ঘুরব সবারই মাঝে মাঝে। নিয়ে চলুন।

কৃষ্ণ স্মিত হেসে পারিজাত তরু তুললেন গরুড়ের পিঠে।

রক্ষীরা ছুটে এল। হাঁ-হাঁ করে বলল: দেবরাজের পত্নী, এ তরু তাঁরই। অতএব হরণ করবেন না। অমৃত মন্থনের সময় শচীর সাজের জন্য দেবতারা তুলেছেন এ তরু। নিলেও ভালোয় ভালোয় ফিরতে পারবেন না। দেবতাদের রাজা যিনি সেই ইন্দ্রও যাঁর অধীন সেই শচীর বৃক্ষ। হরণ করে কুশলে ফিরবে এমন কে আছে! ইন্দ্র নিশ্চয়ই প্রতিবিধান করবেন। দেবতারাও হবেন সহায়। ওঁদের সঙ্গে বিরোধ। পরিণাম নিশ্চিত মন্দ। পণ্ডিতেরা এ ধরনের কাজকে

কখনোই শ্রেয় বলেন না।

সত্যভামা বললেনঃ অমৃতমন্থনে উঠেছে। সকলের জিনিস। শচীর একার নয়। ইন্দ্রেরও নয়। সুধা উঠেছিল সমুদ্র থেকে, চন্দ্র উঠেছিলেন, লক্ষ্মী উঠেছিলেন। এ তিনে সবার সমান অংশ। সবাই সমানভাবে ভোগ করে। পারিজাতও তাই।… ক্ষমতা থাকে তো আটকাক না কেন! বারণ করছে কে? যা বল্ গিয়ে তোদের শচীকে। আমার স্বামীর বাহুবলের জোরে আমি পারিজাত তরু উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বল্, সত্যভামা জানেন কে শচী আর কেই বা ইন্দ্র। বলিস্, বড়াই করে সত্যভামা পারিজাত তরু উঠিয়ে নিয়ে চললেন। শচী যদি স্বামীসোহাগী হয় আর স্বামী যদি তার কথা শোনে তাহলে যেন রোধ করে। যা গিয়ে বল্, সামান্য একটা মানুষী পারিজাত তরু হরণ করছে।

শচী সংবাদ পেলেন। শচী ইন্দ্রকে উৎসাহিত করলেন, উত্তেজিত করলেন।

দেবতারা সাজলেন। ইন্দ্র সজ্জিত হলেন। পারিজাত তরু উদ্ধারের জন্য যুদ্ধযাত্রা। হরির বিরুদ্ধে দেবগণের যুদ্ধ। ইন্দ্রের হাতে বজ্র। দেবগণের হাতে পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা, শূল, আরো বহু শত অস্ত্র।

ঐরাবতে ইন্দ্র। দেবগণে বেষ্টিত। কৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করলেন। ধনুর টঙ্কারে দিকবিদিক কম্পিত হল। এক সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হল সহস্র অযুত শর। রাশি রাশি শর। আচ্ছাদিত হল আকাশ। দেবতারাও বহুতর অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু প্রত্যেক অস্ত্র হল খণ্ডবিখণ্ড। বরুণ পাশাস্ত্র ছেড়েছেন। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল গরুড়। শাণিত চঞ্চু। চঞ্চুর ফাঁকে যেন একটি কাতর ভুজঙ্গ শিশু। যম দণ্ডপ্রহার করলেন। কৃষ্ণের গদায় খণ্ড খণ্ড হল সে দণ্ড। চক্রক্ষেপ করলেন কৃষ্ণ। কুবেরের শিবিকা হল চূর চূর। সূর্য এলেন। চোখ তুলে তাকালেন কৃষ্ণ। মুহূর্তে নষ্ট হল সূর্যের তেজ। অগ্নি এলেন। নিরস্ত হলেন। শত শত বাণে হতবল হলেন। চক্রের আঘাতে শূলের অগ্রভাগ গেল উড়ে। রুদ্রেরা মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকলেন একে একে। বসুরা যেদিকে পারলেন পলায়ন করলেন। সাধ্যবর্গ, মরুৎগণ, বিশ্বদেব ও গন্ধর্ববর্গ জরজর হল কৃষ্ণের বাণে। আকাশে উড়ল যেন শিমুলের তুলো। দেবতাদের তাড়না করল গরুড়। নখরে বিদীর্ণ হলেন অনেক দেবতা। গরুড়ের মহোৎসব। তাড়না, বিদারণ ও ভক্ষণ। ইন্দ্র শরবর্ষণ করছেন, কৃষ্ণ করছেন। দুখানি মেঘ যেন মুষলধারে বর্ষণ করছে। ঐরাবত ক্ষতবিক্ষত হল গরুড়ের নখর ও চঞ্চুর আঘাতে। ইন্দ্র যুদ্ধ করছেন অক্লান্ত পরাক্রমে। কিন্তু হতাশ হচ্ছেন। সমস্ত শস্ত্র ব্যর্থ হল। ছিন্নবিছিন্ন, খণ্ডবিখণ্ড, দীর্ণবিদীর্ণ হল। ইন্দ্র বজ্র ধরলেন। কৃষ্ণও উঁচিয়েছেন সুদর্শনচক্র। তিনলোকে হাহাকার পড়ল।

ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন। কৃষ্ণ ধারণ করলেন অনায়াসে। বজ্র নিষ্ক্রিয় হল! সুদর্শনচক্র হাতেই রইল কৃষ্ণের। কৃষ্ণ বললেনঃ ইন্দ্র, থাক, আর নয়।

ঐরাবত ক্ষতবিক্ষত। বজ্র বিনষ্ট। ইন্দ্র পলায়নপর হলেন।

সত্যভামা বললেনঃ আপনি ত্রিলোকের অধিপতি, শচীপতি, পলায়ন কি আপনার সাজে? কেনই বা পলায়ন! শচী এলেন বলে, পারিজাতে সেজে শচী ঐ এলেন? পারিজাতে সেজে সুন্দর হতেন শচী, উজ্জ্বল হত কান্তি। কিন্তু চলে যাচ্ছেন, পারিজাতের গয়না যে উঠবে না শচীর তনুদেহে। দেবরাজ্য কি সুখের হবে তাতে? পালিয়ে কি হবে! লজ্জা কেন? আসুন, পারিজাত তরু উদ্ধার করুন, দেবতাদের ব্যথা জুড়োক।

সত্যভামা আরো বললেনঃ পতির বীর্য, সেই গর্বে শচী অন্ধ, আমাকে মান্যই করেনি। আমলই দেয়নি! স্ত্রীলোক আমি। স্বামীর গৌরব আমার কি কম? তাই মজা করা গেল, একটু দেখিয়ে দেওয়া গেল। অপরের জিনিস নিয়ে আমাদের আর কি লাভ। রূপের সে কি গর্ব শচীর! স্বামীর গৌরবে কোন স্ত্রী গরবিনী নয়!

ইন্দ্র বললেনঃ আমি আপনাদের মিত্র। আমার খেদ বিস্তার করা উচিত নয়। ভগবানের কাছে আমার পরাজয়। এতে আমার কোন লজ্জাই নেই। কেনই বা হবে লজ্জা? কে পরাজিত করতে পারে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের কারণ সেই পরমপুরুষকে।

হাসি হাসি কৃষ্ণ। ভাবগম্ভীর হয়ে বললেনঃ আমরা সাধারণ মানুষ। অপরাধ হয়েছে। মার্জনা করুন। পারিজাত তরু আপনার। নন্দন কাননেই মানায়। অতএব গ্রহণ করুন। সত্যভামা বলেছিল, তাই নিয়েছিলাম। প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অতএব গ্রহণ করুন। এই আপনার বজ্র। এ আপনারই যোগ্য। অতএব গ্রহণ করুন।

ইন্দ্র বললেনঃ মানুষ, মিথ্যেই আমাকে বিমোহিত করছেন। যেটুকু দেখছি সেইটুকুই আমরা জানি। আপনার সূক্ষ্মরূপের কথা আমরা কিছুই জানিনা। আপনি যা তাই আছেন। নিজের প্রবৃত্তিতেই আপনি সংস্থিত। সেই ভাবে থেকেই জগতের কণ্টক উদ্ধার করছেন। পারিজাত তরু দ্বারকায় নিয়ে যান। যখন থাকবেন না এ মর্ত্যকায়ায় তখন এ তরু ফের ফিরে আসবে নন্দন কাননে।

কৃষ্ণ সম্মত হলেন। স্বর্গ থেকে পৃথিবীতল। কৃষ্ণ ফিরে চললেন। পথে পথে স্তব। সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও ঋষিদের সম্মিলিত স্তবে আপ্যায়িত হলেন কৃষ্ণ।

দ্বারকার আকাশে কৃষ্ণ। শঙ্খধ্বনিতে পূরল দ্বারকার আকাশ বাতাস দ্বারকার মানুষ হর্ষে পুলকে যেন নবজীবন পেল।

কৃষ্ণ অবতরণ করলেন। অন্তঃপুরে স্থাপিত হল পারিজাত তরু।

দিব্যতরু। যে কেউ যেত তরু-সন্নিধানে স্মরণে তার ভাসত পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত। যাদবরা যেত পারিজাত তরুতে মুখ দেখতে। মনে হত দিব্য শরীর তাদের। পারিজাত তরু আছে দ্বারকায়। তিন যোজন পর্যন্ত ছুটত তার সৌরভ। দ্বারকা আমোদিত হল।

দ্বারকায় এসে পৌঁছেছে নরকের তাবৎ হস্তী অশ্ব। আর এসেছে ষোল হাজার একশো কন্যা।

শুভ সময় এল। কৃষ্ণ এই সমস্ত কন্যাকেই বিবাহ করলেন। পৃথক পৃথক ভাবে একই সময়ে কৃষ্ণ প্রত্যেক কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। সবাই ভাবল কৃষ্ণ শুধু তারই। যত কন্যা তত রূপে কৃষ্ণ রইলেন তাদের পাশে পাশে, একান্ত কাছে ।।

৬৭. কৃষ্ণ ও মহাদেবের যুদ্ধ

অনুরাগে অনুরাগে লীলারত পার্বতী ও মহাদেব। ঊষা দেখলেন। বাণ রাজার কন্যা ঊষা। পতির সঙ্গে লীলারসে মগ্ন হবেন, বিলাসে মত্ত হবেন— ঊষার মনে এই অভিলাষ।

পার্বতী মন পড়তে জানেন। বুঝলেন। ঊষাকে বললেন ঃ খেদ রেখো না মনে। তুমিও মাততে পারবে। পতির সঙ্গে লীলাবিলাসে তোমার মনও ভরবে পুলকে।

চিন্তা তরঙ্গিত হল ঊষার মনে। ভাবলেন ঃ কে হবে আমার পতি ?

পর্বতী বুঝলেন। বললেন ঃ বৈশাখ মাস। শুক্ল পক্ষ। দ্বাদশী তিথি। এমন দিনে স্বপ্নে যদি কেউ আসেন, জোর করে সম্ভোগ করেন তোমাকে, তাহলে তিনিই হবেন তোমার পতি।

রাজকুমারী স্বপ্ন দেখলেন। সেও বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথি। রাজকুমারী দেখলেন—একজন পুরুষ। যেমন বলেছিলেন পার্বতী ঠিক তেমনটিই। পুরুষ অভিভূত করল রাজকুমারী ঊষাকে।

ঊষা অনুরাগিনী হলেন। কে ঐ পুরুষ ? ঊষার মনে হানা দেয় ঔৎসুক্য। কবে আসবেন, কোথায়, কিভাবে ? ঊষা চঞ্চল হলেন।

লজ্জা গেল। আবেগ, উচ্ছ্বাস। লজ্জা গেল ভেসে। সখীকেই ভাবলেন দয়িত। বললেন ঃ হে নাথ, তুমি কোথায় ?

সখী চিত্রলেখা। মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড। কুষ্মাণ্ডকন্যা চিত্রলেখা। ঊষার সখী।

সখী সুধালো। কার কথা বলছ ?

রাজকুমারী লজ্জানত হলেন। মুখ ফুটল না। সখী শপথ করল। শপথের

পর শপথ। ঊষার মন হয়ত ভরসা পেল। ঊষা বললেন। কিছুই রাখলেন না ঢাকলেন না। সব, সব বললেন। অবশেষে আবেদন করলেন ঃ তিনি আসবেন। তিনি আসুন। কিন্তু উপায় কর একটা।

চিত্রলেখা দেবতাদের ছবি এঁকে এঁকে দেখাল। বড় বড় দৈত্যের ছবি এঁকে দেখাল। কিন্তু কেউ নয়। কারো সঙ্গে মিল নেই স্বপ্নাগত সেই কুমারের।

চিত্রলেখা গন্ধর্বদের ছবি আঁকল। বড় বড় মানুষের চেহারা দেখাল পটে এঁকে। কিন্তু কেউ নয়, কেউ নয়।

বৃষ্ণিকুলের ছবি আঁকা হল। একের পর এক। পটে আঁকা কৃষ্ণ ও বলরাম ! লজ্জায় জড় হলেন ঊষা। প্রদ্যুম্ন, আরো লজ্জা। অন্য দিকে তাকালেন ঊষা। অনিরুদ্ধের চিত্র। বড় বড় চোখে বিস্ময় মেলে ধরে ঊষা দেখলেন। লজ্জা দূরে মুখ লুকাল। ঊষা বলে উঠলেন ঃ এই তো, ইনিই সেই তিনি।

চিত্রলেখা আশ্বাস দিল ঊষাকে। ব্যবস্থা করবে সে।

যোগ গতিতে চিত্রলেখা এল দ্বারকায়।

রাজা বাণ বললেন মহাদেবকে ঃ দশ হাজার বাহু, অথচ যুদ্ধ নেই। নির্বেদ এসে গেল। কখনোই কি যুদ্ধ হবে না ? দশ হাজার বাহুর উপযোগিতা কি বুঝব না ? যুদ্ধই যদি না করলাম, হাজার বাহুর বোঝা বয়ে কি হবে তবে ?

মহাদেব বললেন ঃ যখন দেখবে ময়ূর ধ্বজ ভেঙেছে, জানবে সময় আসন্ন। মহাসমর, রক্তপায়ী জীবের হবে উৎসব।

বাণ উৎফুল্ল হলেন। প্রণাম করে প্রাসাদে এলেন ফিরে।

একদিন সত্যি সত্যিই ভগ্ন দেখা গেল ময়ূরধ্বজকে। খুশিতে ডগমগ হলেন বাণ।

চিত্রলেখা এল দ্বারকায়। যোগ জানত চিত্রলেখা। যোগের বলেই অনিরুদ্ধকে হাজির করল ঊষার কাছে।

মেয়েমহলে ঊষা ও অনিরুদ্ধ। রক্ষীরা দেখল, রতিরত রাজকুমারী ও অজানা কোন এক কুমার।

বাণ শুনলেন। আদেশ করলেন ঃ আক্রমণ কর।

আক্রান্ত হলেন অনিরুদ্ধ। লোহার পরিঘ ছুঁড়লেন অনিরুদ্ধ। রক্ষীরা নিহত হল।

বাণ প্রস্তুত হলেন। সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। কিন্তু পরাজিত হলেন।

মন্ত্রীরা পরামর্শ দিল ঃ মায়া ছড়িয়ে যুদ্ধ কর। পন্নগাস্ত্রে বন্ধন কর অনিরুদ্ধকে।

অনিরুদ্ধ বন্দী হলেন।

দ্বারকায় খোঁজ খোঁজ রব। অনিরুদ্ধ নেই। কোথায় গেল, কি হল বলাবলি

চলছে এইরকম। নারদ সংবাদ দিলেনঃ অনিরুদ্ধ রুদ্ধ হয়েছেন। আর এ কাজ বাণাসুরের।

যাদবরা ভেবেছিল দেবতাদের কাজ। পারিজাত হরণ, যুদ্ধে পরাজয়, শোধ তুলছেন দেবগণ। কিন্তু ধারণা শুধরাতে হল। নারদ বললেনঃ যোগবিদ্যায় চিত্রলেখা বিদগ্ধ। সে-ই অনিরুদ্ধকে হরণ করে নিয়ে গেছে শোণিতপুরে।

কৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করলেন। বলদেব ও প্রদ্যুম্ন চললেন সঙ্গে। শোণিতপুরে প্রবেশ করবেন। প্রথমেই বাধা। প্রমথরা এল। যুদ্ধ হল। পরাজিতও হল। বাণপুরের কাছে এসে পড়েছেন কৃষ্ণ। বাণকে রক্ষা করতে হবে। মহাদেব-নির্মিত জ্বর এল এগিয়ে। মহাকায় জ্বর। তিন মাথা, তিন পা। জ্বর ছুঁড়েছে উত্তপ্ত ভস্ম। প্রচণ্ড তাপ। দাহ উপস্থিত হল বলভদ্রের। কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। জ্বালা জুড়ালো।

কৃষ্ণের সঙ্গে জ্বরের যুদ্ধ। জ্বর প্রবিষ্ট হল কৃষ্ণের শরীরে। কিন্তু কৃষ্ণদেহে বৈষ্ণবজ্বর। শৈবজ্বর বিদূরিত হল কৃষ্ণের শরীর থেকে। শৈবজ্বর বিহ্বল হল। কৃষ্ণের ভুজের আঘাতে শৈবজ্বর হল জরজর। পিতামহ ব্রহ্মা বললেনঃ ওকে ক্ষমা করুন।

ব্রহ্মার অনুরোধ রাখলেন কৃষ্ণ। বৈষ্ণবজ্বর নিজ শরীরেই বিলীন করলেন।

জ্বর প্রস্থান করল। বলে গেলঃ আমার সঙ্গে আপনার এই যুদ্ধের কথা যারা শুনবে জ্বর মুক্ত হবে তারা।

পঞ্চ অগ্নি বিনষ্ট হল। দানবসেনা বিনষ্ট হল। বাণ অবতীর্ণ হলেন যুদ্ধে। শঙ্কর বাণের দিকে, কার্তিকেয়ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন।

ভয়ংকর যুদ্ধ হল। হরিও শঙ্করের যুদ্ধ। দারুণ সমর। অস্ত্রের তেজে মানুষ ক্ষুব্ধ হল। দেবতাদের মনে শঙ্কা। জগৎ হয়ত দাঁড়িয়ে প্রলয়ের উপকূলে।

মহাদেবে এল আলস্য। হরির জৃম্ভণাস্ত্রের ফল। প্রমথরা পলায়ন করল, দৈত্যগণও পালিয়ে পেল ত্রাণ। মহাদেব রথের উপর বসে গেলেন। কোনমতেই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেন না।

গরুড়ের দাপে কার্তিকেয়ের বাহন হল বিক্ষত। প্রদ্যুম্নের অস্ত্রে স্বয়ং কার্তিকেয় সম্পীড়িত। কৃষ্ণের হুংকারে সর্বশক্তি হল লুপ্ত। কার্তিকেয় রণভূমি পরিত্যাগ করলেন।

শঙ্কর অলস, কার্তিকেয় নির্জিত, প্রমথগণ পলায়িত, দৈত্যসৈন্য বিনষ্ট। বাণ এলেন মহারথে চেপে। সারথি স্বয়ং নন্দীশ্বর।

বলভদ্র বাণে বাণে বাণসৈন্যগণকে উদ্ভ্রান্ত করলেন। যে যেদিকে পারল পলায়ন করল। লাঙ্গল ও মুষলে অবপোথিত হল বহু সৈন্য। কৃষ্ণের চক্রে

বিচ্ছিন্ন হল বহু সৈন্য। বাণ দেখলেন। এগিয়ে এলেন। বাণে কৃষ্ণে সমর। এদিক থেকে ছুটল ঝাঁকে ঝাঁকে প্রদীপ্ত বাণ, কবচবিভেদক বাণ। ওদিক থেকেও এল বাণের বন্যা। বাণের শায়কজাল ছিন্ন হল।

বাণের মনে পণ তিনি জিতবেন। বিদ্ধ করলেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণের মনে পণ তিনি জিতবেন। বিদ্ধ করলেন বাণকে। দুজনেরই জয়ের দুর্দম বাসনা। দুজনেই ত্যাগ করতে থাকলেন মারাত্মক অস্ত্রসমূহ। সমস্ত শস্ত্রই ব্যর্থ হচ্ছে। কৃষ্ণ গ্রহণ করলেন সুদর্শনচক্র। কৃষ্ণের হাতে প্রচণ্ড প্রদীপ্ত অস্ত্র। শতসূর্যের সম্মিলিত তেজে কৃষ্ণের হাত প্রজ্বলিত। সুদর্শনচক্র উন্মুক্ত হবে হবে। কৃষ্ণের সম্মুখে উলঙ্গ কোটবী, দৈত্যকুলের মায়াবিদ্যা। নয়ন মুদ্রিত করলেন কৃষ্ণ। সুদর্শনচক্র নিক্ষিপ্ত হল। শত্রুর শস্ত্র কাটতে কাটতে সুদর্শনচক্র অগ্রসর হল। একে একে বাণের সহস্রবাহু কাটা পড়ল। সুদর্শনচক্র ফিরে এসেছে কৃষ্ণের হাতে। এবার বাণবিনাশে উদ্যত হল চক্র।

মহাদেব ছুটে এলেন। কৃষ্ণকে বললেন: জেনেছি আপনিই জগন্নাথ, পুরুষোত্তম।

কৃষ্ণ দেখলেন রক্ত সমুদ্র। বাণাসুর রক্তে প্লাবিত।

মহাদেব বললেন: প্রসন্ন হোন। আমি অভয় দিয়েছিলাম বাণকে। আমার কথা মিথ্যায় মিশিয়ে দেবেন না। বাণের বাড় আমারই প্রশ্রয়ে। আমিই বর দিয়েছিলাম। আমিই ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।

কৃষ্ণ বললেন: আপনার বর, অতএব জীবিতই থাকুক বাণ। আপনার কথার অমর্যাদা করব না। চক্র সংবরণ করলাম। যে আপনার অভয় পেয়েছে সে আমারও পেয়েছে। আমরা দুজনেই এক, ভেদ করবেন না কোন। আমিও যে, আপনিও সে। এই জগৎও আমারই স্বরূপ। যদি অবিদ্যার আঁধার তাহলেই ভেদবুদ্ধি।

অনিরুদ্ধের কাছে গেলেন কৃষ্ণ। সাপে বাঁধা অনিরুদ্ধ। গরুড়ের আসার আভাস পেয়েই তারা পলায়ন করল।

আবার দ্বারকা। কৃষ্ণ ফিরে এলেন। সঙ্গে ঊষা ও অনিরুদ্ধ। ঊষার ললাটে স্বপ্নসিদ্ধির লাবণ্য॥

৬৮. বারাণসীদাহ

পৌণ্ড্রবংশীয় এক রাজা। যেমন তিনি তেমন তাঁর প্রজা। প্রজারা রাজাবে অবিরত বলত: আপনিই বাসুদেব—আপনিই বাসুদেব। মানুষের শরী ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন মর্ত্যে।

ক্রমে এই রাজা বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। সবাই বলত, তিনিই বাসুদেব। রাজারও মনে হলঃ আমিই বাসুদেব। প্রজারা যখন বলছে তখন অতি অবশ্যই তিনি বাসুদেব।

রাজা নিজেকে বাসুদেব বলে জানলেন। ক্রমে সমস্ত বিষ্ণুচিহ্ন তিনি ব্যবহার শুরু করলেন।

অবশেষে কৃষ্ণের কাছে একদা প্রেরিত হল দূত।

রাজা বলে পাঠিয়েছেনঃ তুমি বাসুদেব নও। অথচ আমার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ কর। এটি ভাল নয়। অতএব ও সব পরিত্যাগ করবে। 'আমি বাসুদেব' —এ অভিমানও ভাল নয়, অতএব পরিত্যাগ করবে। যদি কল্যাণ চাও তাহলে আমার প্রতি প্রণত হও।

দূত এল। কৃষ্ণকে সব জ্ঞাপন করল। কৃষ্ণ হেসে বললেনঃ সত্বরই পরিত্যাগ করব আমার চিহ্ন এই চক্র। তোমার প্রভুকে এই কথাই শুনিয়ো। তাঁর পুরেই আমি যাব। সমস্ত চিহ্ন ধারণ করেই যাব। তাঁর আদেশও তাই। আমি যাব। দেরি নয়, কালই। এবং অতি অবশ্যই। যাব, চক্র ত্যাগ করবে। মনে ভয়, তাকে টিকিয়ে রাখা নয়। অতএব তেমন-তেমন আচরণই করব। তাঁর থেকে আর ভয় থাকবে না কোন।

দূত বিদায় হল।

স্মরণেই এল গরুড়। কৃষ্ণ যাত্রা করলেন পৌণ্ড্রকপুরে।

দূতের মুখে পৌণ্ড্রক সব শুনেছেন। বহুতর সৈন্যে সজ্জিত হয়েছেন। সহায় কাশীরাজ। তাঁরও বিশাল বাহিনী। সুবিশাল বাহিনী কৃষ্ণকে প্রতিহত করতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হল।

দূর থেকে কৃষ্ণ দেখলেন, রাজা আসছেন। হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। বাসুদেব দেখলেন, বাসুদেব আসছেন যুদ্ধে। সাজে ফাঁক নেই কোন। মাল্য, শার্ঙ্গ, শ্রীবৎসচিহ্ন—সবই আছে। ধ্বজে গরুড়ের মত পক্ষী, পরিধানে পীতবস্ত্র। রাজা পৌণ্ড্রক আসছেন, শিরে জ্বলছে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডলের চমক।

ভাবগম্ভীর হাসি, কৃষ্ণ হেসে উঠলেন।

পৌণ্ড্রকবাহিনী। পরম বলশালী। অগণিত অশ্ব, হস্তী। সজ্জিত বহুতর শস্ত্রে। কারো হাতে নিস্ত্রিংশ, ঋষ্টি, কারো হাতে গদা, শূল, শক্তি, কার্মুক। বিশাল আয়োজন।

কৃষ্ণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। শার্ঙ্গ থেকে নির্মুক্ত হল শরনিকর। বিদীর্ণ হল বিপক্ষের শরসমূহ। গদা নিক্ষেপিত হল, চক্র ধাবিত হল। পৌণ্ড্রকের সৈন্যবাহিনী মর্দিত করলেন জনার্দন। কাশীরাজের সেনাপুঞ্জ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হল।

কৃষ্ণ মুখোমুখি হলেন পৌণ্ড্রকের! মূঢ় পৌণ্ড্রক। বাসুদেবাভিমানী পৌণ্ড্রক। কৃষ্ণ বললেন ঃ দূতের মুখে আপনার কথা জেনেছি। আপনার আদেশ পালন করছি। এই চক্র পরিত্যাগ করলাম। এই গেল গদা। আপনার আদেশ। অতএব গরুড় উঠুক আপনার ধ্বজে।

চক্র ও গদায় পৌণ্ড্রক বিদারিত হলেন, প্রোথিত হলেন। গরুড় বিনাশ করল রথের ধ্বজা।

হাহাম্বরে বাতাস পরিপূরিত হল। কাশীরাজ ধেয়ে এলেন। শার্ঙ্গ থেকে শর ছুটল। কাশীরাজের ছিন্নমুণ্ড কাশীপুরীতে এসে পতিত হল। কাশীবাসী বিস্ময় মানল।

কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। মগ্ন তিনি লীলাবিলাসে।

কাশীর লোক বলাবলি করল ঃ কেমন ভাবে হল, কে করল?

রাজপুত্র জানলেন কৃষ্ণের কর্ম। পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। পুরোহিতে রাজপুত্রে মিলে চলল শঙ্করের উপাসনা।

অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে পরম সেবা। মহাদেব মহাতুষ্ট। তিনি প্রকটিত হলেন।

রাজপুত্র প্রার্থনা করলেন ঃ আমার পিতাকে হত্যা করেছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের নাশ চাই। কৃত্যা উত্থান করুন।

মহাদেব বললেন ঃ হবে, অনুরূপই হবে।

দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞ সম্পন্ন হল। মহাকৃত্যার উত্থান হল সেই অগ্নি থেকে।

মহাকৃত্যা। কোপে ক্ষুব্ধ কৃত্যা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ধাবিত হল দ্বারাবতীর দিকে। মুখে প্রচণ্ড বহ্নি। কেশে কেশে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা।

কৃত্যা ছুটছে। মানুষ বিচলিত হল, ভয়ে বিহ্বল হল। সবাই শরণ নিল কৃষ্ণের।

কৃষ্ণ তখন পাশাখেলায় মগ্ন। জানতে পারলেন মহাদেবের প্রসাদে পাওয়া এই কৃত্যা। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করলেন। আদেশ দিলেন ঃ হনন কর এই কৃত্যাকে।

আগুনের মালায় জটিল সেই কৃত্যা। ধক্ ধক্ করে উদ্‌গীর্ণ হচ্ছে মহা অগ্নি। ভয়ংকর, অতি ভীষণ কৃত্যা। পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হল সুদর্শনচক্র। কৃত্যা বিধ্বস্ত হল। পলায়ন করল বেগে। সুদর্শনচক্রও ধাবিত হল পশ্চাতে পশ্চাতে।

কৃত্যা প্রবেশ করল বারাণসীতে। কাশীরাজের সৈন্য এল, প্রমথ সৈন্য এল। কিন্তু দগ্ধ হল। কৃত্যাও দগ্ধ হল। বারাণসীপুরীও জ্বলল, জ্বলল এবং জ্বলল।

রাজা প্রজা, জন্তুজানোয়ার, প্রাসাদ, সৌধ, অট্টালিকা, প্রাকার—সমস্ত

কিছু জ্বলল, পুড়ল, ভস্ম হল।

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিল সুদর্শনচক্র। বারাণসীদাহ যেন তুচ্ছ। প্রস্তুত ছিল যেন আরো ভীষণ কিছুর জন্য। কৃষ্ণের হাতে ফিরে এল চক্র, কিন্তু তখনো সেই ভাব। তখনো সুদর্শনে ভীষণের স্পৃহা ॥

৬৯. বলভদ্রের বল

দুর্যোধনের কন্যা স্বয়ংবরা হবে। অঙ্গে শতসাজ। অপরূপ মনোহর।

মুগ্ধ হল জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব। বলশালী শাম্ব। বলে গ্রহণ করল দুর্যোধনের দুহিতাকে।

বলপ্রয়োগ, অতএব উত্তেজিত হলেন দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ। যুদ্ধ হল। পরাজিত ও বন্দী হল শাম্ব।

যাদব মহলে শাম্বের সংবাদ পৌঁছুলো। তাঁরাও অসহ্য মনে করলেন। বিনাশ করতে হবে ওদের। আয়োজনে তৎপর হলেন যাদবমহল।

মদে বিহ্বল বলভদ্র। স্খলিত বচন। বললেনঃ আমার কথাতেই ফিরিয়ে দেবে শাম্বকে। তোমরা থাকো, একা যাই আমি। নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবে।

বলভদ্র হস্তিনাপুরে এলেন। নগরে প্রবেশ করলেন। রইলেন নগরের বাইরে এক উপবনে।

বলভদ্র এসেছেন। দুর্যোধনেরা জানতে পারলেন। গাভী ও অর্ঘ্যে সম্মান জানালেন বলভদ্রকে। বলভদ্র বলে পাঠালেনঃ শাম্বকে ফিরিয়ে দিন। রাজা উগ্রসেনের আজ্ঞা।

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হলেন। বাহ্লীক ও অন্যান্য কৌরবরা বলতে লাগলেনঃ যদুবংশে জন্ম, রাজ্যেরই যোগ্য নয়। বলভদ্র কে এমন যে তার কথা শুনতে হবে? কৌরবদের উপর আজ্ঞা জারি করে, কোন যাদবের এমন ক্ষমতা? আজ্ঞা করে উগ্রসেন! এর থেকে রাজ্য সিংহাসন ছেড়ে দেওয়া ঢের ঢের বেশি সম্মানের।

অবশেষে কৌরবরা বলভদ্রকে বলে পাঠালেনঃ শাম্ব অন্যায় করেছে, শাম্ব পাপী। আপনার বা উগ্রসেনের কথায় তাকে আমরা কোনমতেই ছাড়তে পারিনে। কুকুর-অন্ধককুলে জন্ম যাঁদের, এককালে তাঁরা প্রণাম জানাতেন আমাদের। এমন এখন নাও যদি করেন আসবে না যাবে না কিছু। ভৃত্য, অথচ প্রভুর উপর আজ্ঞা, কোনকালে কেউ শুনেছে এমন কথা? দোষ হয়ত আমাদেরই। এক আসনে বসেছি, ভোজন করেছি। তাতেই দর্প বেড়েছে এত। প্রীতি ছিল। তাই ন্যায়নীতির বিচার রাখিনি। অর্ঘ্য দিয়েছি আপনাকে।

দিয়েছি ভালবেসে। আপনাদের বংশের যা মর্যাদা তাতে আদৌ পাবার কথা নয় এ। আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। কৃষ্ণের পুত্রকে কোনমতেই মুক্ত করা চলে না। আমরা মুক্তি দেব না।

রাগে দিশেহারা হলেন বলভদ্র। পার্ষ্ণিভাগে তাড়িত করলেন পৃথিবী। পায়ের আঘাতে পৃথ্বী বিদীর্ণ হল। বাহ্বাস্ফোটন করলেন বলভদ্র। চতুর্দিক কাঁপল সেই শব্দে। চোখে আগুন বৃষ্টি হচ্ছে। বললেন: ব্যাটারা নিতান্তই অসার। এত উদ্ধত তাই। ওরাই পৃথিবীর অধিপতি, আমরা যেন বেণোজলে ভেসে এসেছি। তাই হেলা দেখাল উগ্রসেনের আজ্ঞায়। স্বয়ইন্দ্র, তাবৎ দেবমণ্ডল উগ্রসেনের আজ্ঞা পালনে উন্মুখ। সুধর্মা রাজসভায় রাজা উগ্রসেন। ঘেন্না ধরে এদের রাজাসনে। যে উগ্রসেনের ভৃত্যদের স্ত্রীরাও সাজে পারিজাত মঞ্জরীতে এদের মতে সেই উগ্রসেন রাজাই নয় একটা। আজই নাশ করব সমগ্র কৌরবকুল। কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধন দুঃশাসন বাহ্লিক ভূরিশ্রবা সবাইকে শেষ করব। সোমদত্ত শল্য যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব কারো রেহাই নেই। সবগুলোকে শেষ করে শাম্বকে নিয়ে ফিরব দ্বারাবতীতে। কিংবা হস্তিনানগরীকে উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করব ভাগীরথীর জলে। পৃথিবীর ভার হরণ করা হবে। ইন্দ্র তো বহু আগেই অনুরোধ করেছিলেন।

বলভদ্র ক্রোধে চঞ্চল। ক্রোধ বহ্নি হয়েছে। চোখ ফেটে ফেটেফেটে পড়ল সেই বহ্নি।

হস্তিনার প্রাকারে লাঙ্গল বসালেন বলদেব। আকর্ষণ করলেন। দারুণ টান। হস্তিনানগরী কেঁপে উঠল। হস্তিনানগরী ঘূর্ণিত হতে থাকল।

কৌরবরা ভীত হল। বুঝল সব। ছুটে এসে পড়ল বলভদ্রের পায়ে। ক্ষমা করুন, প্রসন্ন হোন আপনি। জানা ছিল না আপনার শক্তি। অপরাধ হয়েছে, মার্জনা করুন। শাম্ব ও তাঁর পত্নীকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেব আমরা। প্রসন্ন হোন।

শাম্বকে ফিরিয়ে দিল কৌরবরা। ভীষ্ম দ্রোণ প্রণামে প্রণামে প্রিয় কথায় প্রসন্ন করলেন বলভদ্রকে॥

৭০. বলভদ্র ও দ্বিবিদ

বানর দ্বিবিদের অত্যাচার বাড়ল, বেড়ে চলল। দৌরাত্ম্যে অস্থির হল দেবতা ও মানুষ।

নরকের সখা দ্বিবিদ। নরক নিহত হল। দ্বিবিদ চাইল শোধ তুলতে। মহা শক্তি তার। দর্প তাই প্রচণ্ড।

দ্বিবিদ ঠিক করল, ধ্বংস করে বেড়াবে তাবৎ যাগযজ্ঞ। যদি যজ্ঞধ্বংস, তবে সর্বলোকক্ষয়। লোক রইল না, যজ্ঞও হবে না। যজ্ঞে দেবতাদের প্রীতি। যজ্ঞ নেই, দেবতাদের কষ্ট। অতএব যজ্ঞই হল দ্বিবিদের লক্ষ্য। জগতে যত যজ্ঞ, নষ্ট করে ফিরল দ্বিবিদ।

দ্বিবিদ নিরঙ্কুশ। দৌরাত্ম্যে শোষণ করতে থাকল জগতের তাবৎ স্বস্তি। মান পেলেন না সাধুরা। হত মান হলেন দ্বিবিদের হাতে। শতশত মানুষ মরতে থাকল, গ্রাম জ্বলল, নগর জ্বলল, বন জ্বলল ; পুড়ে পুড়ে ছাই হল।

পর্বত নিক্ষেপ করেছে দ্বিবিদ। গ্রামকে গ্রাম গুঁড়িয়ে গেল। পর্বত নিক্ষেপ করল সমুদ্রে। সমুদ্র উতলা হল। গ্রাম ভাসল। কখনো নিজেই গিয়ে পড়ত সমুদ্রে। জল ক্ষোভিত হত। সমুদ্র অস্বীকার করত তটবন্ধন। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর জলে জলে জলাকার হত।

কামরূপী বানর। নানা রূপ ধরে। রূপে রূপে গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করে. চূর্ণবিচূর্ণ কবে। দ্বিবিদ হয়ে দাঁড়াল মূর্তিমান এক অকল্যাণের নাম। জগৎ ভরল দুঃখে। স্বাধ্যায় গেল বষট্কার গেল। দ্বিবিদেরই জয়জয়কার।

রৈবতের উদ্যান। বলভদ্র আছেন, রেবতী আছেন, আরো আছেন অন্যান্য স্ত্রী। ওঁরা মদ্যপান করছিলেন। মদ, সঙ্গে সঙ্গীত, রম্যরমণী—আবেশ বিহ্বলতা। বিলাসের বন্যা। রৈবত উদ্যান নয়, মন্দর পর্বত। বলভদ্র নন, কুবের। মন্দরপর্বতে লীলারত কুবের।

দ্বিবিদ এল, মুষল ও হল নিল। বিড়ম্বনা করল শত। রমণীদের সামনে হাসল--নানান রকমের হাসি। মদেভরা পানপাত্র ছুঁড়ে ছুড়িয়ে ভেঙ্গে চুরে তছনছ কবল।

বলভদ্র ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু গ্রাহ্য নেই দ্বিবিদের। অবজ্ঞা দেখাল, কিলকিলা ধ্বনি করল।

বলভদ্রকে উঠতে হল—মুষলধারী বলভদ্র। দ্বিবিদও তুলে নিল পাহাড়ের মতো এক পাথর। ছুঁড়ে মারল বলভদ্রকে। মুষলের আঘাতে হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠল বানর। মুষল পেরিয়ে পড়ল এসে বলভদ্রের উপর। আঘাতের পর আঘাত করল বলভদ্রের বুকে। বলভদ্র করতলে আঘাত হানলেন বানরের বুকে। রুধির বমন করতে থাকল দ্বিবিদ। অবশেষে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মহাভার তার দেহের। তারই পতন, গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ হল, যেন বজ্র পড়েছে পাহাড়ে।

আকাশ থেকে দেবতারা ফুল বৃষ্টি করলেন। বলভদ্রকে স্তুতি করলেন ঃ জগৎ তাপিত হয়েছিল। আপনি স্বস্তি আনলেন। দুরন্ত ঐ বানরের বিনাশ ঘটিয়েছেন। মহাকর্ম করেছেন। ধন্য আপনি। আপনি ছিলেন, তাই স্বর্গবাসে রুচি এল ফিরে॥

৭১· যাদবকুলের উৎসাদন

নতুন যৌবন, অতএব উন্মত্ততা, বিচিত্র কাজে জাগে খেয়াল। যদুকুমাররা উন্মত্ত। খেয়াল জেগেছে।

মহাতীর্থ পিণ্ডারক। যদুকুমাররা দেখলেন, বিশ্বামিত্র আসছেন, সঙ্গে কণ্ব ও নারদ।

শাম্বকে সাজানো হল রমণীবেশে। রমণীবেশে রমণীয় শাম্ব। মুনিরা সমাগত। যদুকুমাররা প্রণিপাত জানালেন। বললেনঃ সন্তান চায় বভ্রু। এটি বভ্রুর স্ত্রী। যদি বলে দেন পুত্র না কন্যা হবে তাহলে বভ্রু নিশ্চিন্ত হয়।

দিব্য জ্ঞান ঋষিদের। ওঁরা বুঝলেন, প্রতারণা। ক্রুদ্ধ হবার কথা, হলেনও। বললেনঃ মুষল প্রসব করবে এবং সেই মুষলেই নিশ্চিহ্ন হবে যদুকুল।

ঋষিদের শাপ। উগ্রসেন সব শুনলেন। মুষল প্রসব করল শাম্ব। গুঁড়িয়ে চূর চূর করা হল সেই মুষল তারপর ফেলা হল সমুদ্রে। সমুদ্র পরিণত হল এরকাবনে। মুষলের সব খণ্ডই চূর্ণ হল। হল না তোমরের মতো একটা খণ্ড। এটিও নিক্ষিপ্ত হল সমুদ্রে। খণ্ডটি গেল একটি মাছের পেটে।

মাছ ধরা হচ্ছে সমুদ্রে। ধরা পড়ল মাছটি। কোটা হল। মুষলের খণ্ডটি পাওয়া গেল। জরা এক ব্যাধের নাম। সেই নিল মুষলের সেই খণ্ড।

সবই কৃষ্ণ জানতেন। বিধাতার ইচ্ছা, অন্যথা করতে চাইলেন না।

দেবগণ দূত পাঠিয়েছেন। দূত বলল কৃষ্ণকেঃ দেবগণের কথা, নিবেদন করব একান্ত একান্তে।

দূত বললঃ ইন্দ্র বলেছেন, একশো বছর পেরুল আপনি এখানে আছেন। পৃথিবীর ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। দুর্বৃত্তেরা নিহত। উদ্দেশ্য সংসাধিত। এবার স্বর্গে চলুন। দেবগণ মিলিত হতে চান আপনার সঙ্গে। অবশ্য সবই আপনার অভিরুচি। যদি পৃথিবীতে থাকতে ইচ্ছে থাকে, থাকুন। দেবতারা শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যা কর্তব্য তাই করছেন।

কৃষ্ণ বললেনঃ এখনো বাকি। যাদবকুলের উৎসাদন না হলে পুরোপুরি ভার হরণ হবে না পৃথিবীর। ক্ষয় শুরু করিয়েছি। সাতটি মাত্র রাত আর। সাত রাতেই সম্পূর্ণ হবে উৎসাদন। সমুদ্র থেকে দ্বারকাপুরী গ্রহণ করেছি, ফিরিয়ে দেব। যাদবকুল সংহার করব। তারপরই মানুষের শরীর ছাড়ব। স্বর্গে গিয়ে মিলব দেবতাদের সাথে। আমি স্বর্গে পৌঁছেই গেছি, ইন্দ্র যেন এই রকমই মনে করেন। যদুকুমারদের ভার কম নয়। জরাসন্ধদের মতোই।

দেবদূত, দিব্যগতি। স্বর্গে গেল দূত।

দ্বারকাপুরীতে উৎপাত শুরু হয়েছে। বিচিত্র উৎপাত। কৃষ্ণ দেখেন। মনে

মনে বোঝেন, বিনাশের ঘণ্টা বেজে উঠেছে।

যাদবদের বললেন: বিনাশের ছায়া ঘনিয়েছে। দেরি নয়। সবাই চল প্রভাসতীর্থে, শান্তি করি উৎপাতের।

প্রণতি জানিয়ে উদ্ধব বললেন: যা কর্তব্য আপনিই তার আদেশ দিন। এ সব উৎপাত নাশেরই সূচক। মন বলছে যদুকুলের সংহার করবেন আপনি।

কৃষ্ণ বললেন: আমার প্রসাদে দিব্য তোমার গতি। যাও। গন্ধমাদন পর্বতে পুণ্য বদরী আশ্রম। নরনারায়ণের স্থান বদরী। বদরী আশ্রম আছে, পৃথিবী পবিত্র হয়েছে। যাও। তপস্যা কর সেই তীর্থে। আমার প্রসাদ পাবে, অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। যাদবকুলের উৎসাদন, তারপর আমার স্বর্গে গমন। এ লোক ছাড়ব, দ্বারকাপুরী ভাসবে সাগরের জলে। যাও, দেরি নয়।

উদ্ধব গেলেন বদরী আশ্রমে।

কৃষ্ণ ও বলরাম চললেন, যাদবগণও চলল। দ্রুত ছুটল রথ।

অতঃপর প্রভাসতীর্থ। কৃষ্ণের কথায় যাদবরা স্নান করল, সুরার স্রোতে ভাসল।

কলহের সূত্রপাত ঘটল। কলহ প্রবল হল। হয়ত নিয়তিরই চক্রান্ত। যাদবরা শস্ত্র ধারণ করে পরস্পর পরস্পরকে হনন শুরু করল। অস্ত্র ফুরুল। কাছেই এরকাবণ। এরকা দিয়েই চলল আঘাত প্রত্যাঘাতের খণ্ড প্রলয়। নিয়তিরই চক্রান্ত। এরকা নয়, বজ্র যেন। নিঃশেষে নিঃশেষিত হয়ে চলল বহুতর যাদব। প্রদ্যুম্ন শাম্ব কৃতবর্মা সাত্যকি অনিরুদ্ধ পৃথু বিপৃথু চারুবর্মা চারুক অক্রূর সবাই আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হল।

হানাহানি। কৃষ্ণ নিবারণ করতে চাইলেন। কিন্তু ফল হল অন্য। কৃষ্ণ প্রতিপক্ষের সহায়—সবার মনে এই ধারণা। নিবৃত্ত হল না কেউ। তীব্র হল, তীব্রতম হল সংঘর্ষ।

কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হলেন। এরকামুষ্টি গ্রহণ করলেন। এরকামুষ্টি হল লৌহময় মুষল। যাদবরা নিঃশেষিত হতে চলল।

দারুক দাঁড়িয়ে দর্শকের ভূমিকায়। কৃষ্ণের রথ জৈত্র। রথের অশ্ব দারুককে মানল না। রথ নিয়ে চলল সমুদ্রে। শঙ্খ চক্র গদা শার্ঙ্গ তূণ অসি প্রদক্ষিণ করল কৃষ্ণকে। আকাশ পথে উঠল, স্বর্গে চলল।

যাদবরা সবাই নিহত। কৃষ্ণ রইলেন, আর রইলেন দারুক। ঘুরতে ঘুরতে চলতে চলতে ওঁরা দেখলেন, বৃক্ষ মূলে বলভদ্র। প্রকাণ্ড এক সর্প নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে বলভদ্রের মুখ পথে। সর্প সমুদ্রে প্রবেশ করল। সিদ্ধরা এলেন, উরগগণ এল, স্তব করল। সমুদ্র এল, হাতে তার অর্ঘ্য। পূজা সমাপন হল। অনন্ত সর্প প্রবিষ্ট হল জলমধ্যে।

কৃষ্ণ দেখছিলেন এতক্ষণ। দারুককে বললেন এবার উগ্রসেন ও বসুদেবকে এসব বলো। বলো বলভদ্র নির্বাণলাভ করেছেন, যাদবরা বিনষ্ট, আমিও যোগে বসব—দেহ ছাড়ব। দ্বারকাবাসীদের বলো, আহুককেও বলো দ্বারকা প্লাবিত হবে সমুদ্রে। অর্জুন যাবেন দ্বারকায়। সে পর্যন্ত যেন তারা অপেক্ষা করে। অর্জুন নিষ্ক্রান্ত হবেন, দ্বারকাপুরী জলময় হবে। তারা যেন অর্জুনের অনুসরণ করে।

কৃষ্ণ আরো বললেন ঃ অর্জুনকে বলো, আমার পরিবারবর্গকে সাধ্যমতো যেন পালন করেন। অর্জুনের সঙ্গে দ্বারকার লোকেদের নিয়ে তুমি যেও। বজ্রকে যদুবংশের নরপতির আসনে অভিষিক্ত করো।

প্রণামে প্রদক্ষিণে কৃষ্ণকে ভজনা করে দারুক চলে গেলেন। অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন। বজ্রকে নৃপতির আসনে বসালেন।

বাসুদেবাত্মক পরমব্রহ্ম। সর্বভূতে সমভাবে পরমব্রহ্ম। সেই তাঁকেই ধারণায় ধারণ করতে লাগলেন কৃষ্ণ।

দুর্বাসার কথা ফলল। মান পেল কৃষ্ণেরই ইচ্ছায়।

যোগাসনে কৃষ্ণ। জরা এল। হাতে বাণ। বাণের মুখে সেই মুষলখণ্ড। কৃষ্ণের চরণ। দূর থেকে মনে হল মৃগ। চরণের তলদেশ বিদ্ধ হল সেই বাণে।

কাছে গেল। এক দিব্যমানুষ, চারবাহু। জরা দেখল। বিস্মিত হল। নিজের ভুল বুঝল। বলল ঃ মৃগবোধে করেছি এ কর্ম, প্রসন্ন হয়ে মার্জনা করুন। পাপে পুড়েছি, আর পোড়াবেন না। ক্ষমা করুন।

কৃষ্ণ বললেন ঃ কোন ভয় নেই। দেবালয়ে গতি হবে তোমার।

বিমান এল। জরা গেল স্বর্গে।

অতঃপর কৃষ্ণের দেহত্যাগ॥

৭২. অর্জুনের পরাজয়

কৃষ্ণ দেহ রেখেছেন। বলরাম দেহ ছেড়েছেন। যাদবগণ বিনষ্ট হয়েছে।

কৃষ্ণ ও বলরামের দেহ অর্জুন সৎকার করলেন। অক্লান্ত অন্বেষণে মিলল প্রধান যাদবের দেহ। অর্জুন সৎকার করলেন।

চিতায় কৃষ্ণ। রুক্মিণী প্রমুখ আটজন মহিষী হরির দেহ আলিঙ্গন করে আগুনে প্রবেশ করলেন। চিতায় বলরাম। রেবতী সহমরণে চললেন। রামের দেহ আলিঙ্গন করেছেন রেবতী। আগুন শীতল। রেবতীর অনন্ত আহ্লাদ। আগুন তাঁকে দান করল শান্তির আরাম।

সংবাদ গেল। উগ্রসেন রোহিণী দেবকী ও বসুদেব আগুনে প্রবেশ করলেন।

অর্জুন প্রেতকার্য সম্পন্ন করলেন।

সঙ্গে বজ্র, সহস্র কৃষ্ণপত্নী, আরো অনেকে। অর্জুন নিষ্ক্রান্ত হলেন দ্বারকা থেকে।

কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করেছেন। পারিজাত তরু স্বর্গে গেছে। সুধর্মাও ইন্দ্র সভা হল। পৃথিবীতে কলি প্রকট হল। দ্বারকাপুরী প্লাবিত হল। কৃষ্ণের গৃহ রক্ষা পেল। সমুদ্র গ্রাস করল না। কৃষ্ণের গৃহ! পরম পবিত্র, মন্দির। যদি দর্শন, পাপ নাশ হয় তবে, আসে মুক্তি।

ধনধান্যে ভরা পঞ্চনদদেশ। অর্জুন দ্বারকাবাসীদের বসতি স্থাপন করালেন এই পুণ্য দেশে।

অর্জুন চলেছেন। হাতে ধনু। সঙ্গে কৃষ্ণের পত্নীবর্গ। আভীর দস্যুরা লুব্ধ হল। পরামর্শ আঁটল। বলল। একা, অথচ নির্বিঘ্নে আমাদের অতিক্রম করছে। আমরা কি হতবল হয়েছি? ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ বধ করে অর্জুন অহংকৃত। আমাদের পরাক্রম জানে না, তাই অহংকার। অন্যথায় হত হ'ত অহংকার। লাঠি তুলে নাও সবাই। দেখছ না চলনে ফেটে পড়ছে কেমন অবজ্ঞা!

হাজার হাজার আভীর দস্যু লাঠি ধরল। বহু রমণী, সঙ্গে মাত্র অর্জুন রক্ষক। দস্যুরা রমণীদের প্রতি ধাবিত হল। অর্জুন হেঁকে বললেন: নিতান্তই দেখছি অধর্মে মতি, মরতে যদি না চাস তাহলে নিবৃত্ত হ।

দস্যুরা কান করল না অর্জুনের কথায়। কৃষ্ণের স্ত্রীদের গ্রহণ করল।

গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করতে চাইলেন অর্জুন। কিন্তু পারলেন না। অনেক কষ্টে যদিও বা পারলেন, শিথিল হল পরমুহূর্তেই। অস্ত্রক্ষেপ করবেন, চেষ্টা করলেন অনেক, কিন্তু মন্ত্র এল না মনে। ক্রুদ্ধ হলেন অর্জুন। শরক্ষেপ করলেন। কিন্তু দস্যুদের মর্ম বিদ্ধ হল না। অর্জুন যুদ্ধ করতে লাগলেন। অগ্নির দেওয়া অক্ষয় তূণ। কিন্তু ক্ষয় হল অবশেষে।

অর্জুন বুঝলেন: সবই কৃষ্ণের বল। তাঁর বলেই আমার বল। তাঁর বলেই আমার জয়।

অর্জুন আজ হতবীর্য। রমণীদের রক্ষা তিনি করতে পারলেন না। তাঁরই সামনে দস্যুরা তাদের টেনে হিঁচড়ে হরণ করল! কেউ কেউ ইচ্ছে করেই দস্যুদের অনুগমন করল।

অর্জুন ক্ষিপ্ত হলেন। ধনু ব্যবহার করলেন লাঠির মতো। প্রহার করতে লাগলেন অর্জুন। কিন্তু দস্যুরা উপহাসে উপহাসে আরো প্রচণ্ড হল।

মহাবীর অর্জুন রক্ষক। অথচ যদুকুলের শ্রেষ্ঠ রমণীগণ অপহৃত হল।

অর্জুন রক্ষা করতে পারলেন না।

দুঃখে দুঃখে দগ্ধ অর্জুন। অবশেষে ভেঙ্গে পড়লেন কান্নায়। বিলাপ করলেন: উঃ কি কষ্ট! কি কষ্ট! অবশেষে ভগবান বঞ্চনা করলেন। অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণে দান করলে যেমন নষ্ট হয় সব, তেমনি অস্ত্রশস্ত্র, গাণ্ডীব, অশ্ব, রথ সব নষ্ট হল! দৈবই হয়ত সব। কৃষ্ণ নেই, তাই আমি বলহীন, তাই এই পরাজয়। আমি আছি, সেই অর্জুনই আছি, কিন্তু কৃষ্ণ নেই, অর্জুন আজ হতবল। আমার বলবীর্য সবই কৃষ্ণের প্রসাদ।

অর্জুন মথুরায় এলেন। বজ্রকে রাজা করলেন।

ব্যাস বসে বনে। অর্জুন এলেন ব্যাসের কাছে। ব্যাসের চরণে পতিত অর্জুন।

ব্যাসের কেমন মনে হল। ভাল করে দেখলেন তাকিয়ে। বিস্মিত হলেন। বললেন: এত শ্রীহীন কেন তুমি? নিষিদ্ধ অজাদির ধূলির অনুগমন করেছ নাকি? ব্রহ্মহত্যা করনি তো? নাকি বড় আশা ছিল কোন, ভঙ্গ হয়েছে অবশেষে? কিসে এমন হল? দিব্য কান্তি যেন অপহৃত!

: তোমাকে বিবাহ করতে চেয়েছে, তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ—এমন কি ঘটেছে কিছু? অগম্যা স্ত্রীতে রত হওনি তো? তা না হলে কেন এমন বিবর্ণ?

: ব্রাহ্মণদের না দিয়ে একা কি মিষ্টান্ন ভোজন করেছ? কৃপণের ধন হরণ করনি তো? নাকি শূর্পের বাতাস লেগেছে শরীরে?

: দৃষ্টিতেও অনেকের বিষ। বিষ চোখে কি কেউ চেয়েছিল? নাকি প্রহৃত হয়েছ? এর কোনটি না হলে দেহ কেন হবে এত বিবর্ণ?

: নখের জল লাগতে পারে গায়ে। ঘট উছলে পড়া জলে স্নান করলেও হতে পারে। হীনবলের কাছে পরাজিত হলেও এমনটিই হয়। হয়েছে কি এসব? না হলে এমন হতশ্রী হবার কথা তো নয়।

অর্জুন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। লজ্জার ইতিহাস বর্ণনা করলেন। বললেন: আমাদের বলবীর্য তেজ পরাক্রম ও কান্তি সবের কারণ যিনি তিনি আজ নেই। হরি নেই। ত্যাগ করেছেন আমাদের। আমার গাণ্ডীব, শস্ত্র ও শর যাঁর প্রসাদে ছিল অমোঘ, তিনি নেই। যাঁর কল্যাণে সর্বত্র সর্বদা শ্রী সম্পদ জয় আমাদের আলিঙ্গন করে থাকত, তিনি আজ নেই। কৃষ্ণ নেই। বিরহে আমি কাতর। শুধু আমি নই। পৃথিবীও বুড়িয়ে গেছে তাঁর অভাবে। শ্রী নেই, যৌবন নেই। কৃষ্ণ পাশে ছিলেন, ভীষ্ম ও অন্যান্য বড় বড় বীর পরাজিত হয়েছিলেন আমার হাতে। কৃষ্ণ আজ অন্যলোকে, পরাভূত হয়েছি গোপালদের কাছে। ত্রিলোক-জোড়া খ্যাতি গাণ্ডীবের। আজ যষ্টির কাছে গাণ্ডীব পরাজিত। আমি ছিলাম রক্ষক। ভগবানের সহস্র স্ত্রী আসছিলেন সঙ্গে। দস্যুরা হরণ করল তাঁদের। লগুড়ের বলের কাছে ব্যর্থ হল আমার রক্ষণ

চেষ্টা। আমার শ্রী নেই এতে বিস্ময়ের আর কি আছে। বেঁচে আছি এইটেই আশ্চর্যের। অপমান হল প্রচণ্ড, কিন্তু কলঙ্কবোধ গেছে, লজ্জা গেছে, আমি বেঁচে আছি।

ব্যাস বললেন ঃ লজ্জা ও শোক এর কোনটিই সাজে না তোমাকে। কালের চক্রই এমনিধারা। কালের অধীন নয় এমন তো কিছুই নেই। অতএব শান্ত হও। মনে শান্তি আনো। বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রয়োজনে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে ধরার ভার হরণ হয়েছে, তিনি গত হয়েছেন। সৃষ্টির সময় যেমন সৃষ্টি, তেমনি স্থিতির সময় স্থিতি, বিনাশের সময় বিনাশ ঘটানোই তাঁর কাজ। তাঁর কাজ তিনি করেন। তুমি একা। ভীষ্ম দ্রোণ পরাজিত হলেন। হীনের কাছেই তো এ পরাজয়। আদিতে বিষ্ণুর প্রভাবে ঐ জয়, আবার শেষে তোমার এই পরাজয় এও বিষ্ণুরই অনুভাব। যে-তোমার হাতে গাঙ্গেয়ের পরাজয় সেই তুমিই পরাজিত আভীরদের হাতে। সবই বিষ্ণুর লীলা।

ঃ বৃত্তান্ত বলছি শোন—অষ্টাবক্র ঋষি। ব্রহ্মচিন্তায় বহুকাল ধরে জলে বাস করছিলেন। দেবতারা অসুর জয় করে এই সময় সুমেরু পর্বতে মহা এক উৎসব করলেন। রম্ভা, তিলোত্তমা, শতশত স্বর্গসুন্দরী চলেছেন এই উৎসবে যোগ দিতে। পথে ওঁরা দেখলেন অষ্টাবক্র ঋষিকে। জলে আকণ্ঠ ডুবে আছেন তিনি। অপ্সরারা স্তব করল ঋষির। যাতে প্রসন্ন হতে পারেন এমনভাবেই তাঁরা স্তব করলেন।

অষ্টাবক্র প্রসন্ন হলেন। বললেন ঃ বর প্রার্থনা কর। দুর্লভ হলেও প্রদান করব।

রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বলল ঃ আপনি প্রসন্ন, সব পাওয়াই তো পাওয়া হল। অন্যান্য অনেকে বলল ঃ যদি প্রসন্ন তবে এই বর দিন যেন পুরুষোত্তমকে আমরা পতিরূপে লাভ করতে পারি।

ঃ তাই হবে।

জল থেকে উঠে এলেন অষ্টাবক্র।

অপ্সরারা ভাল করে দেখল। অষ্টাবক্রের বক্ররূপে হাসি রোধ করতে পারল না। লুকোতে গিয়েও লুকোতে পারল না হাসি। বরং প্রকট হল আরো।

ঋষি বললেন ঃ হাসছ, অপমান করছ আমাকে? কর। পুরুষোত্তমকে পতিরূপে অবশ্যই পাবে। কিন্তু আমি শাপ দিচ্ছি—পাবে অথচ অবশেষে পতিত হবে দস্যু হাতে।

অপ্সরারা অনেক করে ঋষিকে সন্তুষ্ট করল। ঋষি বললেন ঃ দস্যু হাতে পড়ার পর স্বর্গে যেতে পারবে।

অষ্টাবক্রের শাপ। কৃষ্ণকে স্বামী হিসেবে পেল। কিন্তু অবশেষে দস্যুদের হাতেও পড়তে হল। এর জন্য তোমার শোক সাজে না আদৌ। তিনিই নিজ

কুলের নাশ করলেন। তোমাদের নাশও আসন্ন। তাই বলবীর্য সবই আস্তে আস্তে অপহৃত হচ্ছে। জন্ম হলেই মৃত্যু নিশ্চিত। উন্নতি হলেই পতন, যেমন সংযোগ ঠিক তেমনি বিয়োগ, সঞ্চয় সত্য ক্ষয়ও অনিবার্য। পণ্ডিতরা এসব বোঝেন। তাই শোকও নয়, হর্ষও নয়। দুইই ত্যাগ করে চলেন তাঁরা। এবার রাজ্য ছেড়ে ভাইদের সঙ্গে বনে গমন কর। তপস্যায় নিরত হও। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ। ওঁকে বলো। ব্যবস্থা করবেন বন গমনের ।।

৭৩. কলির মহিমা

মুনিতে মুনিতে মতান্তর, মনান্তর হবার উপক্রম।

কোন্ কালে নামমাত্র ধর্ম করে অনেক ফলের ভাগী হওয়া যায়—এই নিয়ে বিতণ্ডা।

মতের অরণ্যে পথ হারালেন মুনিরা। সংশয় পাকা হয়ে বাসা বাঁধল মনে। অবশেষে সবাই মিলে এলেন ব্যাসের কাছে। তিনিই পারেন সংশয়ের মেঘ উড়িয়ে দিতে।

ব্যাস তখন জাহ্নবীর জলে। স্নান সাঙ্গ হয়নি। অর্ধস্নাত অবস্থায় ব্যাস দাঁড়িয়ে জলে।

গাছের ছায়ায় মুনিরা অপেক্ষা করলেন। স্নান সারা হোক ব্যাসের। মুনিরা ধৈর্য ধরলেন।

ব্যাস জল থেকে উঠলেন। নিজে নিজেই বললেনঃ কলিই ভাল, কলিই ধন্য।

মুনিরা শুনতে পেলেন। ব্যাস আবার জলে নামলেন। ডুব দিলেন। উঠলেন। বললেনঃ শূদ্রই ধন্য।

আবার জলে নামলেন। ডুব দিয়ে উঠে বললেনঃ স্ত্রীরাই সাধু, ধন্য, ধন্যতর।

স্নান সারা হল। নিত্যক্রিয়া শেষ হল। ব্যাস আশ্রমে ফিরে এলেন। মুনিরাও এলেন তাঁর পিছু পিছু।

অভিবাদনের আদান প্রদান হল। মুনিরা বসলেন। ব্যাস সুধোলেনঃ কি কারণে আপনাদের আগমন?

মুনিরা বললেনঃ একটি বিষয়ে সংশয়ে পড়েছিলাম। নিরসনের জন্যেই আমাদের আসা। কিন্তু সে এখন থাকুক।...স্নান করছিলেন, করতে করতে বারবার বলছিলেন কলিই সাধু, শূদ্রই সাধু, স্ত্রীরাই সাধু। বলতে যদি বাধা না থাকে তাহলে এই ব্যাপারটিই আমাদের বলুন।

সামান্য হাসলেন ব্যাস। বললেনঃ সত্যযুগে দশ বছর, ত্রেতায় একবছর, দ্বাপরে একমাস তপশ্চরণে ও ব্রহ্মচর্যে বা জপে যে ফল পাওয়া যেত কলিতে ঠিক সেই ফলই মেলে মাত্র একদিন ও রাতের শ্রমে। এই জন্যেই কলিকেই ভাল বলেছি। ধ্যানযোগ কত ক্লেশসাধ্য, যজ্ঞও কম কঠিন নয়। পূজা অর্চনাও নামসংকীর্তন থেকে আয়াসের। কিন্তু মজা এই, সত্যযুগে ধ্যানযোগে, ত্রেতায় নানা যজ্ঞ করে, দ্বাপরে বহু পূজো অর্চনা করে যে ফল পাওয়া যেত কলিতে ঠিক তাইই মেলে মাত্র হরিনাম সংকীর্তনে। সামান্য আয়াস, অথচ কত পুণ্যার্জন। অন্যযুগে নয়, কলিতেই সম্ভব। তাই বলেছি কলিই ভাল।

ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মচর্যব্রত করেন, বেদ অধ্যয়নের অধিকার পান। তারপর বহু অধ্যয়ন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। কোন ফাঁক থাকলে চলবে না। কখনো যদি অসংযম এসে যায়, বৃথা বাক্য বলেন, বৃথা ভোজ্যে বা যজ্ঞে সময় যায় বয়ে তাহলেই ঘটত ধর্মচ্যুতি। কর্তব্যে সামান্য ত্রুটি হলেই পাপ। ইচ্ছে প্রচণ্ড অথচ সাধমতো পানভোজন করলে চলবে না। সদাসর্বদা তাঁরা শাস্ত্রের দাস। অনেক কষ্ট করে ধর্ম অর্জন করতে পারলেই পরলোকে তাঁদের সদ্গতি। কিন্তু শূদ্রদেরও সদ্গতি হয় এবং হয় সামান্য ব্রাহ্মণ সেবাতেই। তাই বলেছি, ধন্য ধন্য করেছি, শূদ্রদের। কোনটা খাদ্য কোন্টা অখাদ্য, কোন্টা উচিত কোন্টা অনুচিত এ সম্পর্কে ওদের কোন নিয়মই নেই। যাই করুক পাপ নয় কিছুতেই। তাই ধন্য বলেছি ওদের।

পুরুষদের দেখ। শাস্ত্রের নিয়ম, ধর্মমতো ধন উপার্জন করতে হবে, সৎপাত্রে অর্পণ করতে হবে, যাগযজ্ঞ করতে হবে। এতে বেশ ক্লেশ। এ ছাড়াও আরো কত কিছু রয়েছে কষ্টের। এ সব পুরো কর, তবেই হবে দিব্যগতি। অথচ স্ত্রীলোকেরা মাত্র স্বামীর শুশ্রূষা করেই দিব্য গতি পায়। তাই বলেছি স্ত্রীলোকেরাই ধন্য, যথার্থই ধন্যতর।

এবার আপনাদের কথা বলুন, যদি পারি যথাযথ উত্তর দেব।

মুনিরা বললেনঃ যা আমাদের জিজ্ঞাসা তার উত্তর আপনার কথা থেকেই পেয়ে গেছি।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন সামান্য হাসলেন। বললেনঃ দিব্যজ্ঞানবলে সবই জেনেছিলাম আমি। তাই ঐ সাধু সাধু ধন্য ধন্য করেছি। সৎবৃত্তির আচরণ করেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সামান্য আয়াসেই অশেষ ধর্ম অর্জন করা যায়—কলিতেই এ সম্ভব, অন্যকালে নয়। আর কি বলতে পারি বলুন?

মুনিদের সংশয় দূরে গেল। তাঁরা ব্যাসের স্তুতি করে ফিরে এলেন॥

৭৪· কেশিধ্বজ ও খাণ্ডিক্যজনক

রাজা ধর্মধ্বজের দুই পুত্র। মিতধ্বজ ও কৃতধ্বজ। মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্যজনক, কর্মমার্গে পরম নিপুণ। কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজের নৈপুণ্য অধ্যাত্মবিদ্যায়।

খাণ্ডিক্যজনক চাইতেন কেশিধ্বজের উপরে উঠতে, কেশিধ্বজ চাইতেন খাণ্ডিক্যকে নীচে ফেলতে।

অবশেষে দিন এল। খাণ্ডিক্যই রাজ্যভ্রষ্ট হলেন।

দুর্গম বনে রাজ্যহীন রাজা খাণ্ডিক্যজনক। সঙ্গে মন্ত্রী, পুরোহিত ও কয়েকজন পরিজন।

কেশিধ্বজ রাজা হয়েছেন। জ্ঞানী তিনি। জানেন অবিদ্যায় মৃত্যু। তাই বহুতর যজ্ঞ করলেন। মৃত্যু থেকে নিস্তার পেতে হবে। রাজা যজ্ঞ করেন, যাগে একাগ্র হন।

যোগে মগ্ন কেশিধ্বজ। ধর্মধেনু নিহত হল বাঘের হাতে। রাজা পুরোহিতদের সুধোলেন ঃ কি এর প্রায়শ্চিত্ত ?

পুরোহিতরা বললেন ঃ আমরা জানিনে, কশেরুকে জিজ্ঞাসা করুন।

কশেরু বললেন শুনকের কথা।

শুনক বললেন ঃ পৃথিবীতে কেউই আমরা এ বিষয় কিছু জানিনে। একমাত্র যিনি জানেন তিনি আপনার শত্রু, খাণ্ডিক্যজনক।

দেশিধ্বজ বললেন ঃ তার কাছেই যাব। যদি হত্যা করে সে তাহলেও আমার পাওয়া হবে যজ্ঞফল। যদি যথাযথ বলে তাহলেই যজ্ঞ সম্পন্ন হবে।

রথে কেশিধ্বজ। এসেছেন বনে, খাণ্ডিক্যের কাছে। কৃষ্ণাজিন ধারণ করে রাজা কেশিধ্বজ এসেছেন রাজ্যচ্যুত শত্রুর কাছে বিধান নিতে।

খাণ্ডিক্য ক্রোধে আত্মহারা হলেন। ধনু সজ্জিত করলেন। বললেন ঃ কৃষ্ণাজিনের কবচ পরে এসেছ। ভেবেছ বধ করব না, অথচ তুমি করবে সুযোগ বুঝে। কিন্তু তোমার কবচ মিথ্যা। আমরা কি মৃগ বধ করিনি কোনকালে ? তাদের গায়ে কি কৃষ্ণাজিন থাকত না ? বৃথা ছল। তোমাকে আমি বধ করব। জীবন থাকতে পার পেতে দেব না শত্রুকে।

কেশিধ্বজ বললেন ঃ হত্যা করব বলে আসিনি। সংশয়ে পড়েছি। জিজ্ঞেস করব বলে এসেছি। ক্রোধ সংবরণ করুন, শর সংহরণ করুন।

খাণ্ডিক্য পুরোহিত ও মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। তাঁরা বললেন ঃ শত্রু যখন হাতের মুঠোয় তখন বধ করাই কর্তব্য। তাতে লাভও কত। পৃথিবী হবে আপনার বশীভূত।

খাণ্ডিক্য বললেনঃ মিথ্যে নয়। তবে ওর জয় হবে পরলোক আর আমার ইহলোক। যদি বধ না করি আমার হবে পরলোক, ওর থাকবে মাত্র বসুন্ধরা। পরলোক জয় অনন্তকালের জয়, আর পৃথিবী জয় মাত্র অল্প কয়েক দিনের। অতএব বধ নয়, উত্তরই দেব।

খাণ্ডিক্যজনক কেশিধ্বজকে বললেনঃ কি জিজ্ঞাসা আপনার?

কেশিধ্বজ আনুপূর্বিক সমস্ত বললেন। খাণ্ডিক্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান দান করলেন।

কেশিধ্বজ যজ্ঞভূমিতে ফিরে এলেন। সমস্ত সম্পন্ন হল। অবশেষে সম্পন্ন হল যজ্ঞ। যজ্ঞাবশেষ স্নানে কৃতকৃত্য হলেন রাজা। ভাবলেন, সবাই সব পেল, সমস্ত সম্পন্ন, মন তবু অপ্রসন্ন। ঋত্বিকরা পুজো পেয়েছেন, সদস্যেরা সম্মান পেয়েছেন, অর্থীরা পেয়েছেন যাঁর যেমন অভিরুচি। তবু মন অপ্রসন্ন। কিন্তু কেন?

অবশেষে রাজার মনে হলঃ গুরুর কাজ করেছেন খাণ্ডিক্য, অথচ দক্ষিণা দেওয়া বাকী।

কেশিধ্বজ আবার গেলেন সেই গহন বনে। খাণ্ডিক্যও সশস্ত্র।

কেশিধ্বজ বললেনঃ অপকার করতে আসিনি। আপনার উপদেশ মতই যজ্ঞ সম্পন্ন করেছি। আপনাকেই গুরুদক্ষিণা দেব বলে ঠিক করেছি। যা খুশি চাইতে পারেন।

মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন খাণ্ডিক্য। মন্ত্রীরা বললেনঃ রাজ্য প্রার্থনা করুন। বিনা ক্লেশে রাজ্য পাওয়া হবে। কৃতী ব্যক্তি হলে এই রকমই করতেন।

খাণ্ডিক্য হাসলেন। বললেনঃ রাজ্য কদিনের! আমার মত লোক কি করে প্রার্থনা করবে রাজ্য? আপনারা আমাকে পরামর্শ দেন বটে, কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে আপনারা তেমন অবহিত নন।

কেশিধ্বজকে শুধোলেন খাণ্ডিক্যঃ নিতান্তই কি দেবেন বলে ঠিক করেছেন?

কেশিধ্বজ বললেনঃ অবশ্যই দেব।

খাণ্ডিক্য বললেনঃ পরমার্থ বিষয়ে বিলক্ষণ বিচক্ষণ আপনি। যে কাজ করলে যাবতীয় ক্লেশের শান্তি হয় তাই শুনতে চাই আপনার কাছে। সেই হবে আমার দক্ষিণা।

করতে বারবার যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলেন। উৎসাহ যেন ওঁর আরও বাড়ল। উনি আমাকে এক গল্প বললেনঃ

কৌশিক মুনির সাতপুত্র। সাতজনই শিষ্য ছিলেন গর্গমুনির। কৌশিক মারা গেলেন। সাতপুত্র রয়ে গেলেন গুরুর বাড়ি।

গর্গমুনির ছিল কপিলা নামে একটি গাভী। সাতভাই রোজ মাঠে যায়। কপিলাকে চরায়। আবার সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনে।

কপিলার তখন বাছুর হয়েছে। প্রচুর দুধে মুনির সংসারে স্বাস্থ্য ও শ্রী যেন উপচে পড়ল।

একদিন কপিলা চরছে। মেঠোপথে ঘুরে ঘুরে সাত ভাইয়ের পেটে যেন প্রলয়ের আগুন জলে উঠল। ওরা মনে মনে ঠিক করল কপিলাকে কেটে এ আগুন নেভানো যাক। সাতজনের মধ্যে কপি ও স্বসৃপ বেঁকে বসল। বলল: এ অত্যন্ত পাপের কাজ। কিন্তু বাগ্দুষ্ট, ক্রোধন, পিশুন, হিংস্র ওদের আমলই দিল না।

পিতৃবর্তী বললঃ যদি করবেই পিতৃগণের উদ্দেশ্য করে কর। তাহলে পাপ লাগবে না।

কপিলা নিহত হল। সবাই পিতৃগণকে উৎসর্গ করে নিশ্চিন্ত মনে সেই গোমাংস ভোজন করল।

ভোজন সারা হল। সবাই পরিতৃপ্ত। কিন্তু সব তৃপ্তি বুঝি বা মাটি হয়। মহা এক ভাবনা উৎপাত হয়ে যেন সমস্ত মন জুড়ে বসল। কি কৈফিয়ৎ ওরা দেবে? যদি জানতে পারেন তাহলে তো সর্বনাশ!

সকলে মিলে যুক্তি করল। একজন বললঃ বললেই হবে, গুরুদেব, কপিলাকে বাঘে খেয়েছে। বাছুরটিকে কোনমতে বাঁচিয়েছি। এই নিন।

যুক্তিটি মন্দ নয়। সবাই সায় দিল।

সাতভাই বিষণ্ণবদনে গর্গমুনিকে দুঃসংবাদটি পরিবেশন করল। গর্গ সরলভাবে তাদের কথা বিশ্বাস করলেন।

গুরুর কাছে মিথ্যে বলে ওরা পাপ করেছিল। মৃত্যুর পর ফল পেল একেবারে হাতে হাতে। দশার্ণ দেশের এক ব্যাধ। নাম লুব্ধক। ওরা জন্ম নিল তার পুত্র রূপে। হিংসায় হিংসায় ক্রুর কাজ করে করে ওদের এ জন্ম কেটে গেল।

গোমাংস খেয়েছিল। কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিল। কালঞ্জর পর্বতের মত সুন্দর জায়গায় ওরা মৃগরূপে জন্ম নিল। মৃগজন্ম শেষ হল। এ জন্মের জ্ঞান শেষ হল না। পরজন্মেও জ্ঞান রইল অটুট। ওরা সাতভাই বনবাসী হল। সৎচিন্তা সৎকর্ম করেই এই জীবন তাদের কাটল। গুরুর কাছে জ্ঞান পেয়েছিল, অন্য জন্মেও ওদের মনে সেই জ্ঞান অম্লান রইল। সংসার ভোগ